বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

(১৯৪৭-২০০০)

জান্নাতুল ফেরদৌস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

(১৯৪৭-২০০০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক

জান্নাতুল ফেরদৌস

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১১২

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **'বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি আমার একক একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ অথবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

জুন, ২০২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জান্নাতুল ফেরদৌস

পিএইচ.ডি. গবেষক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, জান্নাতুল ফেরদৌস **'বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেন নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অভিসন্দর্ভটি লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয় নি।

জুন, ২০২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রফেসর ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী)

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর বিষয়ে একাডেমিক পর্যায়ে উচ্চতর কোনো গবেষণাকর্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। সমকালে সাহিত্যের সামাজিক অধ্যয়নে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি **'বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)'** শিরোনামে পূর্ণাঙ্গ একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

প্রফেসর ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও সস্নেহ পরামর্শে আমি বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর বিষয়ে উচ্চতর গবেষণাকর্মে উৎসাহ লাভ করি এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে **'বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)'** শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে পিএইচ. ডি. কোর্সে ভর্তি হই। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর গবেষণা বিষয়ক সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ, পরামর্শ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও আন্তরিক সহযোগিতায় গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁর প্রতি অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বাংলা বিভাগের সদ্য বিদায়ী সভাপতি প্রফেসর ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী এবং বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক প্রশাসনিক ও একাডেমিক যাবতীয় কার্যে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আমার পড়ালেখা খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান এবং তথ্যাদি দিয়ে আমার গবেষণার কাজ সহজতর করেছেন। তাঁদের ঋণ স্বীকার করছি। শামসুন নাহার হলের কর্তৃপক্ষ এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

দীর্ঘ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হওয়ায় আমি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণী। আমার সহপাঠী দিল আফরোজা বিভিন্ন সময় আমার পড়ালেখার খোঁজখবর নিয়েছে, তাকে ধন্যবাদ জানাই। গবেষণাকর্ম চলাকালে আমাকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন আরাফাত আহমেদ বাপ্পি, যাঁর সাথে ধন্যবাদের সম্পর্ক নয়। আমার মা ফাতেমা চৌধুরী নিরন্তর কষ্টসহ্য করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, যাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার বাবা শেখ বশীর আহমেদ যিনি আমার ভেতর সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর দেখানো স্বপ্নের জন্যই আমি এই গবেষণা কর্ম করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

তারিখ : জুন, ২০২১ **জান্নাতুল ফেরদৌস**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	৭-১১
প্রথম অধ্যায় : পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের পটভূমি	১২-২৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : চল্লিশের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর	**২৪-৫৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ– আহসান হাবীব	২৭-৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– ফররুখ আহমদ	৩৮-৪৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ– সিকান্দার আবু জাফর	৪৫-৫১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ– সৈয়দ আলী আহসান	৫২-৫৭
তৃতীয় অধ্যায় : পঞ্চাশের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর	৫৮-১০০
প্রথম পরিচ্ছেদ– হাসান হাফিজুর রহমান	৬২-৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– আলাউদ্দিন আল আজাদ	৭০-৭৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ– সৈয়দ শামসুল হক	৭৯-৮৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ– আল মাহমুদ	৮৭-১০০
চতুর্থ অধ্যায় : ষাটের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর	**১০১-১৪০**
প্রথম পরিচ্ছেদ– আসাদ চৌধুরী	১০৬-১১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– রফিক আজাদ	১১২-১১৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ– মোহাম্মদ রফিক	১১৭-১২০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ– নির্মলেন্দু গুণ	১২১-১২৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ– আবুল হাসান	১২৭-১৩৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ– মুহম্মদ নূরুল হুদা	১৩৪-১৪০
পঞ্চম অধ্যায় : সত্তরের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর	**১৪১-১৭৬**
প্রথম পরিচ্ছেদ– মাহবুব সাদিক	১৪৬-১৫১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– অসীম সাহা	১৫২-১৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ– আবিদ আনোয়ার	১৬০-১৬৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ– আবিদ আজাদ	১৬৫-১৬৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ– রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ	১৭০-১৭৬
ষষ্ঠ অধ্যায় : আশির দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর	**১৭৭-২২৮**
প্রথম পরিচ্ছেদ– খোন্দকার আশরাফ হোসেন	১৮২-১৯১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– মাসুদ খান	১৯২-২০১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ– আমিনুর রহমান সুলতান	২০২-২০৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ– সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ	২০৯-২২৮
সপ্তম অধ্যায় : নব্বইয়ের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর	**২২৯-২৬৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ– বায়তুল্লাহ্ কাদেরী	২৩২-২৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– মুজিব ইরম	২৪০-২৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ– রহমান হেনরী	২৫৪-২৬৭
উপসংহার :	**২৬৮-২৭১**
গ্রন্থপঞ্জি :	**২৭২-২৮১**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের প্রভাব ঐতিহ্যগতভাবেই এসেছে। মূলত এই ভূখণ্ড গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর মধ্যেই সুদৃঢ়ভাবে একাত্ম হয়ে আছে। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত হয়েই এ রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটেছে। শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে নগরায়ণের সূচনা হয়েছে সেটি ঠিক ইউরোপীয় কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না। মূলত গ্রামীণ চেতনাবাহী আধুনিক মানুষ এই নগরকে নির্মাণ করেছে তার ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতার সূত্রেই। প্রাচীন কাল থেকেই যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে আছে সেটির ভিত্তিভূমি গ্রাম। গ্রামীণ সামন্ত জমিদার শ্রেণিরাও মূলত গ্রামকেন্দ্রিক শাসন কাঠামোকে নির্ভর করেই নাগরিক হয়ে উঠেছে। এ কারণেই বাঙালির সংস্কৃতি, জীবনাচার, শিল্প কাঠামো কিংবা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ জীবনের প্রভাব সুদৃঢ়।

বাংলা কবিতার আদি উৎস যেমন চর্যাপদ তার সমাজ এবং সংস্কৃতিও মূলত গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর মধ্যে নির্মিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় গ্রামীণ জীবন ও নিসর্গ চেতনার পরিচয় মেলে। ৪৭ পরবর্তী বাংলা কবিতার নতুন রাষ্ট্রের কবিতা মূলত যে গ্রামকে নির্মাণ করেছে সেটি অস্তিত্বের শিকড় সন্ধানের জন্য কিন্তু এই গ্রামীণ জীবন এবং লোকজীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃতি এক রৈখিক নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিদের হাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভাঙন গড়নের পর্বে গ্রামীণ জীবনের রূপান্তর ঘটেছে। গ্রামীণ অনুষঙ্গ ও লোকজ জীবন অন্বেষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দশকের কবিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন সমূহকে বিধৃত করেছেন, সেই অর্থে বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিগত রূপান্তর ঘটেছে। এই রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের সঙ্গে কবিদের মানস গঠনের প্রক্রিয়ায় কখনো বা নগর জীবনের সঙ্গে টানাপোড়নের প্রতিক্রিয়ায় গ্রামীণ জীবন ও লোকজ জীবনের রূপায়ণ সৃষ্টি করেছে দ্বান্দ্বিকতার। বাংলাদেশের কবিতার ওপর বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে তথাপি বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তরের দিকটি অভিসন্দর্ভে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের পর থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে বাংলাদেশের কবিতা আজ স্বমহিমায় মহিমান্বিত। ৪৭ পরবর্তী নানা আন্দোলনে মুখরিত থেকেও বাংলাদেশের কবিতা চিরায়ত বাঙালি ও বাংলার মানুষের মাটির কথা বলেছে। বাংলাদেশের কবিতা বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছে তার নিজস্ব গ্রামীণ জীবন ও লোকাচার। আর মন ও মননের মিশেলে এই কাজ যারা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– চল্লিশের দশকে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ,

সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান; পঞ্চাশের দশকে হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ; ষাটের দশকে আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, মুহম্মদ নূরুল হুদা; সত্তরের দশকে মাহবুব সাদিক, অসীম সাহা, আবিদ আজাদ, আবিদ আনোয়ার, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ; আশির দশকে খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মাসুদ খান, আমিনুর রহমান সুলতান, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ এবং নব্বইয়ের দশকে বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, মুজিব ইরম ও রহমান হেনরী প্রমুখ কবি। নগর জীবনের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের দ্বান্দ্বিকতা ঘটলেও কবিতা তার শিকড় ফিরে পায় উপর্যুক্ত কবিদের হাত ধরেই। আর পুরুষানুক্রমে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হয়ে ওঠে একান্ত দরদের বস্তু। বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের যে বিস্তৃত পরিসর তা পূর্বের কোনো গবেষণায় তেমনভাবে আলোচিত হয়নি বিধায় 'বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)' বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনায় আগ্রহী হয়েছি। চল্লিশের দশক থেকে বাংলাদেশে রচিত ২০০০ সাল পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থসমূহকে 'বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)' শীর্ষক গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনভিত্তিক রচিত বিভিন্ন দশকের (১৯৪৭-২০০০) প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কবিদের কাব্যগ্রন্থসমূহের বিস্তৃত পর্যালোচনা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানত পাঠবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : 'পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের পটভূমি'। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ চিহ্নিতকরণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু ফিরে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে চর্যাগীতিকা থেকে শুরু করে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের কবিতায় কীভাবে গ্রামীণ ও লোকজ জীবন পল্লবিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতায় পল্লিজীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন আখ্যান কাব্যে, লোককাহিনিতে, গীতিকায়, ছড়ার ছন্দে, বারোমাস্যায়, লোকগানে ও পল্লিগীতিতে। ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এ দেশের গ্রামজীবন, গ্রামীণপ্রসঙ্গ ও গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-বেদনা ও চিরন্তন রোমান্সের সজীব চিত্র অংকিত হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক যুগের কবি মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পল্লিজীবনের চিত্র ও লোকজ জীবন কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তা প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'চল্লিশের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর'। বাংলাদেশের কবিতায় চল্লিশের দশকের কবিগণ নতুন ধারা নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। এই অধ্যায়ের **প্রথম পরিচ্ছেদে** আলোচিত হয়েছে চল্লিশের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি আহসান হাবীবের কবিতা প্রসঙ্গে। গ্রামবাংলার মানুষের জীবনযাত্রার জীবন্ত মিছিল রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** ফররুখ আহমদের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজীবন অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত কবি ফররুখ আহমদের কবিতায় গ্রামীণ অনুষঙ্গ চিরায়ত বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে পরিদৃশ্যমান। রোমান্টিক, স্বপ্নপ্রবণ এবং প্রেম ও প্রকৃতির রূপকার কবি হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের আবির্ভাব। **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার বিষয় ভাবনা স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। তিনি উচ্চকণ্ঠের সমাজ সচেতন কবি। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি বাংলার গ্রামীণ লোকজ জীবনের ছায়া তুলে ধরেছেন যদিও তেমন ব্যাপক পরিসরে নয়। এই অধ্যায়ের **চতুর্থ পরিচ্ছেদে** স্থান পায় সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর কীভাবে দৃশ্যমান হয়েছে, তা আলোচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : 'পঞ্চাশের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর'। সাতচল্লিশ পরবর্তী রচিত কবিতা ঢাকাকেন্দ্রিক পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের কবিতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দেশ বিভাগ এবং নতুন স্বপ্নে বিভোর কবিতায় যোগ হয় নতুন মাত্রা এবং আলোড়ন। এই অধ্যায়ের **প্রথম পরিচ্ছেদে** আলোচিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা। পঞ্চাশের দশকের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল কবি ছিলেন তিনি। স্বদেশ, সমকাল ও ঐতিহ্য তাঁর কবিতার মুখ্য উপজীব্য। হাসান হাফিজুর রহমান স্বদেশচেতনার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার লোকজ দিকটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** আলোচিত হয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় গ্রামবাংলার লোকজপ্রীতির পরিচয়। তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য বাংলার অমূল্য সম্পদ প্রকৃতি ও লোকজ জীবন প্রণালী। **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** আলোচিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় পল্লিবিধৌত বাংলা। নগরসন্ততি হয়েও সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপচিত্র পরম মমতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। **চতুর্থ পরিচ্ছেদে** আলোচিত হয়েছে আল মাহমুদ এর কবিতায় গ্রামীণ জীবন ও লোকাচার কীভাবে সৃজিত হয়েছে, তার বর্ণনশৈলি এবং মূর্ত-বিমূর্ত বাস্তব উত্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : 'ষাটের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর'। ষাটের দশক বাংলাদেশের কবিতার বাঁক বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই অধ্যায়ের **প্রথম পরিচ্ছেদে** ব্যাপক আলোচিত হয়েছে আসাদ চৌধুরীর কবিতা। প্রেমচেতনা, লোকজচেতনা এবং সামাজচেতনায় তাঁর কবিতা প্রভাস্বর। লোকঐতিহ্য এবং লোকজ-অনুষঙ্গের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় সমভাবে বহমান। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** রফিক আজাদের কবিতা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। । তাঁর শিল্পবোধ নাগরিক শুষ্কতার বিপরীতে শৈশব-কৈশোরে যাপিত জীবনের প্রত্নস্মৃতির সবুজ উপত্যকায় মূলীভূত হয়। রফিক আজাদ রোমান্টিক ভাবনায় গ্রামীণ স্মৃতি ও লোকজ সংস্কৃতির বিবিধ অভিজ্ঞানে এবং মননসচেতন শৃঙ্খলাশাসনে গড়ে তোলেন এক স্বপ্নের ভুবন। **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় বাঙালির লোকজ জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি পরিদৃশ্যমান। **চতুর্থ পরিচ্ছেদে** নির্মলেন্দু গুণের কবিতার ওপর আলোকপাত করা হয়। নির্মলেন্দু গুণের মন ও মননে মিশে আছে তাঁর গ্রামীণ জীবন ও লোকাচার। **পঞ্চম পরিচ্ছেদে** আবুল হাসানের কবিতায় গ্রামীণ লোকাচার দৃশ্যমান। তিনি দক্ষ শিল্পীর মতো লোকজ সংস্কৃতির চিত্রকল্প এঁকেছেন কৃষিনির্ভর জীবনকেন্দ্রিক মানুষগুলোর জীবন্ত শিল্পরূপ। **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে** মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তরের বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : 'সত্তরের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর'। সত্তরের দশকের কবিতা মূলত মুক্তিযুদ্ধকালীন কবিতার সৃষ্টি ও বিস্তৃতি। এই অধ্যায়ের **প্রথম পরিচ্ছেদে** জায়গা করে নেয় মাহবুব সাদিকের কবিতার ভুবন। গ্রামীণ জীবন নির্ভর কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন নাগরিক বৈদগ্ধ্যের আভা। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** অসীম সাহার কবিতায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বাংলাদেশের চিরায়ত সংস্কৃতিতে দোলাচলচিত্ততা, দেশভাগের করুণ যন্ত্রণা, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, লক্ষ লক্ষ বাঙালির উদ্বাস্তু হওয়া, অস্তিত্বের সংকট, স্বদেশের জন্য উত্তাপ। তাঁর কবিতায় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোকায়ত বাংলার রূপ ধরা পড়ে। **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** আবিদ আনোয়ারের কবিতায় ব্যঞ্জনাধর্মী গ্রামের বহুরূপতা খুঁজে পাওয়া যায়। শহরের অধিকাংশ মানুষ জীবন-জীবিকার তাড়নায় গ্রামবাংলা থেকে শহরে বসবাস করলেও নগরের মানুষের টান থাকে গ্রামের রেখে আসা প্রাত্যহিকতায়। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির বলয় তাঁর কবিতায় আভাসিত হয়। **চতুর্থ পরিচ্ছেদে** আবিদ আজাদের কবিতায় নগরবিমুখতার মধ্যে ফেলে আসা কৈশোরের গ্রামীণ রূপ-রূপান্তর দৃশ্যমান। **পঞ্চম পরিচ্ছেদে** রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর আলোচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : 'আশির দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর'। অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। **প্রথম পরিচ্ছেদে** খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু মূলত গ্রামবাংলার লোকজ সংস্কৃতি। তাঁর লোকজ জীবনভিত্তিক কবিতা নিয়ে এই পরিচ্ছেদটি গড়ে উঠেছে। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** মাসুদ খানের কবিতা স্থান পেয়েছে। তিনি মূলত সমসাময়িক মধ্যবিত্তের জীবনকে বিজ্ঞাননির্ভর কবিতা হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিমানুষের কথা এসেছে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্ররূপে। এ পরিচ্ছেদে তাঁর কবিতায় নদীবাংলার শান্তিকামী মানুষের আলোর উৎস সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতায় ভাটিবাংলার মানুষের জীবনকথা নিয়ে রচিত। এখানে লোকজ জীবনাশ্রিত মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবন স্থান পেয়েছে। **চতুর্থ পরিচ্ছেদে** আলোচিত হয়েছে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পল্লিজীবনাশ্রিত মানুষ নিয়ে নাগরিক সচেতনতায় কবিতা রচনা করেছেন। পৌরাণিক কাহিনি, মিথ ও বিশ্ব সাহিত্যের সমন্বয়ে কাব্য রচনা করে তিনি মহাসমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কবিতা বিশ্লেষণে গ্রামবাংলার জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : 'নব্বইয়ের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর'। এই অধ্যায় রচনায় কেবল ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ প্রধান উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। **প্রথম পরিচ্ছেদে** আলোচিত হয়েছে বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতা। বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতার গভীর তলের গোপন ঢেউ অন্বেষণ করে লোকাশ্রিত জীবন যন্ত্রণার স্বরূপ উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** মুজিব ইরমের কবিতা স্থান পায়। মুজিব ইরম রচনা করেন গদ্যাশ্রিত গ্রামবাংলার অঞ্চলভিত্তিক জীবন। তাঁর কবিতায় অন্বেষণ করার চেষ্টা হয়েছে লোকজ জীবনের রূপান্তর। অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়ের **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** রহমান হেনরী জায়গা করে নেয়। তাঁর কবিতায় ব্যাপকতা পায় প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যনির্ভর জীবন বাস্তবতা। রহমান হেনরীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যাশ্রিত কবিতায় বাংলার লুপ্তপ্রায় গৌরব অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমগ্র অভিসন্দর্ভের ওপর ভিত্তি করে উপসংহার রচিত হয়েছে। উপসংহার অংশে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের পটভূমি

বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের প্রভাব ঐতিহ্যগতভাবেই এসেছে। মূলত এই ভূখণ্ড গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর মধ্যেই সুদৃঢ়ভাবে একাত্ম হয়ে আছে। বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির মূলভিত্তি হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত হয়েই এ রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে। শিল্পবিপ্লবের মধ্যদিয়ে যে নগরায়ণের সূচনা হয়েছে, সেটি ঠিক ইউরোপীয় কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে আছে তার ভিত্তিভূমি গ্রাম। গ্রামীণ সামন্ত জমিদার শ্রেণিগণও মূলত গ্রামকেন্দ্রিক শাসন কাঠামোকে নির্ভর করেই ধীরে ধীরে নাগরিক হয়ে উঠেছে। তবে নাগরিক জীবন গ্রামীণ জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ কারণেই বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, শিল্প কাঠামো কিংবা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ লোকজ জীবনের প্রভাব সুদৃঢ়।

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই পল্লিজীবনের চিত্র এবং গ্রামীণ লোকজ অনুষঙ্গ নির্ভর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি নানা রূপে ও রেখায় অংকিত হয়েছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পল্লিজীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন আখ্যান কাব্যে, লোককাহিনিতে, গীতিকায়, ছড়ার ছন্দে, বারোমাস্যায়, লোকগানে ও পল্লিগীতিতে। ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এ দেশের গ্রামজীবন, গ্রামীণপ্রসঙ্গ ও গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-বেদনা এবং চিরন্তন রোমান্সের সজীব চিত্র অংকিত হয়েছে।

কবি বা সাহিত্যিকগণ দেশ কালকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। কেননা, কবিরা এই সমাজেরই মানুষ। তাই সচেতনেই হোক আর অবচেতনেই হোক কবির নির্মিত সাহিত্যে বস্তুত সমকালীন জীবন চিত্রিত হয়ে পড়ে। চর্যাপদের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বলা যায়, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চর্যাকারগণ সামাজিক অবস্থার যে সব কথা লিপিকৃত করেছেন, তা থেকে তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক রূপরেখা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। চর্যাপদে যে সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তা আজ থেকে হাজার বছরের আগেকার গ্রামবাংলার। চর্যাপদগুলির সামাজিক দলিলমূল্য অনেকখানি। চর্যাপদের গ্রামীণ সমাজচিত্র বলতে আমরা বুঝি :

ক. তৎকালীন গ্রামীণ মানবগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর পরিচয়। তাদের আচার, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চিত্র।

খ. গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয়। তাদের দারিদ্র্য ও জীবিকার চিত্র।

গ. সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিচয়।

ঘ. প্রেম-দাম্পত্যের পরিচয়।

ঙ. ভৌগোলিক চিত্রের পরিচয়।

বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের পটভূমি উল্লেখ করলে চর্যাপদের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। চর্যাপদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গ কম নয়। যেমন :

নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ

ছই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ ॥ (সত্যব্রত দে সম্পাদিত, *চর্যাগীতি পরিচয়*, পৃ. ১৩৪)

এই পদে দেখা যায় ডোম্বির কুঁড়ে ঘর নগরের বাইরে। চর্যাপদে যে গ্রামবাংলার কথা পাওয়া যায় তাতে আমরা দেখি জাতিভেদ প্রথা ছিল বেশ কঠোর। সমাজে উঁচু-নিচু ভেদ ছিল প্রবলরূপে। সমাজের উঁচুশ্রেণিরা বাস করত নগরের মধ্যে। কিন্তু অন্ত্যজ মানুষদের নগরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাদের নগরের বাইরে বাস করতে হতো। এ থেকে বোঝা যায়,

> আধ্যাত্মিক প্রেরণাজাত হলেও চর্যাগীতি ইহজাগতিক প্রতীকে রচিত। গীতগুলোতে লোকজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং লোকায়ত দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত সামাজিক চেতনা– শ্রেণী চেতনা বললেও অত্যুক্তি হয় না– সেকালেও আমাদের অঞ্চলের জনজীবনকে আন্দোলিত, অনুপ্রাণিত এবং কমবেশি পরিচালিত করেছে বললে সম্ভবত ঐতিহাসিক সত্যই বলা হয়। (আবু জাফর শামসুদ্দীন, *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, পৃ. ২৪)

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের উৎস মূলত লোকজীবনের রাধাকৃষ্ণ। বড়ু চণ্ডীদাস এ কাব্যে লৌকিক রাধা ও কৃষ্ণকে এঁকেছেন। এর পটভূমি গ্রামীণ ও লোকজ। এর বিস্তার এবং পরিণামও গ্রামকেন্দ্রিক। সেই সঙ্গে লোক-অনুষঙ্গ নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। এই কাব্যটি আবিষ্কারের ফলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলাদেশ, গ্রামবাংলার সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক মানুষের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রপট ধরা পড়ে, তেমনি বাঙালির ধর্মগত বিবর্তনের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।

আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে॥

মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।

মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ॥

(মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, পৃ. ১১)

রাধা-কৃষ্ণ বাস্তব সমাজ-পরিবেশে লালিত। সমাজ-সীমার মধ্যে দুটি মানব ও মানবীর মতোই তাদের প্রেমবিহ্বল চিত্তের বিকাশ ঘটেছে। আত্মা এখানে দেহকে আশ্রয় করে আবর্তিত-বিবর্তিত ও বিকশিত

হয়েছে। এখানে আধ্যাত্মিকা গৌণ; লৌকিক জীবন এবং লৌকিক রুচির প্রকাশ মুখ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রেমগাথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজ-সংসারের বাস্তব চিত্র। এভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রতিটি খণ্ডে দেখা যায় গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ-উপাদানে ভরপুর।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য– অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্যেও লৌকিক বাস্তব জীবনের বিশ্বস্ত চিত্রায়ন। আরাধ্য দেবদেবীকে সংসারের মঙ্গলঘটে অধিষ্ঠিত করে কাব্য রচনা করতে গিয়ে মঙ্গলকবিদের সংসারমুখী মন বাস্তব সমাজের সুখদুঃখময় ছবি এঁকেছেন জীবনানুরাগের স্বভাববৈশিষ্ট্যে। ষোড়শ শতকের বাঙালি সমাজের সানুরাগের চিত্র এঁকেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের অবৈষ্ণব কাব্যধারার কবিদের মধ্যমণি হয়ে পড়েন। ষোড়শ শতাব্দীর গ্রামবাংলার সমাজচিত্র ও সামাজিক জীবন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কল্পনায় ভাষারূপ পেয়েছে। প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় গ্রামবাংলার প্রবহমান চিত্রপট :

কান্দিতে কান্দিতে রামা গোলা হাট চলে।
তিতিল সকল অঙ্গ লোচনের জলে ॥

(মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *কালকেতু উপাখ্যান*, পৃ. ৫৭)

সুন্দরী নারী ছিলেন ছদ্মবেশিনী চণ্ডী। তাঁকে নিজের সংসারের সতীন মনে করে বিতাড়িত করার জন্য ফুল্লরা অনেক প্রবোধ বাক্য বলে। শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে ইনিয়ে বিনিয়ে বারো মাসের দুঃখকাহিনি নিবেদন করে কিন্তু তাতেও ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে নিজগৃহ থেকে বিতাড়িত করতে না পেরে ফুল্লরা কালকেতুকে সব কিছু খুলে বলার জন্য কাঁদতে কাঁদতে গোলাহাটে চলে যায়। কালকেতু উপাখ্যানে দেখতে পাওয়া যায় মধ্যযুগেও সতীন সমস্যা ছিল প্রকট। বধূদের ওপর শাশুড়িরা যে মানসিক নির্যাতন চালায় তাও দেখা যায়। তাই মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে একটি গল্পরসের দ্বারা সতীন সমস্যাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। যা শুধু তথ্যপুঞ্জই হয়ে থাকেনি। মধ্যযুগের লোকসমাজে রসবোধ ছিল বলেই কবি এমনভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

মধ্যযুগে বাঙালি নারীদের সামাজিক-পারিবারিক অবস্থানের বহুমাত্রিক চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। লৌকিক মানুষের যাপিতজীবন কী মনসামঙ্গল, কী চণ্ডীমঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল সর্বত্রই এক। অন্নদামঙ্গলে দেবীর কাছে আর্শীবাদ চাওয়ার সময় ঈশ্বরী পাটুনীর উক্তি :

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥

(নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*, পৃ. ১৯০)

এই অসাধারণ মানবিক উক্তি নির্মিত হয়েছে মধ্যযুগের গ্রামের এক অভাবক্লিষ্ট স্নেহময়ী মায়ের মুখ থেকে। নিজের যতই অভাব থাকুক জননী উদগ্রীব তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাই দেবীর কাছে নিজের জন্য নয়, সন্তানের জন্য 'বর' চায়। এভাবে দেখতে পাওয়া যায় সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে লোকায়ত জীবনের আলেখ্যে ভরা। 'উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা কাব্যের মৌলিক গ্রামীণ দেশজভাব' (মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [আধুনিক যুগ]*, পৃ. ১৯৯) খর্ব হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নগরায়ণ গড়ে ওঠে। বলা যায়, গ্রামবাংলার রূপান্তর ঘটে নগরায়ণে। অর্থাৎ, আধুনিক যুগের কাব্য-সাহিত্যে নাগরিক রূপ ও রুচির পরিচয় স্পষ্ট হতে থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-'৭৩) বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সমগ্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতা রচনায় হাত দিলেও তাঁর কাব্য-সাহিত্যে বাংলার লোকায়ত জীবন ও প্রতিবেশ পরিবেশের বিবিধ উপকরণ এবং অনুষঙ্গ অপ্রতুল নয়। লৌকিক উৎসের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-এর প্রমীলা চরিত্র সৃজন করেছেন। প্রমীলা মধুসূদন দত্তের স্বকপোলকল্পিত চরিত্র নয় :

> মাইকেল মধ্যযুগের লৌকিক সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে এই চরিত্রটি তুলে নিয়ে একে নবকলেবর, সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করে আমাদের আধুনিক সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ হিসাবে চিত্রিত করে রেখেছেন। (শামসুজ্জামান খান, *মাটি থেকে মহীরুহ*, পৃ. ৪৩)

মধুসূদন দত্তের *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (১৮৬৬)-র অধিকাংশ সনেট রচিত হয়েছে বাংলাদেশ এবং বাঙালির জীবন মননঘেরা পলল বিধৌত লোকজ ঐতিহ্য থেকে। মধুসূদন দত্তের অধিকাংশ সনেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– কবিমনকে জাগিয়ে তুলেছে স্বদেশ, বাঙালি-সমাজ ও গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্য এবং প্রকৃতি, লোকায়ত অনুষঙ্গ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটে স্বদেশপ্রীতির স্মৃতি বহমান। প্রকৃতির বুকে শৈশবের বিচরণ ক্ষেত্রসমূহ 'কপোতাক্ষ নদ' জাতীয় সনেট রচনাকালে প্রবাসে কবিচিত্তকে আন্দোলিত করে। বাংলার স্মৃতিতে শুধু জড় প্রকৃতিই রূপ ধরে কবির চিত্তকে দোলা দেয়নি, পল্লিবাংলার জন্যও কবিচিত্ত ব্যাকুল হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনে কপোতাক্ষ নদের প্রভাব অপরিসীম। উদ্দাম, উন্মত্ত স্রোতে বাধাবন্ধনহীন নদীর মতো দেশমাতৃকার অভিমুখে অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছেন। এ গতির উদ্দামতায় সুদূর ভার্সাই নগরে বসে কবির মানসদৃষ্টিতে ভেসে উঠলে কবি লেখেন :

> সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
> সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে
> সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
> শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে। (ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পৃ. ১৬৬)

গ্রামবাংলার মা মাটি মানুষ তাঁকে অমোঘ বন্ধনে নিরবধি আকর্ষণ করে চলেছিল। তাই তিনি স্বল্পায়ু জীবনে বাংলার অপূর্ব লীলাভূমির চিত্রকল্প রচনা করতে গিয়ে মূলত এ অঞ্চলের গ্রামকেন্দ্রিক জীবনপ্রবাহকে বিধৃত করেছেন। মধুসূদন দত্তের কবিতায় খাঁটি বাঙালিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয় যখন তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় ভাষা, উপমা ও লোকজ অনুষঙ্গ অবলীলায় তিনি ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর সনেটে বাঙালি সত্তার স্নিগ্ধ, কোমল ও অকৃত্রিম রূপটি চমৎকারভাবে ধরা পড়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের নব মূল্যায়ন হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

> কপোতাক্ষ নদের তীরে তীরে বিচরণ করে বঙ্গদেশের গ্রাম-গঞ্জের গহীন ভিতরে ঢুকে গিয়ে পীরের দরগা ও জোতদারের অক্টোপাশ সদৃশ আবরণীর ভেতর থেকে তিনি চয়ন করেন মানুষ, রক্তমাংসের আদলে গড়া আবহমানকালের পারস্পরিকতায় বেড়ে ওঠা কুসুমিত ইস্পাত। কবিতায় নানা ভাঙচুর, বিন্যাস, নতুন নতুন আঙ্গিক ও চারিত্র্যে টাটকা নবীনতার ভেতরেও স্থিত ও স্থাপিত থাকে স্বাদেশিক ভূগোলের শ্যামল ছায়া, কিছু রক্তের ছোপ ও মৃত্তিকা-সংলগ্ন চরিত্রের নির্মাণ-শোভনতা। (শামসুজ্জামান খান, *মাটি থেকে মহীরুহ*, পৃ. ৫০)

অর্থাৎ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে আধুনিক বাংলা কবিতায় নির্মিত হয় স্বাদেশিক ভূগোলের শ্যামল ছায়া এবং এ অঞ্চলের মানুষের লোকায়ত জীবনের নানামুখী গ্রামীণ প্রকৃতির রূপচিত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)-এর কাব্যে দেখা যায় অত্যন্ত আদরণীয় হয়ে উঠেছে গ্রামীণ ও লোকজ জীবন। তাঁর সৃজিত সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় গ্রামীণ জীবনযাত্রার বিভিন্ন অনুষঙ্গ উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা, পল্লিবাংলার মানুষের সংগ্রামশীল জীবনচর্চা এবং লোকায়ত ঐতিহ্য-লালিত মানবসত্তার প্রাত্যহিক জীবনের বহিঃপ্রকাশ তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান। বাঙালির সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়। গ্রামবাংলার সরল মানুষকে, মানুষের যাপিত জীবনযাত্রার পটভূমিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যে, গানে কথায় এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা একদম বাস্তব। *সোনার তরী* (১৮৯৪) কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি চিন্তনে অনেকটাই দার্শনিক। তবে এই দর্শন-চিন্তার উৎস যেমন ভারতীয় জীবন দর্শনজাত, তেমনি গ্রাম ও লোকজ জীবনের নিগূঢ় প্রাণসত্তাটি তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয়েছে রোমান্টিক চেতনায়। *সোনার তরী* ও *চিত্রা* কাব্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরে। সেখানকার গ্রামীণ প্রকৃতির লোকায়ত সাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মের নানা অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় জায়গা করে নেয়। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা– বিশ্বপ্রকৃতি

> এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী*, পৃ. ৪-৫)

একটি সাধারণ গ্রামীণ জীবন সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের জীবন প্রণালী ভীষণভাবে রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিল। এ কারণেই মানুষের সঙ্গে ঐক্য গড়ে উঠতে তাঁর দেরি হয়নি। তারই ফলে তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন সাহিত্যের অমূল্য সব রতন। রবীন্দ্রকাব্য ব্যাখ্যাত হলে দেখা যাবে– *চিত্রা*, *চৈতালি*, *কল্পনা*, *ক্ষণিকা*, *নৈবেদ্য*, *বলাকা*, *পুনশ্চ* প্রভৃতি কাব্যে গ্রামীণ রূপ ও লোকায়ত জীবনবোধ স্পষ্ট। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কবির মরমীয়া আত্মার অনুরণন মূলত কবির লোকজীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগের ফল। লালনকে রবীন্দ্রনাথই টেনে এনেছেন নিজের 'মনের মানুষে'র মধ্যে।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০) প্রমুখ। এঁদের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব স্পষ্ট হলেও বাংলা কাব্যজগতে তাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র বলয় দ্বারা আচ্ছাদিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আচ্ছাদন অস্বীকার না করেই ভিন্ন ধারায় নিজেদেরকে আবিষ্কার করলেন। কবিগণ গ্রামবাংলার প্রধান উপজীব্য যে লোকাচার ও গ্রামীণ জীবন তারই বিন্দু ধরে বৃত্ত নির্মাণের প্রচেষ্টা করলেন তাঁরা। এ সময় বিংশ শতাব্দীতে যেন নগরায়ণের করুণ বাস্তবতা শুরু হলো। মূলত তা থেকে মুক্তির জন্যেই যেন কবিরা উদগ্রীব ছিলেন।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মধ্যে দেখা যায়, তাঁরা মূলত গ্রামজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং লোকসংস্কৃতি ও পুরাণকাহিনির ভক্ত ছিলেন। আধুনিক জীবনের সংশয় ও বিক্ষোভ, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার উপাদান তাঁদের কবিতায় জায়গা করে নিতে পারেনি। বিশ শতকের রূঢ় নগরজীবন থেকে রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের দৃষ্টি পল্লিআশ্রয়ী হওয়ার বিষয়ে সমালোচকের উক্তি স্মতর্ব্য :

> নগরজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা ও নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষত–বিক্ষত মানবাত্মার আর্তক্রন্দন এঁদের শ্রবণে পৌঁছায় নি। আসলে এঁরা গ্রামজীবনের কবি– গ্রামের মায়া ও মমতা, স্নেহ ও অনুভূতিই এঁদের ধরে রেখেছিল। একে 'পলায়নী মনোবৃত্তি' আখ্যা দিলে হয়ত ঠিক হবে না। রবীন্দ্রকাব্যে এঁরা যে অক্ষয় শান্তি ও সৌন্দর্যের আশ্বাস পেয়েছিলেন, বাস্তব-প্রতিবেশে সমর্থিত হবে না এই আশঙ্কাতেই বোধ করি এঁরা গ্রামজীবনে ফিরে গিয়েছিলেন। নগরজীবনের ফেনিল মদ্যপানে এঁদের ছিল অনীহা, গ্রাম্যলক্ষ্মীর প্রসাদলাভে ছিল একান্ত আগ্রহ। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ*, পৃ. ১৩)

রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের স্বতন্ত্র ও মৌলিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিক পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবন। মাত্র ২৫ বছরের কবিজীবনে তিনি বাংলা কবিতার

রাজ্যে রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর। নজরুল ইসলাম বুদ্ধিনির্ভর কবি নন, তিনি হৃদয়নির্ভর কবি ছিলেন। স্বভাব কবি বলতে যা বোঝায় তিনি তাই ছিলেন। কাব্যের পরিণতির দিকে তাঁর প্রবণতা ছিল না, তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো কবিতা রচনা করে গেছেন। কুড়িতে যেমন ছিলেন, চল্লিশেও তাই। স্বভাব কবি ছিলেন বিধায় তাঁর কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। নজরুলের কবিমানস চেতনালোক সেই কৈশোরেই উপ্ত হয়েছিল। লেটোর দলে থাকা অবস্থায় তিনি লোকজীবন ও গ্রামীণ চৈতন্যের প্রবল জ্ঞানময় উপস্থিতি কামনা করেন। তাঁর কবিতায় ভারতীয় মিথসমূহের উৎসস্থল প্রায়শই গ্রামীণ ও লোকজ। শিব, নটরাজ, দিগম্বর, মহালয়া, চণ্ডী প্রভৃতির যেমন বিচরণ তেমনি পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের অনুষঙ্গবাহী বিষয়গুলোও যেমন মহররম, দুলদুল, ইস্রাফিল প্রভৃতি লোকচেতনাবাহী ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রেমচেতনার বিরহ অনুষঙ্গানুভূতি কিংবা বৈষ্ণবীয় ও বাউলচেতনার বৈরাগ্যময় অনুভূতি প্রকাশে যে প্রকৃতির ব্যবহার করেন তা গ্রাম এবং লোককেন্দ্রিক।

বাস্তব জীবনকে অতি কাছ থেকে দেখা কাজী নজরুল ইসলাম জীবিকার প্রয়োজনে কখনো লেটোর দলে, পুথির আসরে, পালাগানে যোগ দিয়েছিলেন আর অনুভব করেছিলেন দরিদ্র, দুঃখী মানুষের জীবন যাত্রা, সংস্কৃতি ও আবেগ। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে উৎসারিত কবি শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন একেবারে তাদের ঘরের ছেলে হয়ে। আর এই কারণেই তাঁর রচনায় যে গ্রামীণ ও লোকায়ত জীবন তা বাস্তব, যদিও তিনি বিদ্রোহী কবি নামে খ্যাত। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় লোকজীবনের প্রভাব বিষয়ে বিদ্বজ্জনের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক :

> নজরুলের ক্ষেত্রে লৌকিক ধারা ও আধুনিকতার সমন্বয় আরো তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি প্রকৃত বাঙালি ও বিশ্ব ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁর রচনায়। বাঙালি সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গতা ও ভবিষ্যৎ মুখিতার মূল উৎসটি তাঁর হাতেই ধরা পড়েছে। হিন্দু ও মুসলিম পুরাণ ও আধুনিক বিশ্ব ঐতিহ্যের এক চমৎকার সমন্বয় যে তাঁর রচনায় ঘটেছে তার মূলেও কাজ করেছে নজরুলের লোকজীবন সংলগ্নতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রামপ্রসাদ, লালন, দুদ্দুশাহর রচনা পাঠে, যে নজরুলের অপরিস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা যায় তার অর্থ শুধু এটাই যে, নজরুল লোক ঐতিহ্যের মৌলধারাকে ছেঁকে তাঁর নিজস্ব পথ নির্মাণ করেছিলেন। এবং এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তাঁর পারঙ্গমতা একটা বিশিষ্ট রূপলাভ করেছিল বলেই তিনি বড় কবি অর্থাৎ লৌকিক উৎসের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ এবং তা থেকে নব উদ্ভাবনা ব্যতীত আধুনিকতা ও মহত্ব অর্জন অসম্ভব। (শামসুজ্জামান খান, *মাটি থেকে মহীরুহ*, পৃ. ৫১)

কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে আবাল্য পরিচিত। তাই তিনি কৃষক-শ্রমিক-তাঁতি-মজুর নিয়ে কবিতা লেখেন– 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরের গান', 'চাষার গান' প্রভৃতি :

আজ জাগ্ রে কৃষাণ, সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,

এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়। (কৃষাণের গান, *সর্বহারা*, নজরুল রচনাবলী-১, পৃ. ২৮১)

বাংলার কৃষকশ্রেণিকে উজ্জীবিত করার মন্ত্র এই কবিতা। *ভাঙ্গার গান* (১৯২৪), *বিশের বাঁশী* (১৯২৪), *ফণিমনসা* (১৯২৭), *সর্বহারা* (১৯২৬), *প্রলয়শিখা* (১৯৩০), *সন্ধ্যা* (১৯২৯) প্রভৃতি কাব্যে নজরুলের লোকায়ত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর সৌন্দর্যকে, জীবনের সৌন্দর্যকে ধনিক শক্তির ব্যাভিচারী প্রতাপ বিক্ষত করেছে; পৃথিবীর স্নিগ্ধ সবুজ শ্যামল আস্তরণে আজ নেমে এসেছে কংকাল পরিকীর্ণ আতঙ্ক পাণ্ডুর মরুভূর প্রেতচ্ছায়া। তাই গ্রামবাংলার নিরন্ন ও নিগৃহীতের দুঃখ কবিকে কঠোর বাস্তবে নামিয়েছে। তাঁর কবিতায় এলো চাষি, মজুর, এলো জাল হাতে নিয়ে জেলে, এলো সমাজের রূপজীবীনীরা– এই সব কাব্যে ঐতিহাসিক সচেতনতা এবং শোষণমুক্তির সংগ্রাম ও সামাজিক সমসাময়িকতা গভীরভাবে এসেছে।

তিরিশের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-'৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-'৮৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-'৭৪) এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯-'৮২)। তাঁরা মূলত রবীন্দ্র-পরবর্তী ধারার কবি। তাঁদের কবিতায় ক্লান্তি, হতাশা, অস্থিরতা এবং নেতিবোধ স্পষ্ট হয়। অবক্ষয়, বিভীষিকা, প্রেমহীনতা, যুদ্ধোত্তর মানুষের অস্তিত্বহীনতা প্রভৃতিকে কবিতায় জায়গা দিতে গিয়ে হয়ে ওঠেন তাঁরা একান্তই নাগরিক কবি। তবে উপর্যুক্ত কবিদের কবিচেতনায় গ্রাম এবং লোকজীবনের প্রভাবও এ সময়ের কবিদেরকে আলোড়িত করেছে। জীবনানন্দ দাশ এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতায় আবহমান বাংলার লোকজীবনের প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬), *বনলতা সেন* (১৯৪২), *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭) কাব্যে জীবনানন্দ দাশ লোকজভাবনায় ভাবিত হয়ে আবহমান বাংলার রূপ অঙ্কন করেছেন। বলাবাহুল্য জীবনানন্দের নিসর্গ প্রকৃতি-আশ্রিত সৌন্দর্যের মূলে আছে এই বাংলা- বাংলার প্রকৃতি প্রতীকী অর্থাৎ আত্মমগ্ন চেতনার গভীরে কবির কাছে যা একান্ত আশ্রয়, তারই বহিরাগত রূপ গড়ে উঠেছে রূপসী বাংলায়। 'ঝরা পালক' থেকে শুরু করে 'মহাপৃথিবী' পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলি গ্রহণ করলে দেখা যায় যে, এই পর্যায়ে কবির অধিকাংশ উপমা-প্রতীক ইমেজগুলি গড়ে উঠেছে মূলত বাংলার প্রকৃতির অনুষঙ্গে। বাংলার রূপে মগ্ন কবি ঘোষণা করেন এক অমোঘ উচ্চারণ– যা জীবনানন্দের বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি চেতনার যেন মূল কথা :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ, খুঁজিতে যাই না আর।

(বাংলার মুখ আমি, *রূপসী বাংলা*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১২১-১২২)

তাই বাংলার লতাপাতা, বৃক্ষাদি, দোয়েল, শ্যামার কলকাকলিতে তাঁর কাব্য মুখরিত হয়েছে :

পৃথিবীর কোনো পথে : নরম ধানের গন্ধ— কলমীর ঘ্রাণ,

হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের

মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,

(আকাশে সাতটি তারা, *রূপসী বাংলা*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১২১-১২২)

আর এই অনুষঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক জীবনাশ্রিত পুরাণের চিত্র ফুটে উঠেছে– মধুকর ডিঙা, বেহুলা, ধনপতি, লহনা, শ্রীমন্তের উপস্থিতিতে :

ক. দেখেছিল : বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—

(বাংলার মুখ আমি, *রূপসী বাংলা*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১২০)

খ. আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ

রৌদ্রের দুপুর ভ'রে; —বারবার রোদ তার সুচিক্বণ চুল

কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়; —দহে বিলে চঞ্চল আঙুল

বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,

ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ;

(এখানে আকাশ নীল, *রূপসী বাংলা*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৩৩)

তবে এই রূপসী বাংলার প্রকৃতি সম্পৃক্তিতে কবির মনে কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর, একটা বিষণ্নতার সুর পাওয়া যায়। বাংলার জীবন সম্ভার এখানে বিষাদে রূপায়িত :

—একদিন অমরায় গিয়ে

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়

বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

(বাংলার মুখ আমি, *রূপসী বাংলা*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১২০)

এই বিষণ্নতা হলো ভাঙনের বিষণ্নতা। আসলে কবি-সত্তার আঞ্চল স্থিতি যেন রূপসী বাংলার এই মাটিতে, এই নীল আকাশে, জলসিঁড়ি, ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে, গাজন, কীর্তন, ভাসান, মাথুরের গানে, কান্তারের বিজন ঘাসে, বল্লাল সেন, মানিক মালা, শঙ্খমালা, ধনপতি সদাগর যে ঘাসের নীচে শুয়ে আছে, সেই চিহ্নিত ঘাসে। পল্লিবাংলার গ্রামীণ পটদীপে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলেছে জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কবি-জীবনে তার আভা বিস্তৃত হয়েছে। আবহমান বাংলার লোকজীবনের চিত্র অংকন করে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতাকে করেছেন বাংলাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনঘনিষ্ঠ। বিষ্ণু দে'র কবিতায় লোকজ উপাদান লোকজ অনুষঙ্গ প্রবলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর 'সাতভাই চম্পা' কাব্যগ্রন্থের লোকজ জীবন ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিধৃত।

তিরিশের দশকের উজ্জ্বল নক্ষত্র জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ভিন্ন ধারায় তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর কাহিনি কাব্যদ্বয়– *নক্সী-কাঁথার মাঠ*

(১৯২৯) ও *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৩) গ্রামীণ ও লোকজ উপাদানে ভরপুর। কাব্য দুটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর বিখ্যাত এ দু'টি কাহিনি কাব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পল্লির উপকরণ দিয়ে জসীম উদ্‌দীন তাঁর কাহিনি কাব্য দু'টি অত্যন্ত আধুনিক ও স্বাবলম্বী করে তুলেছেন যা গ্রাম্যতা বর্জিত। *নক্সী-কাঁথার মাঠ* কাব্যে জসীম উদ্‌দীন যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করেছেন তা গ্রামজীবনের অতি পরিচিত বাস্তব চিত্র, গ্রামীণ লোকাচার, গ্রামীণ উপাদানে ভরপুর। অর্থাৎ, কবি মূলত পল্লির বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে তাঁর কাহিনি কাব্যকে সুকৌশলে সুশৃঙ্খলভাবে মালার পর মালা গেঁথে সুগঠিত রূপ দিয়েছেন।

গ্রামীণ বিষয়বস্তু ও উপাদান জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের মৌলিক দিক হলেও উপস্থাপনায় কোনো রকম গ্রাম্যতা লক্ষ করা যায়নি। পল্লির বিষয়বস্তুকে কাব্যে রূপদান করলেও তিনি উপস্থাপন করেছেন সাহিত্যিক রূপাশ্রয়ীর মাধ্যমে। তিনি পল্লির সবুজ ও শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়েছেন। তাঁর মানসলোকে ছিল পল্লির দ্যুতিময় ভাবনা। পল্লির মানুষের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। কাহিনির শুরুতেই দুটি গ্রামের সহোদরের রূপ :

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও মধ্যে ধুধু মাঠ,/ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।
এ গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হেথায় গাছ;/গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গায় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল-কায়া,/ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় ঘরের মায়া।

(*নক্সী-কাঁথার মাঠ*, পৃ. ৯)

গ্রামের বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ লোকাচার বিশ্বাস। এখানে কবি গ্রামীণ লোকাচারের বর্ণনা দিয়েছেন অতিথি আপ্যায়নের বিভিন্ন আচারের মাধ্যমে– বাড়িতে পরিচিতরা বেড়াতে এলে তার জন্য শীতল পাটি বিছিয়ে দেওয়া এবং মোরগ ধরে মাংস রান্না করা এসবই গ্রামীণ লোকাচার যা কাব্যে পরিস্ফুট। লোকাচারের সঙ্গে পল্লির কিছু বিশ্বাস একান্তে গ্রামীণ মানুষ অন্তরে লালন করে আসছে বংশ পরম্পরায়। ভীষণ খরায় উদ্বিগ্ন গ্রামের কৃষকরা বৃষ্টির প্রার্থনা করে দরগাতলায় দুধ দেয়, শিরনী দেয়– 'নৈলা' গান গায়, মেয়েরা বদনা বিয়ের গান গাইতে বের হয় :

মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা ভরা জল,
তেল হলুদে কানায় কানায় করছে ছলাৎ ছল। (*নক্সী-কাঁথার মাঠ*, পৃ.২০)

তারা মেঘকে ডেকে ডেকে বলে :

আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,/নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,/আজকে যেন দেয়ায় ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।

(*নক্সী-কাঁথার মাঠ*, পৃ. ২১)

গ্রামের মেয়ের দলের বারো মেঘের গানের মাধ্যমে বদনা বিয়ের নামে মাঙন করতে যাওয়া লৌকিক বিশ্বাসের অন্তর্গত :

> বাংলার লোকগীতিকা ও বৈষ্ণব-বাউল-মুর্শিদী গানের ভাণ্ডার থেকে গৃহীত বর্ণ-বিন্যাসে পুরনো ছবির অস্পষ্ট রেখাগুলি মৌলিক দীপ্তি ফিরে পেলো। যে সৃজন-ক্ষমতার গুণে অভিজ্ঞতার জন্মান্তর ঘটে, নকসী কাথাঁর মাঠ কাব্যে তার অপ্রতুলতা নেই। (আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৯৯)

গ্রামীণ বিয়ের যে উৎসব এবং মুসলিম সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে গানের আসর বসানো এবং কেতাব পড়ার যে রীতি, কবিতায় তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে উঠে আসে– চম্পা, কালু-গাজী, মামুদ হানিফ সোনাবান ও জয়গুন বিবির কথা।

কাব্যের প্রধান দুটি চরিত্র রূপাই-সাজুর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটিয়েছেন। অনেক সময় গ্রামীণ সংস্কৃতিতে প্রকৃত নামের পরিবর্তে পরিবারের সেজ মেয়েকে সাজু বলে ডাকার রীতি। *নক্সী-কাঁথার মাঠ*-এ কবি নাম সংক্রান্ত বিষয়টি আমাদেরকে দেখিয়েছেন। একজন গ্রামবাংলার স্নেহময়ী বিধবা মা সন্তানের অসুস্থতায় ব্যাকুলতার চিত্র পাওয়া যায় কিছু লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে। রূপার মা ছেলের অসুস্থতার কারণ ধরতে পারছে না। তার সোনার টুকরো ছেলে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। অস্থির মা গ্রামের প্রসিদ্ধ পীরের দরগায় সিন্নি মানত করে এবং ছেলেকে পানি পড়া এনে খেতে দেয়। যার পরিচয় পাওয়া যায় *নক্সী-কাঁথার মাঠ* কাব্যে।

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে খুবই নিন্দনীয় বিষয়– যে বাড়িতে বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকে সেই বাড়িতে জোয়ান পুরুষের আনাগোনা বেড়ে যায়। সাজুর মায়ের সতর্কবার্তার ভেতর দিয়ে কবি বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। সাজুর মা বেশ কড়া ভাষায় রূপাইকে জানিয়ে দেয় তাদের বাড়িতে যেন না আসে। আলোচ্য কাব্যের প্রায় প্রতিটি চরণের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে গ্রামবাংলার লোকজ সংস্কৃতির চিরায়ত ঐতিহ্য।

নক্সী-কাঁথার মাঠ কাব্যের ন্যায় *সোজন বাদিয়ার ঘাট* কাব্যেও গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের চিত্র সুস্পষ্ট। গ্রামীণ সহজ সরল সাধারণ মেয়ের ভেতর তার প্রেমিক পুরুষের প্রতি যে ভালোবাসা তার প্রকাশ চমৎকারভাবে এসেছে– দুলীর প্রেমিক পুরুষ সোজন। ভালোবাসার এই ধনকে সে কোথায় লুকোবে ভেবে পায় না। সিঁদুর কৌটায় ও শাড়ির আঁচলের তলায় দুলির প্রেমাস্পদের নির্ভরতার জায়গা, যা লোকচক্ষুর আড়ালে। কৃষকের ছেলের ভালোবাসার মধ্যে জেগে উঠে কৃষি উপাদান– সোজনও তার প্রেয়সীর জন্য রোপন করবে বউ টুবাণীর চারা, কুমড়োর ফুল, শাকের মতো বড় আলু

প্রভৃতি। প্রেয়সী দুলির জন্য অসাধ্য কিছুই নেই। এখানে দেখা যায় পল্লির কৃষকের ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, ফসল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কবি। গ্রামীণ জীবনের যে লোকজ সংস্কৃতি তার অসাধারণ উপস্থাপন ঘটেছে বিশেষ করে জসীম উদ্‌দীনের এই দুটি কাহিনি কাব্যে। এছাড়া তাঁর খণ্ডকাব্যেও এর বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

তিরিশের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতার গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের উৎস সন্ধানে দেখা যায়, কীভাবে বাংলা কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজীবন অনুষঙ্গ কবিদের চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতার্থে বলা যায়, চর্যাপদ থেকে তিরিশোত্তর কবিদের কবিতায় বিভিন্নভাবে এই বোধ রূপান্তরিত হয়েছে এবং বহু বর্ণিল আকারে বাংলা কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে।

গ্রন্থ-সহায়িকা :

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

২. আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *জীবনানন্দ দাশ : কবিতাসমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ২০১৮

৫. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

৬. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮৭

৭. জসীম উদ্‌দীন, *নক্সী-কাঁথার মাঠ*, পলাশ প্রকাশনী, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮২

৮. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯৩

৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পাদিত], *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮১

১০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮৯

১১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পাদিত], *কালকেতু উপাখ্যান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা, ১৪০২

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (সূচনাংশ, সোনার তরী), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৯৩

১৩. শামসুজ্জামান খান, *মাটি থেকে মহীরুহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

১৪. সত্যব্রত দে, *চর্যাগীতি পরিচয়*, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

চল্লিশের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ১৯৩৭ সালে জাপান কর্তৃক চীনদেশ আক্রমণ এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়ে যায় গোটাবিশ্বকে। এর প্রভাব বলয় থেকে সমগ্র বিশ্বের কেউ মুক্ত থাকতে পারেনি। তদুপরি, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। যদিও ব্রিটিশ ও হিন্দু পরিচালিত পত্রিকাগুলোর প্রচারণার ফলে লাহোর প্রস্তাব জনসাধারণের কাছে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে পরিচিতি লাভ করে। বিশ্বফ্যাসিবাদ আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বের সকল দেশের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মুক্তচিন্তাসম্পন্ন মানুষদের একই সারিতে দাঁড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ তখন আন্দোলনে উত্তাল। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশও উত্তাল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মীরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনি। চল্লিশের দশকে ঘটল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৪১), গান্ধীজির ডাকে ভারত-ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবর্গের মুক্তির জন্য আন্দোলন, কলকাতায় বোমাবর্ষণ, ১৯৪৩-এ মন্বন্তর, নৌ-সেনা বিদ্রোহ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯৪৬), ডাক ও তার কর্মীদের হরতাল, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিমলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং ১৯৪৭-এ স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

চল্লিশের কবিতায় মৌলিকত্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলা নানাভাবে কবিদের উদ্বেলিত করে, যা তাঁদের কবিতায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৯১৭) ধ্বংসপ্রাপ্ত কালের প্রেক্ষাপট এ উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন আর স্বাধীন ও স্বার্বভৌম ভূখণ্ডের স্বপ্নেবিভোর এ উপমহাদেশ, ঠিক তখন উত্তাল ঢেউ তুলেছে পূর্ববাংলার কবিদের কবিতায়। মাটি, মানুষ আর ব্যক্তির অন্তর্জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব তাঁদের কবিতার মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। চল্লিশের দশকের কবিসম্প্রদায় কবিতা লিখেছেন– সময়ের অব্যবহিত চাপে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাগ (১৯৪৭) প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ফলে তাঁরা সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, রাজনৈতিক বিশ্বাসের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে কবিতা রচনা করেছেন। চল্লিশের দশকের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য– সমাজমনস্কতা, সমকালস্পৃষ্ট ও প্রতিবাদী ধারা।

চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে প্রধানত দু'টি ধারা প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমটি ইসলামি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ও দ্বিতীয়টি হলো বুর্জোয়া মানবতাবাদী। এই দু'টি ধারায় বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্ন সময়ে গড়ে তোলেন বিভিন্ন সংগঠন। 'সামন্ত মূল্যবোধের পুনর্জাগরণসূত্রে পাকিস্তান বা ইসলামি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নানা সময়ে সংগঠিত হলেন 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', 'তমুদ্দুন মজলিস', 'রওনক সাহিত্য সংস্থা', 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সাহিত্য সংস্থায়।' (মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২২৮) অপরদিকে যারা মানবতাবাদে বিশ্বাসী বা অসাম্প্রদায়িক দায়বদ্ধতায় আরোপিত 'তাঁদের সামনে খোলা ছিল তিনটি পথ : পাক শাসকচক্রের সঙ্গে আপোসের; কিংবা বিপ্লবের, সমাজ জীবন ও ইতিহাসের পথচ্যুত হয়ে আত্মবিবরে পলায়নের। কাব্যজীবনের প্রাথমিক পর্বে, বিশেষত সামরিক শাসন জারির (১৯৫৮) পূর্ব পর্যন্ত নতুন প্রজন্মের কবিরা, কিন্তু প্রতিরোধ বা সংঘাতের পথকে গ্রহণ করেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মানবিকতায়। আবহমান বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা সাহিত্যের গতিপথ নির্ণয় করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার পরিকল্পনা নিয়েই সৃষ্টি হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'।' (মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২২৮-২২৯) তখন নতুন কবিদের আর্বিভাব ঘটা সম্ভব ছিল না বিধায় অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী বিশ্বাসী কবিগণ এই সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করলেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে নিয়ে যে কোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও নিজস্ব সাহিত্যকে তার ঐতিহ্যে ধরে রেখে তাকে আধুনিকতায় পর্যবসিত করা। সেই সঙ্গে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূরে রেখে অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক চিন্তাধারায় নিজেদের সাহিত্যকে তুলে ধরা। 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠিত হওয়ায় যারা এই সংগঠনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ইসলামি ভাবধারায় বিশ্বাসী, তারা থেমে থাকেনি। আরবি ফার্সি ও পুথি সাহিত্যের আলোকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ।

ইসলামি ভাবাদর্শে বা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী কবিদের মধ্যে চল্লিশের দশকের দুই জন প্রধান কবি হলেন সৈয়দ আলী আহসান ও অপরজন ফররুখ আহমদ। তবে চল্লিশের দশকের আরো দুজন কবি পাকিস্তানি বা ইসলামি ধারা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছেন যার ফলে তাদের কবিতায় আধুনিকতার সূচনা ঘটে। তাঁরা হলেন আহসান হাবীব ও আবুল হোসেন।

চল্লিশের দশকে কবিতা ও রাজনীতি সমান সক্রিয় হয়ে সাম্যবাদী জীবনদর্শনকে কবিতায় ধারণ করেছেন এ সময়ের কবিরা। তৎকালীন মন্বন্তরের ইতিহাস একটি দেশ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়ার

ইতিহাস। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, মন্বন্তর, দেশভাগ প্রভৃতি বিষয়বস্তুর চিত্র ফুটিয়ে তুলে চল্লিশের কবিরা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া তাঁদের কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো 'কাব্যভাষা' :

> সমালোচকদের মতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত আমাদের বর্তমান ভূ-খণ্ডের কবিতায় তখন তিনটি ধারা সক্রিয় ছিল। ধারা তিনটি হচ্ছে : এক. প্রগতিশীল মতাদর্শ দুই. রক্ষণশীল পাকিস্তানি বা ধর্মীয়-মনোভঙ্গিসম্পন্ন মতাদর্শ এবং তিন. মানবতাবাদী মতাদর্শ। এই তিন ধারার উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম কুদ্দুস, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ। (মাসুদুল হক, *হাজার বছরের বাংলা কবিতা*, পৃ. ৬১)

চল্লিশের কবিতার মূল ধারাটি প্রাকরণিক ও উপকরণগত ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের নবচেতনা, আঙ্গিকতার অভিন্নতা, বিরূপ অভিজ্ঞতা, প্রতিবাদমুখরতা, সমাজ পরিবর্তনমুখী অভিপ্রায়, শব্দ প্রয়োগের স্বাতন্ত্র্য, প্রগতিশীল মানসিকতা এবং প্রকাশের ধরন প্রায় একই ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাস, সামাজিক বৈষম্য, মনোদহন, যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ, শোষণ ও শাসক বিরোধিতা, শ্রেণিমুক্তি ও শ্রেণি সংগ্রাম তাঁদের কবিতার প্রধান উপজীব্য ছিল। বিশ শতকের চল্লিশ দশকের কবিরা এই উপমহাদেশের পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নতুন কবিতার ভুবন নির্মাণ করেছেন তাতে যে আশাবাদী এবং ত্রিশোত্তর আধুনিক এক নতুন কাব্যভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তা আজো বহমান। প্রধানত দেশবিভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, '৫৪র যুক্তফ্রন্ট গঠন ও মৌলবাদী পাকিস্তানে বাঙালির জাগরণ, '৫৮তে আইয়ুব খানের মার্শাল ল এবং সর্বোপরি ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এই ভূখণ্ডের চল্লিশের দশকের কবিদের কবিতায়ও বিপুল আলোড়ন তুলেছে। আবার পাকিস্তানি চেতনা অনেকের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সচল থাকায় তারা সেভাবে পরিচালিত থেকেছে, বিভ্রান্ত থেকেছে, আবার প্রগতির বিপরীতে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পেয়েছে। তারপরও পূর্ববাংলার কবিরা এক মহাজাগরণ ঘটিয়েছেন কবিতার ভুবনে, যোগ করেছেন নতুন ধারার। তিরিশ এবং চল্লিশের কবিদের সৃষ্ট আধুনিকতা এবং নতুনধারার ওপর ভর করে পরবর্তীকালের কবিরা সৃষ্টি করেছেন আধুনিকতার নতুন সোপান।

চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আহসান হাবীব (১৯১৭-'৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-'৭৪), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-'৭৫) এবং সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আহসান হাবীব

বাংলাদেশের কবিতায় চল্লিশের দশকের অন্যতম কবি হলেন আহসান হাবীব (১৯১৭-'৮৫)। সাতচল্লিশ পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় পরিলক্ষিত হয় মানবতাবাদী দায়বদ্ধতা। আহসান হাবীব ছিলেন সামাজিক সমস্যা সচেতন, সেই সঙ্গে প্রকৃতি ও স্বদেশ সচেতন কবি। তিনি উচ্চকণ্ঠ নন, তীব্র যন্ত্রণাও তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত, ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু শব্দ ব্যবহার এবং ছন্দের নির্ভাবনাময় প্রয়োগে তিনি রোমান্টিক :

> আহসান হাবীবের কবিতায় স্নিগ্ধতা এবং অলস অপরাহ্নের বিশ্রামের আনন্দ আছে। যদিও সামাজিক বক্তব্য তাঁর আছে এবং ধনবণ্টনের অসাম্যের কথা তিনি ভাবেন, কিন্তু বক্তব্যগুলো কোনও প্রকার যন্ত্রণা নিয়ে কাব্যে সমর্পিত হয়নি। বিষয় নির্বাচনে তিনি আধুনিক। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৪৮৫)

চল্লিশের দশকের কবি আহসান হাবীব। সামাজিক বাস্তবতা, মধ্যবিত্ত মানুষের সংগ্রামী চেতনা এবং সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় শিল্পসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। সমকালীন সমাজ এবং যুগ ও জনজীবনের জটিলতা তাঁর কাব্যে স্থান করে নেয়। 'সমাজ ও সংসারের বিবিধ সমস্যা, দুর্বিসহ ভারাক্রান্ত মানবাত্মার আর্তি এবং নৈরাশ্য তাঁর বহু কবিতার উপজীব্য।' (মাহবুবা সিদ্দিকী, *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজসচেতনতা*, পৃ. ২৮৮)। আহসান হাবীব প্রসঙ্গে চল্লিশের দশকের কবি সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য স্মর্তব্য :

> আহসান হাবীবের মধ্যেও সমাজ-সচেতন মনোভঙ্গীর পরিচয় সেই যুগে স্পষ্ট। শব্দে ততটা নয়– যতটা বক্তব্যে। শব্দে নয় এই কারণে যে, আহসান হাবীবের শব্দ ব্যবহারটা রোমান্টিক ভাবালুতা পূর্ণ এবং তার মধ্যে একটা রসাবেশ আছে। ... আমি সাধারণ মানুষের কথা বলব, যে সাধারণ মানুষ পথে কাজ করে, ইট খোলায় কাজ করে অথবা নদীর তীরে নৌকায় যখন আলকাতরা লাগানো হচ্ছে সেই আলকাতরা লাগানো দেখছে এবং নিজের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা গণনা করছে। পূর্ব পাকিস্তানে পরবর্তীকালে যে সমাজ-সচেতন ভাবাবহ কবিতায় এলো তার মূলে আহসান হাবীবের এ ভাবগুলো কাজ করেছে। (সৈয়দ আলী আহসান, *আমাদের সাহিত্য*, পৃ. ২৮-২৯)

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের কবি আহসান হাবীবের কবিতার কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হলো মানুষ– যে মানুষ সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অস্তিত্ব রক্ষায় উন্মুখ এবং যে মানুষ দেশকালের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় :

> উপজীব্য করে তোলেন সেই আধুনিক মানুষকে যে মৌলিক অর্থেই উৎকেন্দ্রিক, নিজের প্রকৃত অবস্থান থেকে উন্মূলিত। ব্যক্তিজীবনের স্থিতিহীন, অনিকেত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই বোধটিকেই আহসান হাবীব মূলত উপজীব্য করে তোলেন তাঁর কবিতায়। (মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২৭৩)

গ্রামবাংলার আশ্রয়হীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আহসান হাবীব সারা জীবন তাঁর কবিতায় গেয়েছেন জীবনের জয়গান। তিনি বিষয়বৈচিত্র্যে কবিতাকে সামাজিক অঙ্গীকারে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তির শেকড়-সন্ধান এবং মা-মাটি-মানুষের প্রতি জীবনঘনিষ্ট মমত্ববোধ তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

আহসান হাবীব কাব্য সাধনায় প্রথম উন্মেষ ঘটান 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। মানবতাবাদী কবি আহসান হাবীব বাংলাদেশের কবিতার গোড়ার ধারাকে বহন করে এসেছেন। হাসান হাফিজুর রহমান এ প্রসঙ্গে 'আধুনিক কবি ও কবিতা' গ্রন্থে বলেন :

> বাংলা কাব্যের যে ধারা বিবর্তন ও প্রগতিতে অব্যাহত রয়েছে আহসান হাবীব তার সঙ্গে সংলগ্ন। এবং সেই সঙ্গে একথাও বলেছি, এই ধারা সমাজনির্ভর। (সব দেশেই বিবর্তনপ্রবণ-ধারাটি সমাজনির্ভর)। আহসান হাবীব সমাজের সর্বতোব্যক্ত বিচ্ছুরণের প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে ব্যক্তির গভীরে যেতে পরাঙ্মুখ। তবে আহসান হাবীবে যে একটা ক্ষুণ্ন দেশাত্মবোধের সুর আছে, সেইটেই তাকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে। (রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, পৃ. ৪৭০)

আহসান হাবীব সমাজের আলোড়ন, ক্লান্তি, অবসাদ, আকাঙ্ক্ষা, বিদ্রোহ, উদ্যোগ এবং আত্মগত স্বরূপের প্রতিফলনে তিরিশের ধারাকে পুষ্ট করে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। আহসান হাবীবের কবিতায় এই ধারার এমন এক যুগচিহ্নকে রূপায়িত করার প্রয়াসে উন্মুখ, যখন সঙ্কট, স্ববিরোধিতা, আশা, আস্থা আর বিদীর্ণ হতাশা একসঙ্গে বাংলাদেশের সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে। হাসান হাফিজুর রহমানের মন্তব্য স্মতর্ব্য :

> আহসান হাবীব খোলা চোখের কবি, কিন্তু সক্রিয়তা তাঁর মধ্যে কম। সে কারণে সমাজসত্যের সাধারণীকৃত প্রাথমিক রূপটির সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি আঁকতে এবং তার পারস্পর্য সন্ধানে যতখানি উৎসাহিত তিনি হতে পারেন, সমাজের গভীরতর পরিচয়-জটলার মধ্যে বিচরণে তাঁর আগ্রহ ততখানি নয়। (রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, পৃ. ৪৬৬)

আহসান হাবীব তিরিশের কবিদের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে পথ চললেও তিনি সেই পথ চলতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন এক ভিন্নপথ। তিনি সমাজ-সম্পৃক্ত কবি :

> ত্রিশোত্তর কবিতার প্রধান ধারা সমাজ-সম্পৃক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। বরং সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্বের বোধ, জীবনের নেতিবাদই ত্রিশোত্তর কবিতার প্রধান ধারার বিষয়বস্তু। (তুষার দাশ, [ভূমিকা], *আহসান হাবীব কবিতাসমগ্র*, পৃ. ১৩)

ত্রিশোত্তর ধারার প্রধান কবিদের কবিতায় যে হতাশা, নেতিবাচকতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন নিমজ্জিত ঘনঘটায় ভরপুর তা আহসান হাবীবের কবিতায় ধরা পড়ে না। বলা যায়– তেমন তীব্রতা পায়নি। তবে সমাজের মানুষের প্রতি ছিল তার দায়বদ্ধতা। তিনি মানব হৃদয়ের ছোট ছোট আশা-ভালোবাসা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন প্রণালীর মধ্যদিয়ে :

> আমার পরনে থাকবে পা'জামা/গায়ে একটা সবুজ ডোরাকাটা শার্ট।
> মাথার টুপিটা কালো,/তাতে পাঁচ সাতটা হলুদ বরণ ফুল।
> পায়ে বাটা কম্পেনীর ক্যানভাস্।/লাল রঙের সিল্কের রুমাল
> টাই করে গলায় বাঁধা। (কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৪৪-৪৫)

শুধু কি মানবতার দিকেই আহসান হাবীবের লক্ষ্য, তাঁর চিন্তা ছিল ভবিষ্যৎ বংশধরকে নিয়েও– তাই নতুন প্রজন্মের আবাসভূমিকে নবজাতকের উপযোগী করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তিনি :

> শিশু আর কিশোর যুবক সন্তানেরা আমাদের
> রয়ে যাবে। সেঞ্চুরীর চারা
> দীর্ঘদিন পরে জানি ফুল দেবে।
> দীর্ঘদিন।
> আমরা তখন বেঁচে নেই পৃথিবীতে। (রেখে যাব, *সারা দুপুর*, পৃ. ১৩৮)

আগামী সন্তানের জীবন যেন সুন্দর হয়, এই কামনা ও আর্শীবাদে রত ছিলেন কবি। কেবল তাই নয়, আহসান হাবীব ছিলেন আপাদমস্তক বাংলার জনপদের কবি। জীবনানন্দ দাশের নৈসর্গিক চিত্ররূপময়তার আবহ আহসান হাবীবের কবিতায় দৃশ্যমান হলেও তিনি পুরোপুরি জীবনানন্দীয় আকর্ষণ কাটিয়ে উঠে আবহমান বাংলার ছবি সম্পূর্ণ নতুন করে আঁকার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে আহসান হাবীব রচনাবলির সম্পাদক আহমদ রফিকের মন্তব্য স্মতর্ব্য :

> তাই কৃষিনির্ভর ও নদীমাতৃক গ্রাম বাংলার দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার এমন সব ছবি আঁকেন যেখানে কৃষক থেকে কামার, কুমোর, মাঝি, কিংবা ধানভানা মহিলাদের ছবিও ভিড় করে আসে। রোমান্টিক চালচিত্রের বিপরীত আলোয় এরা যেন দুঃস্থ গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার জীবন্ত মিছিল। (আহমদ রফিক সম্পাদিত, *আহসান হাবীব রচনাবলী*, পৃ. ১৪)

বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার মানসেই বাংলাদেশের বেশিরভাগ কবিরা তাঁদের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনকে পরিস্ফুট করে তোলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনই চল্লিশের কবিদের মুক্তির পথ দেখান। বাঙালি জাতির যে একটা বড় ঐতিহ্য রয়েছে তার গ্রামীণ ও লোকজ

সংস্কৃতি, তা অন্যান্য কবিদের মতো আহসান হাবীবও তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন। বিশেষ করে তাঁর *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭), *ছায়া হরিণ* (১৯৬২), *আশায় বসতি* (১৩৮১), *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় তাঁর কালের গ্রামীণ সমাজকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন।

আহসান হাবীবের ছেলেবেলা গ্রামে কাটলেও তিনি জীবিকার অন্বেষণে কলকাতা ও ঢাকা শহরে বসবাস করেন। শহরের বাসিন্দা হলেও তাঁর অন্তরে লুকায়িত যে মাটির মমতা-রস, শহুরে জীবনের ক্লান্তি হতাশার ভেতরও তা নষ্ট হয়ে যায়নি। পল্লিবাংলার নরম মাটির সোঁদা গন্ধ তিনি প্রতিনিয়ত উপভোগ করতেন তাঁর নগর জীবনে। তাঁর সেই সোনালি দিন ও মাটির প্রতি টান *রাত্রিশেষ* কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশমান :

> দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
> বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান। (দিনগুলি মোর, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৩৯)

কবির জীবন বিকলপক্ষ পাখির মতো অনুর্বর মাটিকে ঘিরে অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি গ্রামীণ জীবনকেই বারবার স্মরণ করেছেন। পেলব মাটির প্রতি ঋণ ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'এই মন–এ মৃত্তিকা' কবিতায় :

> বুঝেছি সেদিন মানুষ এমনই দীন,
> এ- মাটির কাছে আছে আমাদের এমনি অশেষ ঋণ।
> অনাদি কালের বন্ধন আর বঞ্চনা এক সনে
> চির জীবনের শৃঙ্খলসম জড়ানো মানব মনে! (এই মন-এ মৃত্তিকা, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৪১)

উপর্যুক্ত কবিতায় আহসান হাবীব তাঁর শৈশবের গ্রামীণ আবহের নিরীক্ষণ করেছেন। শেকড়ের সন্ধানে তিনি বারবার ডুব-সাঁতার কেটেছেন। শৈশব-কৈশোরের ফেলে আসা দিনগুলো কাব্যকলা রচনায় তাঁকে দিয়েছে অফুরন্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারের সাহস ও শক্তি। তাঁর মন ও মৃত্তিকা বাংলার গ্রামের সঙ্গে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ :

> নিবিড় রঙের আবরণ–ঘন যে আভরণের তলে
> এই পৃথিবীর কুৎসিত প্রাণ হীন কামনায় জ্বলে,
> প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু,
> এইমন আর এ–মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু। (এই মন–এ মৃত্তিকা, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৪১)

মাটির গন্ধ তাঁর মনের গভীরে মোহনীয় হয়ে ওঠে। তাঁর তনুমনে সীমাহীন অনুরণনের সমাহার। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার সঙ্গে তাঁর বন্ধন যে অটুট তা বোঝাতে চেয়েছেন। কবি আত্ম-আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে হেঁটেছেন সারাজীবন। তাঁর আত্মপরিচয় তাই গ্রামীণ জীবনকে ঘিরেই

প্রোজ্জ্বল। বাংলার মাটি ও মানুষের অবিশ্রান্ত মুখর পদধ্বনিতে কবি প্রভাস্বর। কবির শরীরে লেগে আছে মাটির সুবাস। তিনি আত্ম-আবিষ্কারের ঋতু চেতনায় দেদীপ্যমান, আত্মপরিচয় প্রদানের সুদৃঢ় মনোভঙ্গিতে প্রোজ্জ্বল, গ্রাম-প্রকৃতির আর মানুষের অবিশ্রান্ত মুখর পদধ্বনিতে ভাস্কর :

আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই। (আমি কোনো আগন্তুক নই, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*, পৃ. ২৮২)

কবিতার ভেতর দিয়ে আহসান হাবীব গ্রামের সঙ্গে যে একই সূত্রে বাঁধা তার পরিচয় দিচ্ছেন– তিনি কিছুতেই তাঁর ঐতিহ্যের পোশাক পাল্টাবেন না। অতি পরিচিত গ্রাম-প্রকৃতির লালিত সন্তান তিনি :

আসমানের তারা সাক্ষী/সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী/সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি/মাছরাঙা আমাকে চেনে।
(আমি কোনো আগন্তুক নই, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*, পৃ. ২৮১-২৮২)

কবিতাটিতে মৈয়মনসিংহ গীতিকার অনুসরণে কবি উদাহরণ দিয়েছেন। মৈয়মনসিংহ গীতিকায় চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে বিয়ে হওয়া যেমন পূর্ব-বাংলার মানুষদের ঐতিহ্যিক পরিচয় ছিল, তেমনি আহসান হাবীব আসমানের তারা ও জমিনের ফুল সাক্ষী রেখে তাঁর লোক-সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। জোনাকি, বাঁশ বাগান, জমিনের ফুল, পুবের পুকুর, ঝাকরা ডুমুরের ডালে তাকিয়ে থাকা মাছরাঙা পাখি– এই অপরূপ সুন্দর সাক্ষীগণ আর কোথায় পাওয়া যাবে আমাদের এই গ্রামবাংলা ছাড়া, আর এত সুন্দর উপস্থাপন কোথায় আছে! পাঠক হৃদয়মাত্রই নস্টালজিক হয়ে ওঠে।

গ্রাম মানেই উন্মুক্ত প্রকৃতি, সেখানে নিজস্ব উদারতা নিয়ে পশরা সাজিয়ে বসা, আর এই প্রকৃতির অনুষঙ্গ ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে কবিকে তাঁর ভালোবাসায় ভরপুর প্রকৃতিতে তিনি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন :

এখন হৃদয়ে বার বার
নির্জন দ্বীপের সেই অপরূপ রাজ-দুহিতার
প্রথম প্রেমের সুর ঢেউ তোলে। (শীতের সকাল, *ছায়া হরিণ*, পৃ. ৮৯)

লোকায়ত জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ নদী যেন গ্রামবাংলার এক সজীব রূপ। নদীকে ঘিরে রয়েছে পুরাতন দিনের সোনালি স্মৃতি যা বলতে গিয়ে হৃদয়কে নাড়া দিয়ে ওঠে। কি চমৎকার প্রাণবন্ত সেই দিনগুলি, কবির ভাষায় :

তোমার কি মনে পড়ে সেই ছোট্ট নদীটি, যে নদী
আমরা দুপুরে নিত্য প্রচণ্ড দুপুরে
হাতে হাত বেঁধে সাঁতরে পারাপার হয়েছি এবং
জোয়ারের জল কিছু তুলে এনে ছড়িয়েছি প্রত্যহ বাগানে? (সেই নদী, *আশায় বসতি*, পৃ. ১৬০)

নিস্তব্ধ দুপুরে নদীতে জোয়ারের জলে খেলা করা গ্রামীণ জীবনের একটি চমৎকার অধ্যায়। কারণ, জোয়ারের জল তুলে এনে বাগানে ছিটিয়ে দেওয়া গ্রামীণ অনুষঙ্গের বর্ণন। তাছাড়া বিকেলে নদীর তীরে বসে নদীর অবিরাম ক্লান্তিহীন চলার ছন্দ উপভোগ করা বাংলার অপরূপ রূপ। কবি একান্ত আবেগে আপ্লুত হয়ে বর্ণনা করে গেছেন সেই পুরানো নদীর কথা। স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেই সব দিনগুলি ঘাটের নৌকা, রূপালি আভা, স্নান করা, প্রিয়জনের মুখের ডাক সবই যেন আজ কবির স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেই সঙ্গে আমাদের কেউ যেন মনে করিয়ে দিচ্ছেন সেই অপরূপ সময়ের দৃশ্যপট। আবার কবির মনে হাহাকার উঠতো, ভাবনা হতো তার প্রিয় গ্রামের প্রিয় নদীটির অকাল মৃত্যু-চিন্তায় :

এই নদী আহা এই নদী যদি মরে যায়/ঘাট যদি ঢাকা পড়ে ঘাসে আর জঙ্গলে, তখন
আমরা অথবা/আমাদের সন্তানেরা কোথায় সহজ স্নানে
স্নিগ্ধ হবে, কোন ঘাটে/ইচ্ছেমত পা ছড়িয়ে বসবে তারা! (সেই নদী, *আশায় বসতি*, পৃ. ১৬১-১৬২)

বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নদীবিধৌত এই বাংলায় সেখানে আহসান হাবীব খুঁজে বেড়ান নিজের হারানো শৈশবকে। যে গ্রামের সুখের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে নদী, সবুজ ঘাস, ঘুঘুর ডাক, আমের বাগান, সব যেন তাঁকে প্রতিনিয়ত ডাকে। তিনি বড় বেশি ভালোবেসেছেন সেই পুরানো নদীটি আর গ্রামকে, যা উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। নদীকে হারানোর বিয়োগ ব্যথা কবির মর্ম-যন্ত্রণার কারণ। এটি যেন কবির অন্তরালে ফাটল, যার ব্যথা তিনি তাঁর হৃদয়তন্ত্রী দিয়ে অনুভব করেন :

রাতের বাতাসে আজ
কাঁপে না বাঁশীর ভাটিয়ালী।
নারিকেল সুপারীর বনে
অন্ধকার থম থম করে, (একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৬৪)

কবি শঙ্কিত ছিলেন প্রকৃতি বিনষ্টকারী মানুষের হায়েনারূপ দেখে। তাঁর জীবনে সোনামুখী নারকেলের শাখা, দুধ-সুপুরির বন, সোনালি রোদ, জোয়ারের জল, ঢেঁকির পাড়, হেলির পাতায় বোনা নরম পাখা, ঘুঘুর ডাক, গলাজলে বুক, বৈঠার শব্দ, মোরগ-ভোর প্রভৃতি গ্রামজীবন-সন্নিহিত রূপকল্পের সামন্তরালে কবির জাগরস্বপ্নে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে চেতন-অবচেতনের সার্বক্ষণিক নদী। এই নদীর অভিজ্ঞানেই কবির স্বপ্নময় লোকজীবনের প্রতিফলন ঘটে। লোকায়ত বাংলার ঐতিহ্যিক স্বরূপ উন্মোচনে তিনি নদীসত্তার অন্তঃপ্রদেশে প্রিয় স্বদেশ, স্বাধীনতা ও আপন শিল্পসত্তাকে স্থাপন করেন। অর্থাৎ, গ্রামবাংলার ছবি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে তিনি বারবার নদীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তাঁর কবিতায়। আবার কাহিনিকে সহজভাবে বোঝাতে কোথাও কোথাও রূপকের আশ্রয়ও নিয়েছেন কবি।

আসলে আহসান হাবীব সত্যিকার অর্থে মাটির মানুষ, তাই শহরে বসবাস করলেও তাঁর প্রাণ সর্বদা কেঁদে ওঠে ফেলে আশা গ্রাম ও লোকজ জীবনের জন্য।

আহসান হাবীব গ্রামীণ জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে এবং বিভিন্ন পরিবেশ ও চিত্রপট বোঝাতে যেমন নদীকে উপজীব্য করেছেন তেমনি গ্রামকেন্দ্রিক লোকাচারটিও তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি যা তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে প্রকৃতিগত ও অত্যন্ত সাবলীলভাবে। তাঁর *ছায়া হরিণ* কাব্যে 'হক নাম ভরসা' কবিতাটি বিশ্লেষণে এই লোকাচার বা লোকজ সংস্কৃতি কিছুটা প্রকাশ পায় :

আদাব সালাম অন্তে সমাচার এই
যে, হুজুর কাল ফজরের অনেক আগেই
তামাম মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে
সহি-সালামতে
এসে নিজের বাটিতে পৌঁছেচি। (হক নাম ভরসা, *ছায়া হরিণ*, পৃ. ৯৩)

বোঝা যাচ্ছে কোনো একজন কোথায় থেকে এসে সহি সালামতে নিজ গৃহে প্রবেশ করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। এখানে পত্র পাঠকের নিকট ক্ষমা চাওয়ার রীতিটিও ধরা পড়ে। মনিবের বাড়ি ছেড়ে এসে নিজ গ্রাম যে স্বর্গপুরি তা নানা লোকাচারের মাধ্যমে কবি দেখাচ্ছেন :

এই সেই গ্রাম
আহা এই সে পুরনো ভিটি জনম যেখানে
জীবনের সাতান্নটি বছর এখানে
কেটেছে, এবং আমি এখানে মানুষ। (হক নাম ভরসা, *ছায়া হরিণ*, পৃ. ৯৪)

আবার, কথায় কথায় গ্রামের মানুষ খুব সহজ-সরলভাবে অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে থাকেন। আহসান হাবীবের কবিতায় প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করার রীতিটিও বেশ চমৎকার। প্রবাদ-প্রবচন লোকজ-সংস্কৃতিরই অংশ। আহসান হাবীব তা প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত সাবলীল দক্ষতার মধ্য দিয়ে :

ভয় করে কথা কই
আমি ত এখন আপনার প্রজা নই,
আর ত আপনার মাখা তামাক খাই না
নিজে মাখি নিজে খাই কোথাই যাই না। (হক নাম ভরসা, *ছায়া হরিণ*, পৃ. ৯৫)

লোকজ অনুষঙ্গের আর একটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট, তাহলো খোদার নামে 'কসম' কাটা। এই বিষয়টিও লোকজ রীতির পর্যায়ে পড়ে :

পুরনো লাঙল আর কাস্তে হাতে লয়ে

কসম খেয়েছি আর বলেছি হে ভাই, (হক নাম ভরসা, *ছায়া হরিণ*, পৃ. ৯৫)

লোকজ ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী কোনো কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে মেয়েরা পরিপাটি পোশাক পরে তার সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন কবি। তাঁর সৃষ্ট সাধারণ ঘরের মেয়েকে অসাধারণ করে তুলেছেন কবিতার নায়কের সঙ্গে বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তাঁর ভালোবাসার মেয়েকে তিনি লোকজ করে তোলেন, সেই সঙ্গে থাকে গলায় হাঁসুলি, পায়ে মল– লোকজ সাজসজ্জা :

তুমি পরেছ লাল টক্‌টকে একটা শাড়ি।
যেটা কিনেছিলাম
ফেরিওয়ালার কাছে,
এক টাকা চৌদ্দ আনায়।
গলায় হাঁসুলী, পায়ে মল,
গায়ের কোর্তাটা অনেক দামী–
মল্লিক বাজারে কেনা। (কোন বাদশা'যাদীর প্রতি, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৪৫)

আবার লোকজ সংস্কৃতির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় মাথার নকশা করা টুপিতে, যা কবিতার নায়কের মাথায় থাকবে। নকশা করা টুপি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট হয় :

মাথার টুপিটা কালো,
তাতে পাঁচ সাতটা হলুদ বরণ ফুল। (কোন বাদশা'যাদীর প্রতি, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৪৪-৪৫)

গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে মাঝে মাঝেই জলে ভর্তি কলস পাশে রেখে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। সঙ্গে সাথীরা একে একে বিয়ে করে স্বামীর ঘরে যায়, মাসের পর মাস যায়, চৈতি খরায় দুপুরে ধুলো ওড়ায়, তবু তার প্রিয় ছেলেটি ফিরলো না। তারই চিত্রকল্প এঁকেছেন আহসান হাবীব :

আদ্যিকালের একটি মেয়ে সেই যে মেয়ে
ঘাটের পাশে কলসী রেখে রইলো চেয়ে
রইলো চেয়ে। (কাহিনী নিরন্তর, *আশায় বসতি*, পৃ. ১৬৪)

লোকছড়ার ব্যবহারও আহসান হাবীবের কবিতায় দেখা যায়। প্রচলিত লোকছড়া 'খোকন খোকন ডাক পাড়ি'-র পরিকাঠামো ও ছন্দস্পন্দ ব্যবহার করে কবি নতুনত্ব আনেন। ছেলেকে ভোলানোর জন্য মায়ের আকুল আকুতি চিরন্তন। তবে সেখানেও সমাজবাস্তবতার কথাই মনে করিয়ে দেয় :

মা কেঁদে কন, হায়রে অবোধ
বুড়ো খোকন বুঝলিনে,...
সং সেজে নেই সুখের সীমা
নিজের আদল খুঁজলিনে। (মায়ের ডাকের ছড়া, *আশায় বসতি*, পৃ. ১৬৬)

দুধ-ভাত বা দুধ দিয়ে আপ্যায়ন গ্রামীণ লোকজসংস্কৃতির অংশ। গ্রামে বসবাসরত মানুষ এই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। পল্লির সুখি-সমৃদ্ধ গৃহস্থের পরিচয় ফুটে ওঠে এরই মধ্য দিয়ে। আবার শীতলপাটি বিছিয়ে বিছানা পাতাও ছিল লোকজ সংস্কৃতির অনুষঙ্গ :

দুধ-সাগরে নাইয়ে দেবো আয়রে খোকন ঘরে আয়!

শীতলপাটি বিছানা দেবো খোকন ফিরে আয় রে আয়!! (মায়ের ডাকের ছড়া, *আশায় বসতি*, পৃ. ১৬৬)

গ্রামীণ লোকজ জীবনে রয়েছে ভাই-বোন এক সঙ্গে উঠোনে সতরঞ্চের ওপর বসে পুরানো গান শোনা– সেই গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে কোনো এক গায়ের বধূর মন কেড়ে নেয়া। গ্রামীণ লোকাচারের প্রকৃষ্ট ধারণা:

স্তব্ধ কদমের ডালে ক্লান্ত হরিয়াল

পাখা-নাড়ে–

মন বলে যাই

অকৃত্রিম সঙ্গীতের সুরে

ঘাটের বধূকে ডাকি; (মন বলে, *সারা দুপুর*, পৃ. ১৪০)

আবার লোককাহিনির কিছুটা আভাস পাওয়া যায় যখন কবি সোনার কৌটা কিংবা হীরের কৌটা তাঁর কবিতায় ব্যবহার করে অর্থবহ করে তোলেন :

সোনার কৌটোয় কিম্বা হীরের কৌটোয়

আমি তাকে দেখে খুশী নই। (এসো সঙ্গী হই, *সারা দুপুর*, পৃ. ১২৩)

পুতুল লোকশিল্পের বিশেষ একটি উপাদান আর মেলার পুতুল নাচ তা লোকসংস্কৃতির পুরানো ঐতিহ্য, শুধু ঐতিহ্যই নয় তা অত্যন্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মেলায় হাটে বিক্রি হয় এই পুতুল যা ছোট ছোট বাচ্চাদের আনন্দের খোরাক। মাটির ব্যাংকে খুচরা পয়সা জমিয়ে মেলায় পুতুল কেনার ঘটনাও খুব অপ্রতুল নয়। আর এই 'পুতুল'কে Subject করে কবি বিভিন্নভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ লোকাচারকে লালন করেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে :

পুতুল যদিও

তবু

হেমন্তের বিকেলের রোদে

মুখ মুছে

নিজ হাতে তুলে নেয়

সোনা মাখা ধানের মঞ্জরী দু'চারিটি

যদিও পুতুল। (পুতুল, *সারা দুপুর*, পৃ. ১২১)

গ্রামীণ মেলার পুতুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে– খাঁ- খাঁ- রৌদ্রে পোড়া পুতুলের দুঃখকে কল্পনার মধ্য দিয়ে। *দুই হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যগ্রন্থে দেখা যায়– গ্রামে আলেফ মুনশি, লক্ষণ মুচি, মতি সওদাগর, ভুবন কামার, কাজেম বয়াতি প্রমুখ শ্রেণি-পেশার মানুষের বসবাস। নানান ধরনের মানুষের মিলনমেলা হলো গ্রামবাংলা। এরা লোকসমাজের প্রতিভূ :

ভুবন কামারের কারখানা/লক্ষণ মুচির একচালা আর
মতি সওদাগরের মুদিখানা ছাড়িয়ে/তার নৌকো যখন লালাবাবুর হাট বরাবর
খালেকের হাতে তখন সরু আর মোটা দু'টি শনের রশি/স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট আবেশে কাঁপতে থাকে,
কেবলই কাঁপতে থাকে এবং তারপরেই নদীর নাম নীলমণি।

(আবহমান, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*, পৃ. ২৪২-২৪৩)

কাজেম বয়াতির কণ্ঠের লোকসঙ্গীত অনেক মানুষের ভিড়ে বাড়ির উঠোনে 'ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জামাল' এর প্রেমকাহিনির ঘটনা লোকসংস্কৃতির চিত্রকেই যেন বারবার মনে করিয়ে দেয়। পাশাপাশি কবির মনে কষ্ট এসব আজ আর নেই। গ্রামবাংলার নানা প্রকার লোকজ-সংস্কৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায় :

ও বাড়ির বিরাট উঠানে
বিরাট জামাতে এসে দেখা দিয়ে যেত
'ছয়ফলমুলুক' আর বদিউজ্জামাল'
বহু রাতে।
সে উঠান আজকে নীরব! (একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ, *রাত্রিশেষ*, পৃ. ৬৪)

আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় লোকায়ত জীবন খুঁজে পেয়েছেন মেলার পুতুল এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাঁশের সাঁকো, গঞ্জের মেলা, রঙিন বাঁশের বাঁশি, পাখির ডানার ঝাপটার ভেতরে। এছাড়াও রয়েছে নদীর ঘাটে একাকী মেয়ের কলস রাখা উদাস দৃষ্টি। রাখাল বালক, লাল শাড়ি, বেল ফুল, কদম ফুল ইত্যাদি বিস্তৃত বিষয়। এই সব কিছুর সঙ্গে আবার তাঁর কবিতায় চলে আসে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের নায়ক নায়িকার প্রেমের কাহিনি :

তুমি খুব রাখাল রাখাল বলো
তুমি খুব বটের ছায়ার কথা বলো
জোয়ারের জলে ভাসা কদম ফুলের কথা বলো
ভরা কলসী নীল শাড়ী রূপোর ঝুমকোর কথা
তুমি খুব বলো। (পারঙ্গম একজন, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*, পৃ. ২৬৬)

এখানে নীল বসনা সে রাধিকা আর জয়নালের আড়ালে বাঁশি সম্পর্কে কৃষ্ণকেই মনে করিয়ে দেয়। আহসান হাবীব সত্যিকারের জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন কবি। তিনি তাঁর কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজীবনের

অনুষঙ্গ দেখিয়ে দেন কখনো মৈমনসিংহ গীতিকার আড়ালে কখনোবা রাধাকৃষ্ণের লৌকিক কাহিনিকে আশ্রয় করে, আবার কখনো লোকশিল্পের বিশেষ সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন যা 'পুতুল' এর মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করেন। একজন মানব দরদি আর মা মাটির টানে গ্রামীণ সংস্কৃতি দ্বারা আকৃষ্ট ও আবিষ্ট না হলে কখনই এমন বাস্তব উদাহরণের ভেতর দিয়ে তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ আবহ ও চিত্রকল্প এবং লোক-সংস্কৃতি, লোকাচার ও লোকজীবন তুলে ধরতে পারতেন না। তিনি শহরে বাস করলেও কখনো তাঁর ঐতিহ্য ও শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হননি।

আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজচেতনা ও লোকজ বাস্তবতার হৃদয়গ্রাহী ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় মুখ্য স্থান দখল করেছিল এদেশের মাটি ও মানুষ। কবিতায় লোকমুখের ভাষা ব্যবহার করে আহসান হাবীব গ্রামীণ জীবনকে তুলে ধরেন। তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক বা লোকজীবনভিত্তিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর। যেমন : বিড়ি, নুন, তেনা, বাটি, শানকি, কাঁকই, কুপি, বাজান, নাইওর প্রভৃতি। এ ধরনের আঞ্চলিক বা লোকজীবন সম্পৃক্ত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেন।

আহসান হাবীবের কবিতায় গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে প্রতিদিনের ধুলোমলিন বাংলাদেশের চিরচেনা প্রকৃতিকে ঘিরে। আহসান হাবীব আমাদের পল্লিবাংলার ঐতিহ্যকে নিয়ে রীতিমতো তাঁর কবিতায় বিশেষ স্থান করে দেন। তাই তাঁর কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজীবনের রূপান্তর ঘটেছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে এবং নান্দনিক ব্যঞ্জনায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফররুখ আহমদ

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। এই পটভূমিতে রচিত হয়েছে ফররুখ আহমদ (১৯১৮-'৭৪) এর কবিতা। বাংলাদেশের কবিতায় চল্লিশের দশকের প্রধান কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ অন্যতম। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাঁকে মুসলিম পুনর্জাগরণের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবি হিসেবে অভিহিত করা যায়। চল্লিশের দশকের কবিরা ক্রমাগত আধুনিক কবিতার ধারা সম্পর্কে সজ্ঞান হয়েছেন এবং বায়ান্ন পরবর্তী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে দেশ মাটি ও মানুষকে আবিষ্কার করেছেন অপরিসীম মমত্বে :

> বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন ফররুখ। এই ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্য সন্ধানেই চল্লিশের দশকে পুঁথিসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন একদল শিক্ষিত লেখক ও কবি। ফররুখ আহমদ পুঁথিসাহিত্যের পুনর্নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। এদিক থেকে তিনি একটি ব্যাপক প্রভাবও সৃষ্টি করেন। (আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২২)

বাংলা কাব্যের তিরিশ-পরবর্তী যুগ আত্মসম্প্রসারণ তাড়নায় অনেকটা গঠনমূলক। এর নিশ্চিত চারিত্র্যলাভ ঘটে চল্লিশের দশকে। তিরিশ-পরবর্তী পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– 'প্রেক্ষিত-পারম্পর্যসজ্ঞানতা, বিশ্লেষণমূলকতা এবং সর্বাত্মক নিবিষ্টতা।' (হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, পৃ. ৪৫৪) এই ধারায় ফররুখ আহমদ যথেষ্ট প্রাতিস্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পারম্পর্য, পরিপ্রেক্ষিতচেতনা এবং বিশ্লেষণমূলকতাকে চল্লিশের কবিগণ গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তিরিশ থেকে চল্লিশ দশকের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। তাই ফররুখ আহমদের কবিমানস বিচারে হাসান হাফিজুর রহমান লেখেন :

> ঐতিহ্যবোধ ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত হতে না পারলে ফররুখ আহমদ লিখতেও পারেন না। ঐতিহ্যের জগতই তাঁর স্বাভাবিক স্বস্তির জগৎ। আরব্য উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা এবং কোরানে উল্লেখিত কাহিনীর ঐতিহ্য একদিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্য তাঁর কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। (হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, পৃ. ১৩৬)

মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি হিসেবে পরিচিত ফররুখ আহমদ প্রথাগত চল্লিশি মেজাজে কবিতা-চর্চা শুরু করলেও ধর্মীয় মনোভঙ্গিকে কবিতার মূলসুর করে নিলেন। চল্লিশের কবিরা পারিপার্শ্বিকতার কাছে বাধাগ্রস্ত হয়ে তা স্বপ্নিল ভূখণ্ডে পৌঁছাতে না পেরে নানামুখী দিকদর্শনে ধাবিত হয়েছেন। কেউ কেউ অন্তর্মুখী হয়েছেন, আবার কেউ কেউ প্রগতিবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে সন্ধান করেছেন নতুন পথের :

> চল্লিশের দশকের প্রধান কবিদের কাছে আমাদের বড় ঋণ তাঁরা বাংলা কবিতার মূলস্রোতকে বেগবান করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন বৈরি পরিবেশেও। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত তিরিশি আধুনিকতার অনুকরণ কিংবা ইউরোপীয় আধুনিকতার হতাশা আর ক্লেদের স্রোতে গা ভাসাননি। কৃত্রিম নগরযন্ত্রণায়ও ভোগেননি। তাঁরা বরং পূর্ববাংলার মৃত্তিকাসংলগ্ন একটা নিজস্ব কাব্যভাষা ও ইতিবাচক বোধের জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। (নাসির আহমেদ, পূর্ববাংলার কবিতায় নব্য আধুনিকতা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৬১)

সমসাময়িক জীবন ও সমাজচেতনা অবলম্বন করে কবিতা রচনায় ব্রতী হলেও শেষ পর্যন্ত ইসলামি ঐতিহ্যচেতনাকে ধারণ করে ফররুখ আহমদ কাব্যনির্মাণে মনোনিবেশ করেন। তাঁর কবিতায় বিচরণের ক্ষেত্র হয়েছে মুসলিম এবং ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অতীত। গৌরবময় অতীতের প্রেক্ষাপটে ফররুখ আহমদ আধুনিক মুসলমানদের মর্মগত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি খুঁজেছেন।

ফররুখ আহমদ ইসলামি রেঁনেসার প্রথম কবি। স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার ধারার প্রণেতা তিনি। জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কাব্যচর্চা করেন। প্রথম দিকে রোমান্টিকতা বিরহ প্রেম বেদনা বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিতা লিখলেও তা পরবর্তী সময়ে পর্যবসিত হয় ইসলামি ভাবধারায় বা ইসলামি ঐতিহ্যে। কারণ, সমসাময়িক যে রাজনৈতিক জটিলতা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ যেমন আলোড়িত হয়েছিল তার প্রভাব কবিদেরকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও হয়ে ওঠে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আর ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার অস্ত্র। *সাতসাগরের মাঝি* (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রোমান্টিক ভাবাবহ নির্মিত হয়েছে। এখানে তিনি ইসলামের প্রথম যুগের উদ্দীপনা, সচলতা, আগ্রহ এবং অনেক দূরে চিত্তকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। 'লাশ' কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের করুণ পরিণতির জন্য বর্বরতা ও হীন সভ্যতাকে দায়ী করেছেন এভাবে :

> জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর 'পর;/ক্ষুধিত অসার তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে প'ড়ে আছে
> নিসাড় নিথর,/পাশ দিয়ে চ'লে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর
> –পাথরের ঘর,/মৃত্যু কারাগার,
> সজ্জিতা নিপুণা নটী বারাঙ্গনা খুলিয়াছে দ্বার/মধুর ভাষণে,
> পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে/সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর
> সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর। (লাশ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৬৪)

কবির অন্বেষণ ছিল মুক্তির আলোকিত বন্দর। যেখানে ক্ষুধিত কোনো মুখ নীরব বিরক্তির দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে না। যেখানে কালো পিচ-ঢালা পথে পড়ে থাকবে না ক্ষয়িত কোনো লাশ। মানুষের অন্তিম কবর রচনা করবে না যেখানে ধনিকের গর্বিত সম্পদ। 'লাশ' কবিতা শেষ হয়েছে অপসভ্যতার ধ্বংস কামনায়। মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহার ক্লিষ্ট মৃত মানুষের মর্মন্তুদ করুণ পরিণতিকে মানবতার মৃত্যু বলেই তাঁর সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব করেছেন। তিনি স্বাগত জানান

নতুন দিনের নতুন সভ্যতার; আর তার প্রকাশ ঘটাতে তিনি আশ্রয় নেন ইসলামি ঐতিহ্য-অনুষঙ্গের। এ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> ঐহিকতা, প্রাতিস্বিকতা, যুক্তিশীলতা, বিচিত্রের প্রতি উন্মুখিতা, জিজ্ঞাসা, কৌতুহল, সন্ধিৎসা, পুনর্বিবেচনা, ভাবুকতা, আধুনিকতা–রেঁনেসাসের সমূলে অবিরলভাবে কাজ করে যাচ্ছে এইসব। বাংলার রেনেসাঁসের পাটাতনও তৈরি হয়েছে এই সমস্তের আবিলতায়। (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, পৃ. ২)

ফররুখ আহমদ চেয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদিন যুগের ইসলামি রেঁনেসার পুনর্জাগরণ। ফররুখ আহমদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে যাঁরা (স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আব্দুল লতিফ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী প্রমুখ) ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁদের ভাবান্দোলনবাহিত উদারনৈতিক প্যান-ইসলামিচেতনা। শিক্ষক-সমালোচক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন :

> ফররুখ আহমদের শিল্পপ্রচেষ্টাকে নিছক ইসলামী ধর্মাদর্শ ও ঐতিহ্য-ভিত্তিক 'বিশেষ সম্প্রদায়িক চেতনা প্রসূত' কাব্য-সাধনা বললে সত্যেরই অপালাপ হবে। ধর্মবোধ তাঁর মজ্জাগত, কিন্তু সাধারণ ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যে যে জীবনদৃষ্টির সংকীর্ণতা, পরমত-অসহিষ্ণু ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি উপেক্ষা দেখা যায়, ফররুখের সাহিত্যকর্ম তার থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত। বিশেষত ব্যবহারিক সকল আতিশয্য অতিক্রম করে, তাঁর কাব্যভাবনা এক উদার, পরমতসহিষ্ণু মানবিক আদর্শের ধ্যানে নিযুক্ত রয়েছে। (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *কবি ফররুখ আহমদ*, পৃ. ১৯)

ইসলামের অতীতের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চিন্তা সর্বদা ফররুখ আহমদকে তাড়া দিত। তিনি কিছুতেই সেই পুরানো ঐতিহ্যকে নষ্ট হতে দিতে চাননি। মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকবে দৃঢ়। ইসলামি সাহিত্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে প্রদর্শক হিসেবে লাগবে একজন পাঞ্জেরি। সেই বিষয়টিই তিনি তাঁর *সাতসাগরের মাঝি* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় ব্যক্ত করেন :

> তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
> অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।
> রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? (পাঞ্জেরী, *সাতসাগরের মাঝি*, পৃ. ৬)

দুর্গম পথযাত্রায় তৃপ্তি, সমুদ্র-পথে নতুন দ্বীপভূমি আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, রাত্রির অন্ধকার এবং বিভীষিকা অতিক্রম করে একটি স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হবার কল্পনা তাঁর ছিল। কবির মতে, একটি জাহাজের পাঞ্জেরিই পারে সঠিক পথে পরিচালিত করে জাহাজটিকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছোতে, তেমনি একটি জাতির পথপ্রদর্শক যদি নিজেই দিকভ্রষ্ট হয় তাহলে জাতি পৌঁছোবে সর্বনাশের করালগ্রাসে :

> প্রথম যুগের মুসলমানেরা ইসলামের বাণীতে একতাবদ্ধ হয়ে অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এবং আনন্দ ঐশ্বর্য ও মনুষ্যত্বেরভিত্তিতে যে নতুন সমাজ সৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিল। বর্তমানের

> মুসলমানদের জন্যও কবি ঐ সমাজ কামনা করছেন। সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় ঐ স্বপ্নের যুগে প্রত্যাবর্তনের ও তার উদবোধনের আহ্বান রয়েছে এবং স্বপ্নিল ভাষায় কবি অতীত যুগের প্রাণোচ্ছলতা, ঐশ্বর্য, দুঃসাহসিকতা, শক্তি ও সংগ্রামের ছবি অংকন করেছেন। (সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ১৬২)

ফররুখ আহমদের *সাতসাগরের মাঝি*'র প্রতিটি কবিতায় প্রতাপের উচ্চারণ শোনা যায়। সমুদ্রের অনমনীয় তরঙ্গের মতো বিচিত্র নামে তার বিশেষণ এবং উপমার পরাক্রম। আবার ইসলামি ঐতিহ্যের পাশাপাশি গ্রামবাংলার প্রকৃতিও চোখে পড়ে। 'ডাহুক' কবিতায় ডাহুক পাখির প্রতীকে ফররুখ আহমদ মুক্তি পিয়াসী মনের আকাঙ্ক্ষা, হাহাকার এবং বেদনাবোধ বাঙ্ময় করে তুলেছেন :

> রাত্রিভ'র ডাহুকের ডাক...
> এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘী অতল সুপ্তির!
> দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি। (ডাহুক, *সাতসাগরের মাঝি*, ৫৬)

গভীর নিস্তব্ধ রাত। সমগ্র প্রকৃতি শীতল নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কবি একাকি জেগে আছেন। রাত্রির গভীরতা ভেদ করে ভেসে আসে ডাহুকের ডাক। কবির ভেতর শুরু হয় আলোড়ন। এক ভিন্নতর আবেদন কবি হৃদয়ে দোলা দেয়। ডাহুকের ডাকে কবি খুঁজে পান ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। ফররুখ আহমদের কিছু কবিতায় গ্রামবাংলার অনুষঙ্গ আসলেও তা ইসলামি ভাবধারার তুলনায় অতি ক্ষীণ। ফররুখ আহমদের কবিতায় লোকজ জীবন ধরা পড়ে তবে তা আরবোপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর কবিতার প্রধান নায়ক সিন্দাবাদকে আবিষ্কার করেন। আরব্য লোককাহিনির ভেতর থেকে নায়ক সিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছেন। আরব্য লোককাহিনি ধরা পড়ে তার 'বীর দরিয়ার' কবিতাতে। আবার 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় রয়েছে :

> বন্দী সে জিন কেঁদেছিল বুঝি দূর ও'তানের তরে
> কাল রাতে তার আওয়াজ শুনেছি দরিয়ার হাহাস্বরে;
> সেই সাথে সাথে আমার মনেও জেগেছিল আহাজারি,
> ছুটেছিল সেথা জিন্দিগী মোর বাগদাদ বন্দরে। (দরিয়ার শেষ রাত্রি, *সাতসাগরের মাঝি*, পৃ. ৪৪)

কবিতাটি গণজাগরণের। ফররুখ আহমদ এখানে আশ্রয় নিয়েছেন ইসলামিক ঐতিহ্যের আলোকোজ্জ্বল আধার আরব্যোপন্যাসে। ফররুখ আহমদের নায়ক হয়ে উঠলো এক সমুদ্রের দুঃসাহসী অভিযাত্রী, সিন্দাবাদ– যার মহিমা পৌরাণিক নায়কেরই তুল্য। পথসন্ধানী এ যুগের মুসলমানদের নেতা হয়ে উঠলো তাঁর কবিতার সিন্দাবাদ। সমুদ্র, মাল্লা, জাহাজ, বাগদাদ– সবই তাঁর কেন্দ্রপ্রতীকে স্থির। আরব্যোপন্যাসের লোকজ কাহিনি চরিত্রকে যেমন রূপদান করেছেন, তেমনি মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের চরিত্রের রূপও পরিলক্ষিত তাঁর কবিতায় :

লায়লির ইশারায় বুকে পুরে তারুণ্যের লেলিহ আগুন
সবুজ দিগন্ত তার পাড়ী দিয়ে চলে গেছে কবে মজনুন
ধূসর জগতে। (আকাশ-নাবিক, *সাতসাগরের মাঝি*, পৃ. ৫৪)

অর্থাৎ, ফররুখ আহমদের কাব্যে গ্রামীণ ও লোকজ জীবন তেমন ধরা না পড়লেও তাঁর *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যগ্রন্থে লোকজজীবন ধরা পড়ে আরবোপন্যাসের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয় ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে। ফররুখ আহমদের কবিতায় আছে লোকজীবনভিত্তিক শব্দ প্রচুর। যেমন : মালামাত্তা, বিহান, পিরান (পিরহান), ভেরা, বাটোয়ারা, চুড়ি, নুড়ি, গাঙ, মরদ, লাগাম, খড়কুটো, ডোল, পুঁতে, গুছি, সাঙ্গাত, বেড়া, পগার, ফ্যাকড়া, পাটালি, মুড়ি, মুড়কি, ঝুড়ি, বকরি, বলদ, এঁড়ে, হোদল, কুৎফুৎ, উদো, বুধো, রাক্ষস, খোক্ষস, ডাঙ্গুলি, তায়রা, বগা প্রভৃতি। লোকজীবনভিত্তিক শব্দগুলো দেশজ শব্দের পর্যায়ে ফেলা যায়। তবে এ ধরনের কোনো কোনো শব্দের মূল আরবি-ফারসিতে পাওয়া যায়। লোকমুখে এ জাতীয় শব্দের প্রচলন বেশি।

ফররুখ আহমদের সনেটজাতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম *মুহূর্তের কবিতা* (১৯৬৩)। এই কাব্যগ্রন্থে কবি ব্যাপকতায় সমৃদ্ধমান এবং প্রত্যক্ষতায় স্পষ্ট। তাঁর ঐতিহ্যেলগ্ন কবিমানস আলোচ্য কাব্যেও সমভাবে বিধৃত ও প্রভাস্বর। কারণ, সনেটের সীমাবদ্ধ পরিসরেও কবি এখানে আদর্শানুগত্য এবং ঐতিহ্যবোধেসংলগ্ন :

> ফররুখ আহমদ শুধু বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চায় তৃপ্তি বোধ করেন না, শিল্পদৃষ্টি ও জীবনবোধকে তিনি সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করতে চান। এক্ষেত্রেই অন্যান্য সৌন্দর্যবাদী কবির সঙ্গে ফররুখ আহমদের লক্ষণীয় পার্থক্য। বিশেষত যখন তাঁর সমকালীন কবিরা বিদেশী ভাবধারা ও বৈচিত্র্যের চকিত ইশারায় প্রলুব্ধ হয়ে আত্মক্ষয়ী পথ অনুসরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না, সে-সময়ে নিজের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যে নোঙর বেঁধে রেখে ফররুখ আহমদ একটি ব্যতিক্রমকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, পৃ. ২১৯)

সনেটকে মুহূর্তের কবিতা বলা হয়ে থাকে। মুহূর্তের অনুভূতিকে ঘনপিনদ্ধ সনেটে রূপদান করতে গিয়ে যে সৃষ্টি বেদনা অনুভব করেন তা খণ্ড-কবিতার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। বরং মুহূর্তের কবিতার জন্মবেদনা তীব্রতায় সঞ্চারিত। ফররুখ আহমদ *মুহূর্তের কবিতা* গ্রন্থে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে জাতীয় মানস ও ঐতিহ্যচেতনাকে বিশেষভাবে রূপায়িত করেছেন। মুহূর্তের কবিতায় কবির ব্যক্তিমনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত না হলেও ঋতুবৈচিত্র্যের প্রতি দুর্ণিবার আকর্ষণ, ক্ষণভাবনা, প্রাচীন সাহিত্যের নবরূপায়ণ এবং বাঙালির অতীত ও বর্তমান সভ্যতার খণ্ডিত রূপ তাঁর কবিকল্পনায় মূর্ত হয়েছে। পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনবোধ উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে :

ঘাসফড়িঙের রঙ মিশে যায় ধানের সবুজে,
শাপলা শালুকে ঘেরা সুদূর দিগন্তে ছোঁয়া বিল,
বকাওলি বুঝি খোলে আকাশের ঝিলমিল
শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ উঁকি দেয় নীলার গম্বুজে। (বিগত, *মুহূর্তের কবিতা*, পৃ. ২০৮)

বাঙালির সমস্যাসঙ্কুল ও বেদনা-বিক্ষুব্ধ জীবনে ফররুখ আহমদ কবিতায় আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। যুগের ক্লান্তি এবং হতাশার মধ্যেও কবি শুভবোধের বিশাল ডানায় উড়তে চেয়েছেন। বাঙালির সংকীর্ণ গণ্ডীর সীমিত সীমানায় হতচকিত এবং বিকৃত ক্লিন্ন জীবনকে আবহমান বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। যুগাবর্ত এবং সংকটের মুখে ফররুখ আহমদের কবিমানস দ্বিধায় কম্পিত হলেও নতুন দিনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। *মুহূর্তের কবিতায়* বিষণ্ন-বেদনাক্লান্ত কবিমনের অভিব্যক্তির পাশাপাশি আশাবাদী মনের স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বলতাও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পুথি ও লোকসাহিত্যের নবরূপায়ণের সঙ্গে ফররুখ আহমদ চিরায়ত বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং গ্রামীণ লোকজ জীবনধারাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। আলোচ্য কাব্যে ফুল-ফসলের উল্লেখ দৃশ্যমান। দেশীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি বৈচিত্র্যের অন্বেষণ করেছেন। এ দেশের নদ-নদী, দিগন্ত ছোঁয়া খাল-বিলকে অবলম্বন করে সনেট নির্মাণ করেছেন। বিশাল সমুদ্র ও পৃথিবীর মরুভূমির রুক্ষতার উপমার পাশাপাশি বাংলার প্রমত্তা খরস্রোতা নদীর গতিধারা এবং স্নিগ্ধ গ্রামবাংলার অপরূপ রূপ তাঁর এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর 'কোকিল', 'ফাল্গুনে', 'বৈশাখী', 'বৃষ্টি', 'বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ', 'বিগত', 'ময়নামতীর মাঠে/এক', 'গোধূলি সন্ধ্যার সুর', 'নদীর দেশ' প্রভৃতি সনেটে সৌন্দর্যবোধ ও বেদনাবোধ অনবদ্য রসমূর্তি লাভ করেছে। ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি হলেও তাঁর নভোবিহারী কল্পনা ধুলিমলিন পৃথিবীর আকর্ষণ অস্বীকার করেনি।

মূলত, ফররুখ আহমদ ইসলামি নবজাগরণের প্রথম কবি। তাঁর কবিতায় প্রচুর ইসলামি অনুষঙ্গ এসেছে আরবি, ফার্সি শব্দের ব্যবহারের ভেতর দিয়ে তবুও তিনি লোকঐতিহ্যকে কবিতায় দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর ঐতিহ্যের টানেই, যদিও সেটির মূল সুর ইসলামি চেতনা। বলা যায়, ফররুখ আহমদ ইসলামি ঐতিহ্য ধারণকারী, মানবতাবাদী কবি। রোমান্টিকতাকেও তিনি স্পর্শ করেছেন কখনো বেদনায় কখনো ভালোবাসায়। গ্রামবাংলার লোকজীবন তাঁর কবিতায় না থাকলেও তিনি কিছুটা ছোঁয়া রেখে গেছেন মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের চরিত্রকে এঁকে। তিরিশের ঐতিহ্য-সংলগ্ন হয়েও কাব্য-বিশ্বাসে অচিরেই স্বাতন্ত্র্যবাদ অঙ্গীকার করেছেন ফররুখ আহমদ :

তাঁর রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। দূরবিসর্পিত স্বপ্নলোকে কবিমানস ভ্রমণ করেছেন। এই রোমান্টিকতার সঙ্গে ধ্রুপদী সাহিত্যরীতির মেলবন্ধন ঘটেছে ফররুখ-কাব্যে। আধুনিক বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কবি ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে। (আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য* [প্রসঙ্গ-কথা])

রোমান্টিক, স্বপ্নপ্রবণ এবং প্রেম ও প্রকৃতির রূপকার কবি হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের আবির্ভাব। ফররুখ আহমদের কবিতায় যে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তা ছিল রূপকের ছলে পাঠককে নিয়ে গেছেন ভিনদেশে। সমকালীন বাস্তবতাবোধের কারণে ব্যক্তিমনের ব্যথা বেদনা, রোমান্টিক হাহাকার, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের প্রতি সুগভীর মমতা ঠাঁই করে নেয় ফররুখ আহমদের কবিতায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিকান্দার আবু জাফর

একজন সমাজ-সচেতন কবি হিসেবে সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৯-'৭৫) শিল্পীজীবনের শুরু। সমাজ-সচেতন কবি হিসেবে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের উত্তর-সাধক। তাঁর কবিতায় সমাজ-সচেতনতা, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-বেদনা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মমুক্তির বলিষ্ঠ প্রত্যয় মনোরমভাবে বিধৃত হয়েছে। কবি তাঁর কাব্য-প্রয়াস সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত *প্রসন্ন প্রহর* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের প্রায় আত্মকথাধর্মী 'প্রসঙ্গ-কথা'য় লিখেছেন :

> আমি কবিতা লিখি অনায়াসে। যেমন সকলেরই ক্ষেত্রে, জীবনের আশে-পাশে অসংখ্য সুলভ দুর্লভ মুহূর্ত নানারূপে অনাবৃত হয়েছে আমার সামনে। আমি কোনো কোনো সময়ে সেইসব মুহূর্তের স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করেছি সত্য-বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সেই আমার কবিতা। (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ৪)

সিকান্দার আবু জাফর উচ্চকণ্ঠ কবি। তাঁর বক্তব্য ও ভাষা সাবলীল, ধ্বনিময় এবং বলিষ্ঠ। তাঁর কবিতায় দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, আন্দোলন, সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে। হতাশা বেদনা বঞ্চনা তাঁকে অসহায় করেনি, সংগ্রামী করেছে। সংগ্রাম আর আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে :

> মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা তো অহরহ শুনছি
> আঁধার গোরের ক্ষেতে তবু তো' ভোরের বীজ বুনছি। (সংগ্রাম চলবেই, *কবিতা* ১৩৭২, পৃ. ১৭৯)

সমকালীন জীবনের চিত্রকে ধারণ করে যে পৃথিবী, কবি তাকে প্রত্যক্ষ করেন এক যুগজীর্ণ কবরখানার আদলে। তবুও সংগ্রামী আর আশাবাদী চেতনার ঔজ্জ্বল্যে তাঁর কবিতা মহিমান্বিত। গদ্যরীতিতে রচিত তাঁর কবিতাসমূহে যুগচেতনা ও সমকালচেতনা স্পষ্ট। 'বর্তমান সময়ের বিকার এবং অন্যায়কে তিনি তাঁর কবিতায় একটি পরিহাস-তিক্ততার মধ্যে প্রকাশ করেছেন।' (মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৪৮৬) সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করে সমসাময়িক কবি, নাট্যকার, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও তরুণদের মন যিনি জয় করেছিলেন তিনি হলেন মানব দরদি কবি সিকান্দার আবু জাফর। চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদ এবং আহসান হাবীব যে কবিতার পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন, সেই পরিমণ্ডলেই সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার জগৎ গড়ে উঠেছে। তবে তাঁর ভাবনার বৃত্ত সম্পূর্ণ একক ও স্বতন্ত্র :

> সামষ্টিক চেতনাই সিকান্দার আবু জাফরের কাব্যের প্রাণসূত্র। মানুষ, মানুষের সাংগ্রামিক জনপদ, প্রতিরোধ ও আশা আকাঙ্ক্ষার এক দুর্নিবার বাকশিল্প হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। মানুষের অস্তিত্ব ও অধিকার যখনই বিপর্যস্ত হয়েছে কবির চেতনাও হয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমুখী। প্রথাগত রোম্যান্টিক অনুবর্তনে তিনি ভেসে যাননি। (বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *কবিতার শব্দ-সাঁকো*, পৃ. ১১৮)

সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্ত স্বকীয়তা। কৃত্রিমতা বর্জন করে তিনি কবিতায় অনায়াস প্রাণতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর নিজস্ব কবিতার বৃত্ত সৃষ্টি সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> আমি কবিতা লিখি অনায়াসে।' 'পরিকল্পনার ছক কেটে কবিতা আমি লিখিওনি কখনও।' এই দুই উক্তির ভিতরে রয়েছে সিকান্দারের অনায়াস কবিতা রচনার সামর্থ্য, স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা রচনার সামর্থ্য। 'বড় কবি ভালো কবি ত দূরের কথা নিছক 'কবি' হবার সাধনাই আমার তেমন জোরালো নয়। আমি শুধু কখনও কখনও কবিতা লিখি এইমাত্র।' বর্তমান লেখকের মতো যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন সিকান্দার আবু জাফরকে, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন এইসব উক্তি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। স্বতঃস্ফূর্ততা, অকৃত্রিমতা সিকান্দার আবু জাফরের কবিস্বভাবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ২৮)

কবি, গীতিকার, নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক এবং রোমান্টিক যুক্তিবাদী সিকান্দার আবু জাফর সমসাময়িকতায় উজ্জীবিত হয়ে যেমন স্বদেশের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কবিতা লিখেছেন, তেমনি চল্লিশ দশকের অন্যান্য কবির চিন্তাধারা থেকে পৃথক থেকেছেন। তবে অনুকরণ নয় অনুসরণে ফররুখ আহমদ বা তাঁর সমসাময়িক কবিদের আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করত। সিকান্দার আবু জাফরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রসন্ন প্রহর* (১৯৬৫)। প্রসন্নতা থেকে কবি যে ক্রমশ তিক্ততায় পৌঁছিলেন, এর পিছনে দেশ-কালের নানামাত্রিক সংকটই প্রধান কারণ। সিকান্দার আবু জাফর ছিলেন তাঁর সময়ের একজন দিক-নির্দেশক কবি। পঞ্চাশের দশকের লোকজ কবি আল মাহমুদের উক্তি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য :

> কবি সিকান্দার আবু জাফর বিভাগোত্তর বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকের কবি, চারুকলাকর্মী, নাট্যোৎসাহী, সংগীতশিল্পী ও তরুণ কথাশিল্পীদের সামনে সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনাকারী এক প্রবল ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত হিশেবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সাহিত্যের বিশেষ করে আধুনিক কাব্যান্দোলনের বিতণ্ডাপ্রিয়, চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাট দশকীয় কবিদের একঘাটে পানি খাওয়ানোর কৃতিত্ব একমাত্র সিকান্দার আবু জাফরের সাফল্যের মধ্যে একটি অতিশয় স্মরণীয় ঘটনা। আমরা বাংলাদেশের আধুনিক কবি ও কথাশিল্পীরা ষাট দশকের প্রারম্ভে তাঁর নেতৃত্বেই 'সমকাল' সাহিত্য মাসিকের রুচিশীল উদার ছায়ার আশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠি। (উদ্ধৃত : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ১৫)

সিকান্দার আবু জাফরের অধিকাংশ কবিতায় সমাজ সম্পৃক্ততা ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সমাজকে কেন্দ্র ও আবর্তিত করেই সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার জগৎ। তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি জড়িয়ে আছে। সমসাময়িকতা ছাড়াও তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতার পাশাপাশি লক্ষ করা যায় প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ :

তবু তার চিত্তের ফলকে
অকস্মাৎ জেগে ওঠে সময়ের বিদ্যুৎ ঝলকে
কোনো ক্ষুদ্র তৃষা,
অপেক্ষায় জেগে থাকা কোন ব্যর্থ নিশা।
বৈশাখের ক্লান্ত চোখে করুণ সঙ্কেতে
শ্রাবণের অভিমান অকস্মাৎ ওঠে যেত মেতে। (বৈশাখ, *তিমিরান্তিক*, পৃ. ৭১)

সমসাময়িক রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে সিকান্দার আবু জাফরের কবি-হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাঁর দেশ মাতৃকার প্রতি ঋণ পরিশোধের জন্যই যেন *বাঙলা ছাড়ো* কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি। এই কাব্যগ্রন্থের 'ইতিহাস বাঙলা' ও 'গরবিনী মা জননী' কবিতাদ্বয়ে দেশমাতৃকার বন্দনা সূচিত হয়েছে। দুঃসাহসিক 'বাঙলা ছাড়ো' কবিতাটি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তদানীন্তন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে বারবার ধ্রুবপদের মতো ফিরে এসেছে একটি অঙ্গীকার ও দাবি :

ক. তুমি আমার আকাশ থেকে/সরাও তোমার ছায়া,/তুমি বাঙলা ছাড়ো।
খ. তুমি আমার বাতাস থেকে/মোছো তোমার ধুলো,/তুমি বাঙলা ছাড়ো।
গ. তুমি আমার জলস্থলের/মাদুর থেকে নামো,/তুমি বাঙলা ছাড়ো।

(বাঙলা ছাড়ো, *বাঙলা ছাড়ো*, *পৃ.* ৫৩৩-৫৩৪)

*বাঙলা ছাড়ো*র 'তখন রাত্রিশেষ' কবিতার সর্বশেষ উচ্চারণ : আঁধার ভেঙে এগিয়ে আসে/ নতুন ভোরের চাকা/ রাত্রি পড়ে ঢাকা। অল্প কিছুকালের মধ্যেই ঐ কবিতার উক্তি সত্য হয়েছিলো। অন্ধকার ভেঙে এগিয়ে এসেছিলো নতুন ভোরের চাকা, জন্ম হয়েছিল স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের। স্বদেশের টানে যেমন চুপ করে বসে থাকতে পারেননি, তেমনি তাঁর কবিতায় শোষিত, বঞ্চিত মানুষ যে কীভাবে দিনাতিপাত করেন তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 'সমাজপতিরা নিয়ত পরামর্শ দেয় দুঃখবিপদে ধৈর্য ধারণ করতে।' (সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ২০৮) কিন্তু তাদের বিপদ থেকে, অভাব থেকে উত্তরণের কোনো উপায় বা সাহায্য আসে না সমাজপতিদের কাছ থেকে। তা ব্যক্ত হয়েছে–'আকাল' কবিতায় :

ইহকাল সব নয় জানবে
পরকাল রয়েছে অনন্ত,
সবুর করতে হ'বে নির্বাক
দু' হাতে কুড়োতে হবে পুণ্য:
তবে তো লভ্য হবে স্বর্গ
তবে তো জীবন হবে ধন্য। (আকাল, *তিমিরান্তিক*, পৃ. ৯৯)

সমাজপতি ও নিরন্ন মানুষের প্রতি নির্মোহ সিকান্দার আবু জাফরের মনোভাব স্পষ্ট হয় *প্রসন্ন প্রহর* কাব্যগ্রন্থের 'প্রসঙ্গ-কথা'য় তাঁর নিজের উক্তিতে :

> তবু লিখছি আমার আনন্দের জন্যে– আনন্দের আনন্দ এবং বেদনারও আনন্দের জন্যে। জীবনের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি গ্রহণ করেছি, ভোগ করেছি। যা পেয়েছি তার বেশী প্রাপ্তব্যের তালিকা জানা ছিল না তা নয়, পাবার বাসনা ছিল না তা-ও নয়, কিন্তু সে বাসনাকে স্বার্থ-সাধনের প্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করিনি। (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ৩)

মানব-দরদী আশাবাদী কবি সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় দরিদ্র ও লাঞ্ছিত জনতার মুক্তির কথা প্রমূর্ত হয়েছে। আবার তাঁর কবিতায় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আন্দোলন-আকীর্ণ চল্লিশ, দাঙা-রাঙা-কাল, পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতা ও শোষণ এবং বাংলাদেশের রক্তলাঞ্ছিত অভ্যুদয় ও তার বিষাদিত কালচক্র কবির অভিজ্ঞতার অংশ ছিল :

> তিনি ছিলেন জনতার কবি, জনগণ তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়, জনতার জন্যে কবিতা রচনায় তাঁর আনন্দ এবং স্ফূর্তি ছিল অকপট, স্বতোৎসারিত। (আবদুল হাফিজ, *আধুনিক সাহিত্য : বিবেচনাসমূহ*, পৃ. ১৩)

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দুঃখের কাহিনি সিকান্দার আবু জাফর গল্পচ্ছলে ব্যক্ত করেছেন। 'এখন তুমি ঘুমাও' কবিতায় দরিদ্র পিতা অনাহারে ক্লিষ্ট কন্যাকে ঘুম পাড়াচ্ছে এবং বলছে, রিলিফের চাল আসলেই তাকে ভালো করে মাছ-ভাত, মাংস দিয়ে খেতে দেবে। অন্নহীন পিতার এ ঘুমপাড়ানি গানের তুলনা হয় না। মৃত্যুর অধিকারই গরীবের থাকে, বাঁচার অধিকার থাকে না। ভয়াল ক্ষুধা মৃত্যু সমতুল্য সেই যন্ত্রণা থেকে মেয়েকে রেহাই পাওয়াতে বাবার এই ছলনা এখানে ব্যর্থ বাবার পিতৃস্নেহের করুণ পরিণতি। সে বিষয়টি দ্বারা মধ্যবিত্ত সমাজের ছবিটির সুন্দর চিত্রপট এঁকেছেন :

> সেই তো অশেষ ক্ষুধা
> মৃত্যু-সজাগ জীবনের যন্ত্রণা;
> তার চেয়ে আর জেগে কাজ নেই
> এখন তুমি ঘুমাও। (এখন তুমি ঘুমাও, *বৈরী বৃষ্টিতে*, পৃ. ১২১)

সিকান্দার আবু জাফর সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি বাংলার গ্রামীণ লোকজ জীবনের ছায়া তুলে ধরেছেন যদিও তেমন ব্যাপক পরিসরে নয়। *বৈরী বৃষ্টিতে* কাব্যগ্রন্থের 'আকাশ' কবিতায় রয়েছে :

> সুতোবাঁধা ঘুড়ির মতন
> অসংবৃত দুশ্চিন্তার সে- চারণভূমি
> আমার আকাশ নয়। (আকাশ, *বৈরী বৃষ্টিতে*, পৃ. ১২৫)

মাটির কাছে ঋণ কবির আজন্মলালিত। তাই এই মাটির ঋণ শোধ করতে জীবনকে ক্ষয় করে দিতেও তাঁর দ্বিধা নেই। *প্রসন্ন প্রহর* কাব্যের 'নির্বাণ' কবিতায় সিকান্দার আবু জাফর অকপটে ব্যক্ত করেন :

যে- মাটির ঋণে
আমাকে বেঁধেছ দিনে দিনে,
সাধ ছিল এ- বুকের সমস্ত সঞ্চয়
সে- মাটির আলোকে পুলকে
নিঃশেষে করে যাব ক্ষয়। (নির্বাণ, *প্রসন্ন প্রহর*, পৃ. ৩৭)

গ্রামবাংলার অতি আবেগীয় আর আদুরে রাতে বাদুরে পাখার সঙ্গে জোনাকিরা নিভু নিভু আলো ছড়িয়ে যায়– এক আশ্চর্য পরিবেশ যা একমাত্র গ্রামীণ জীবনে ধরা পড়ে। গভীর রাত্রি নিশীথে বাদুড় চড়ে বেড়ায়। এ এক নিশাচর প্রাণী। এই নিশাচর প্রাণীর রূপকে কবি মানুষের রক্তচোষার স্বভাবকে তুলনা করেছেন :

বাদুড়ের পাখা-ঢাকা রাতে
খদ্যোতের ক্ষীণ দীপ হাতে
কতটুকু দেখা যায় নিশীথের দুর্গম অন্তর
মৃত্তিকা ধূসর; (রাত্রির কাহিনী, *প্রসন্ন প্রহর*, পৃ. ৪৩)

বাংলার নদ-নদীর তীরে জীবন-মায়ার খেলা চলে অবিরল। বিশ্বের অপরূপ রূপ সৌন্দর্য তিনি অবলোকন করেছেন এই মাটি, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। এই কবিতার মধ্যেই সিকান্দার আবু জাফর ব্যক্ত করেছেন– নদীর অধীর স্রোতের তরঙ্গে নতুন চাঁদের ভেলা উঁকি দেওয়ার প্রসঙ্গ :

কভু আবার তার সীমাহীন প্রাঙ্গণে
জমে তারার মেলা
রূপা-নদীর অধীর স্রোতের তরঙ্গে
মেলার ঘাটে লাগে কভু
নতুন চাঁদের ভেলা। (যতই দেখি, *তিমিরান্তিক*, পৃ. ৮৫)

সিকান্দার আবু জাফর অতি সাধারণ বস্তুর মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ জীবনের আবহ ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনে কাকচক্ষু দীঘির বা টলমল জলে ধোয়া দু'টি হাতের মধ্য দিয়ে পানা-ডোবা পুকুরের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, তা প্রকৃতার্থেই গ্রামীণ লোকজ জীবনের অনুষঙ্গ ধরা পড়ে :

ধুলো মাটি কাদা লেপা আবর্জনা–ঘাঁটা,
পানাডোবা পুকুরের
কাকচক্ষু দীঘির অথবা
টলটল জলে ধোওয়া
শুকোনো পড়ন্ত রোদে

এই দু'টি সাধারণ হাত

অভ্যাসের ভীরু অনুচর। (ভূমিকা, *তিমিরান্তিক*, পৃ. ১১১)

বৈরী বৃষ্টিতে কাব্যগ্রন্থে আছে গ্রামীণ লোকজ আবহের সুর। সিকান্দার আবু জাফর এখানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার চালচিত্র তুলে ধরেছেন :

খেজুরতলীর ধুধু মাঠের পূবে

বাবলা ঝোপের পাশ কাটিয়ে

বকুলঝুরির হাট ছাড়িয়ে

গোখ্‌রো–চরা ভেড়ীর নীচে

ময়নাডুবির খাল পেরিয়ে

দিনের বেলায় রাত থমথম

সেই আমাদের সুদূর গাঁয়ের ঘরে। (খেলনা, *বৈরি বৃষ্টিতে*, পৃ. ১৩৪)

অসম্ভব সুন্দর রূপকল্প সৃষ্টিতে সিকান্দার আবু জাফর বেশ সিদ্ধহস্ত। তিনি মহিমান্বিত প্রেমকে গ্রামের অতি তুচ্ছ ও নোংরা দ্রব্যের ভেতরও খুঁজে পেয়েছেন। গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গ উপাদান রাখাল, কৃষকের হাতের হুকো, জেলের মাছ ধরার জাল, দাঁড়টানা নৌকো, ঝলসানো রোদ সব মিলেই কবির পৃথিবী। অতি তুচ্ছ বিষয়কে কবিতার মধ্যে প্রয়োগ করে তিনি মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন :

ঝলসানো রোদে

হাল কাঁধে জোড়া বলদের পায়ে পায়ে

ঘামস্যাঁৎসেতে কৃষকের রোমে রোমে

আমি আছি,

হাতে-হুঁকো পায়ে-দাঁড়া টানা জেলে

শীত কুয়াশায় থুথু কাশিতে

মাছে জালে একাকার :

সেও তো আমার পৃথিবী। (যেখানে আমি, *বৈরি বৃষ্টিতে*, পৃ. ১৪৩)

সিকান্দার আবু জাফর তাঁর কবিতায় পৌরাণিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের লৌকিক রাধাকে তিনি তাঁর কাব্যে ঠাঁই দিয়ে গ্রামীণ আবহ সৃষ্টি করেছেন। মূলত কবি গ্রামীণ অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করার মানসে লোককাহিনির চরিত্রের ভেতর দিয়ে রাধারূপী তাঁর প্রেয়সীকে খুঁজে পেয়েছেন :

এতদিনে রাধা এলে!

অনেক রাতের নির্জন মদে প্রমত্ত চাঁদ

এড়িয়ে সুকৌশলে। (অবেলায় রাধা, *কবিতা* ১৩৭২, পৃ. ১৮৯)

আবার 'পঙ্কস্নান' কবিতায় এই লোককাহিনির রাধা গ্রামের পলিমাটি মেখে একেবারে বাঙালি ঘরের নারী হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ জনপদের মধ্য থেকে শব্দ চয়ন করে কবি শিল্পসুষমায় নতুনত্ব এনেছেন। পল্লির পলিমাটি, শাপলা-শালুক, কাশফুল, মাছরাঙা প্রভৃতি তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে লৌকিক হয়ে উঠেছে :

বক মাছরাঙা ঠোঁট ভেঙ্গে ফেলে
ঠুকরে ঠুকরে নদী
দেখা হয়ে গেছে জলে ও পাথরে
কোথায় যে একাকার,
এখন কি শেষ হবে না রাধার
তমসা-অবগাহন? (পঙ্কস্নান, *কবিতা*-১৩৭২, পৃ. ২০৯)

চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর ছিলেন কিছুটা স্বতন্ত্র এবং এটিই তাঁকে তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে আলাদা করেছেন :

> প্রযুক্ত মনের মানুষ ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর। প্রকৃতার্থে মানবতাবাদী ছিলেন। কিন্তু কোনো দিন কোনো ইজম বা মতবাদ বাঁধা পড়েননি। ব্যক্তি জীবনে ও সাহিত্যে সারাজীবন স্বাধীনতার জয়গানই গেয়েছেন। প্রযুক্ত মানবতাবাদই ছিলো সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যিক চারিত্র। (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী*, পৃ. ৮)

প্রমুক্ত মনের অধিকারী সিকান্দার আবু জাফর যে কবিতা লিখেছেন তা কোনো কোনো সময় একেবারে বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, যার প্রমাণ মেলে তাঁর নিজ স্বীকারোক্তিতে :

> যেমন সকলেরই ক্ষেত্রে জীবনের আশে-পাশে অসংখ্য সুলভ দুর্লভ মুহূর্ত নানারূপে অনাবৃত হয়েছে আমার সামনে। আমি কোনো কোনো সময়ে সেই সব মুহূর্তের স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করেছি সত্য-বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সেই আমার কবিতা। মুহূর্তের রৌদ্রে উদ্ভাসিত হয়েছি, মুহূর্তের বৃষ্টিতে সিক্ত হয়েছি, মুহূর্তের অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছি, মুহূর্তের গোধূলি আলো-ছায়ায় রোমাঞ্চিত হয়েছি– এবং সেই আমার কবিতা। সব মুহূর্তই সোজা পথে হেঁটে আমার কাছে আসেনি। কেউ এসেছে ধারালো ক্ষুরের ওপর সতর্ক পা ফেলে। তবু এসেছে। এবং আমি তাকে তাই সুদুর্লভ জেনেছি। (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী*, পৃ. ৪)

সমাজচেতনা সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার বিশাল অংশ জুড়ে আছে বিশ্বপ্রকৃতি ও ধূলির ধরণীর অপরিমেয় ঐশ্বর্যে গাথা। সত্যিই সিকান্দার আবু জাফরের বাংলা সাহিত্যে যে দান তা অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন মূলত পঞ্চাশের দশকের কবিতার দিক-নির্দেশক কবি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২) প্রথমে ইসলামি ভাবধারা ও বিষয়বস্তু অবলম্বনে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম ঐতিহ্যকে আধুনিক কাব্য-বিন্যাসে লালনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে তিনি কাব্যসাধনায় ওই পথ পরিহার করেন। পঞ্চাশের দশকের পর তাঁর কবিমানস এই সত্য উপলব্ধি করে যে, কবিতার জন্য শুধু নতুন বক্তব্যই প্রয়োজনীয় নয়, সেই সঙ্গে নতুন আঙ্গিক ও বাক্‌প্রতিমার ভাবানুভূতি-ভাবনা, বেদনা, রূপ ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা রূপায়িত হয়েছে। কবির আধুনিক চেতনার বিকাশ *অনেক আকাশ* (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু। কবির নিজের কথা– 'বিমূঢ় নয়নে আমি জীবনের সন্ধান জেনেছি।' সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার বই পাঁচটি। তিনি জীবনকে এবং অস্তিত্বকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধির সূত্রে। তাই তাঁর কবিতায় হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি মিশ্রিত হয়েছে। কবির মন্ময়তা ধরা পড়ে নিম্নোদ্ধৃত চরণত্রয়ে :

> আমাকে ফিরে যেতে দাও
> সমুদ্রের স্ফটিকে
> স্বপ্নে এবং কুয়াশায়। (*অনেক আকাশ*)

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন টি এস এলিয়টয়ের ভাবশিষ্য কবি। বাংলা কবিতায় তিনি ভাবমাধুরী নির্মাণে অনবদ্য প্রয়াস সঞ্চার করেন। শিল্পের সুকুমার মনোবৃত্তি গঠনে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা অনবদ্য :

> বুদ্ধিবাদী ও আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বারা তাড়িত হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। শিল্পের সুকুমার ভাবমাধুরী সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। এজন্যে তাঁর কবিতার ভাবে এসেছে সুরুচি, ভাষায় ব্যঞ্জনা ও কাব্যমাধুর্য এবং প্রকাশভঙ্গিতে এসেছে প্রাঞ্জলতা ও সাবলীল গতিময়তা। টি. এস. এলিয়টের অনুসরণে তিনি বাংলা ছন্দে গদ্যভঙ্গির প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়ে সফলতা অর্জন করেছেন। (মোতাহার হোসেন সুফী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩৫০)

সৈয়দ আলী আহসানের কবি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য আসে পারিবারিক আবহ থেকে। তাঁর বাবা ছিলেন আরবি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী। ফেরদৌসীর শাহনামার সুর তাঁকে আপ্লুত করত :

> প্রায় প্রতিদিন বিকালে তিনি সুর করে মূল শাহনামা আবৃত্তি করতেন। শিশু আলী আহসান ধ্বনি-ঝংকার তন্ময় হয়ে শুনতেন। উত্তরকালে তাঁকে 'কবিতার মুখ্য উপাদান ধ্বনি ও শব্দ' মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী করে তোলার জন্য অবচেতন মনে শৈশবের ঐ-প্রভাব হয়ত অনেকাংশে কাজ করেছে। (সাঈদ–উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ১৮০)

সৈয়দ আলী আহসানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : *অনেক আকাশ* (১৯৫৯), *একক সন্ধ্যার বসন্ত* (১৯৬২), *সহসা সচকিত* (১৩৭৩) প্রভৃতি। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে ইসলামি

ভাবাদর্শ। পরবর্তী সময়ে তাঁর কাব্যে প্রকৃতি, পরিবেশ, গাছ-পালা, তরুলতা প্রভৃতি গ্রামীণ সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তিনি তিরিশের উত্তরাধিকারী কবি হয়েও ঠিক তিরিশের উত্তরাধিকারী অন্যান্য কবি থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র :

> ক্রান্তিকালের অস্থিরতায় তিনি যেন আগে থাকতেই অসংলগ্ন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমসাময়িক অনেক উৎক্ষেপ ছুঁয়ে গেছেনই শুধু– মানসিক কিংবা চেতনাগত দিক থেকে এই যুগাদর্শ সামগ্রিকভাবে তাঁর মনের পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হিসেবে স্থায়ী হতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। (রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, পৃ. ৪৭৮)

সৈয়দ আলী আহসান সত্যিই ছিলেন তাঁর সমসাময়িক কবিদের চেয়ে ভিন্ন ধারার। যদিও তিনি তাঁর কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারার বিষয়ে খুব স্পষ্ট ছিলেন না। অর্থাৎ, বাংলা কবিতাকে তিনি নতুন এক ভাবনায় উপস্থাপন করতে গিয়ে যেন হিমশিম অবস্থার সম্মুখিন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমানের 'আধুনিক কবি ও কবিতা' গ্রন্থের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> কেননা, তাঁর এই অস্থিরতার মূল প্ররোচনাটা সম্ভবত এই যে, তাঁর সমসাময়িক অনুসৃত ধারণা ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক উপকরণে তাঁর শিল্পবোধ তেমন উৎসাহ পায় নি। পক্ষান্তরে সৈয়দ আলী আহসান– কাব্যের জন্যই কাব্য– এমন ধারণার অনুসারী না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর জন্য একথা সত্য এবং এর প্রকৃত কারণটা বোধ করি, সৈয়দ আলী আহসান অভিজাত মনোভাবের কবি। বস্তুত এই অভিজাত মনোভাবের প্যাটার্ন আন্তর্জাতিক কাব্য-নিরীক্ষায় যেমন নির্ধারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, বাংলা কাব্যের যজ্ঞশালায় এর তেমন পরীক্ষা হয় নি। (রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, পৃ. ৪৭৯)

সৈয়দ আলী আহসানের পাকিস্তান বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানসিকতা কখনো স্থির থাকেনি যা একবার আশার সাগরে ভাসে তো আর একবার নৈরাশ্য। এখানে আলোচ্য বিষয় সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবন বিশ্লেষণ। তাঁর কাব্যে গ্রামীণ আবহ বা গ্রাম এসেছে প্রকৃতির ছায়ায়। যেমন– তাঁর *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্যগ্রন্থের 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় রয়েছে :

আমার পৃথিবীর বৃষ্টি– মাটির গন্ধ,
ধানক্ষেত ভেসে যাওয়া,
আম গাছের ডাল ভেঙে পড়া
হঠাৎ গরুর ডাক, ভিজে-যাওয়া
পাখির ডানা ঝাপটানো
আবার পুকুরে, নদীতে
ডোবায় লাবণ্যের সাড়া
আমার পূর্ব-বাংলা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো। (আমার পূর্ব-বাংলা : তিন, *একক সন্ধ্যায় বসন্ত*, পৃ. ৬২)

অর্থাৎ, এখানে তিনি পূর্ববাংলার প্রকৃতির তুলনা করতে গিয়ে গরুর ডাক, পুকুর, নদী, গাছের পাতা এই সবকে উপমেয় হিসেবে দেখিয়েছেন যা শুধু নির্মল গ্রামের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাঁর *সহসা সচকিত* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে এই গ্রামীণ চিত্রটি এসেছে কখনো চড়ুই এর চোখে, নদীতে তালের নৌকায়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি অর্থাৎ, প্রকৃতি ও গ্রাম যেন মিলেমিশে এক মোহনায় মিশেছে :

জীবনের মায়া গাছের পাতায়,
চড়ুয়ের চোখে কাকের পাখায়,
মাছের চকিত গতিবিধি নিয়ে
অবগাহনের নদী অপার।। (৩নং কবিতা, *সহসা সচকিত*, পৃ. ৯২)

সৈয়দ আলী আহসান এর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি বিমূর্তকে মূর্ত করে তুলতেন। অর্থাৎ, পূর্ববাংলাকে তিনি উপমায়িত করেছেন লোককাহিনির বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এই বর্ণনা গ্রামীণ উপাদানে ভরপুর। গ্রামবাংলার লৌকিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৈয়দ আলী আহসান পরম মমতায় সৃষ্টি করেছেন তাঁর কবিতার শব্দমালা :

অশেষ অনুভূতি নিয়ে/পুলকিত সচ্ছলতা
একসময় সূর্যকে ঢেকে/অনেক মেঘের পালক
রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির/কেমন নিশ্চেতন করা গন্ধ
কত দশা বিরহিণীর– এক দুই তিন/দশটি। (আমার পূর্ব বাংলা : দুই, *একক সন্ধ্যায় বসন্ত*, পৃ. ৬০)

এখানে তিনি তাঁর প্রিয় পূর্ববাংলার রূপ সৌন্দর্যকে রাধার বিরহের দশটি অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার প্রচণ্ড আবেগে তিনি তাঁর প্রিয় পূর্ববাংলাকে নীল শাড়ি পরিহিতা প্রেয়সীর সঙ্গে উপমায়িত করেছেন। আর এই নীল শাড়ি পরিহিতা আর কেউ নয় সে বৈষ্ণব পদাবলি বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়িকা রাধা :

কাকের চোখের মতো কালোচুল/এলিয়ে
পানিতে পা ডুবিয়ে– রাঙা-উৎপল/যা'র উপমা
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে/দেহ ঘিরে
যে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল–/তুমি আমার পূর্ব-বাংলা
পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ। (আমার পূর্ব বাংলা : দুই, *একক সন্ধ্যায় বসন্ত*, পৃ. ৬১)

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ উপাদান বা সংস্কৃতির প্রভাব একটু একটু করে গাঁথুনি দিয়ে গড়া। *আমার পূর্ব বাংলা* কবিতায় রয়েছে বাঁশির সুর। বাঁশির সুরে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া তো বাঙালি সংস্কৃতিরই অংশ। এই সুর ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে গ্রামবাংলার অভিসারীর মনের ব্যাকুলতা।

সৈয়দ আলী আহসানের *সহসা সচকিত* কাব্যগ্রন্থের '১৬' নম্বর কবিতায় আরো কিছু লোকজ জীবনের ছায়া পাওয়া যায়– ঘুমের ছড়ার কথা, গল্প কাহিনি, কথকথার উল্লেখ আছে। আছে প্রবাদ আর ছড়ার কথার মধ্যে দিয়ে প্রেয়সীর নিকট ভালোবাসার আবেদন এবং না পাওয়ার বেদনা :

মনে হলে যেন খর-তরঙ্গ
আমি বিক্ষোভে একটি নদী;
ধ্যানের সীমায় সব কিছু ভুলে,
কথার কাকলী থামতো যদি,
আমার আবেশে তোমারে তখন
গড়ে নেব ভেবে বেদনা পাই। (২৪ নং কবিতা, *সহসা সচকিত*, পৃ. ১১১)

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে তেমনভাবে সফল না হলেও তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *একক সন্ধ্যায় বসন্ত*-এ বেশ কৃতিত্বের দাবিদার। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তাঁর কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি, গ্রাম ও লোকজ সংস্কৃতির যে আভা পাওয়া যায় সেটিও কম নয়। তাঁর কবি মানসে ছিল গ্রামবাংলা আর প্রকৃতির প্রতি অপার ভালো লাগা, ভালোবাসা– যা তাঁর 'আমার পূর্ব বাংলা'সহ বেশ কিছু কবিতায় ধরা পড়ে যা একজন সচেতন কবিমনের পরিচায়ক। সৈয়দ আলী আহসানের পরিশুদ্ধ পরিশীলতায় তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ গ্রামবাংলার সৌন্দর্যের যৌবনবতী নদীর স্রোতধারা।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কবিসম্প্রদায় আধুনিকতার সঙ্গে নিজেদেরকে গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের নানামাত্রিক ভাবনায় সম্পৃক্ত করলেন। আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ কবিদের সময়কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ প্রভৃতির ঢেউ এদেশে একের পর এক আছড়ে পড়েছিল। এর পাশাপাশি ছিল নিপীড়িত মানুষের উত্থান এবং বাঙালি-মুসলমানদের উত্থান। এসব অনুষঙ্গ চল্লিশের কবিদের গ্রামীণ সমাজমুখী ও আত্মচেতন করেছিল। চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় পর্যায়ে ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় ইসলামচেতন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমানদের পুনর্জাগরণকে এ সময়ের কবিগণ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান ক্রমান্বয়ে লোকজীবন বলয়ে প্রবেশ করেন। আর ফররুখ আহমদ ক্রমশ ইসলামি পুরাণের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগে মনোনিবেশ ঘটান।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি আবহমানকাল ধরে বাঙালির যাপিতজীবন প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের কবিতায় ঠাঁই করে নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় আধুনিক কালের কবি মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবন কবিতার উপাদান হিসেবে বিশাল জায়গা জুড়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক জুড়ে বাংলা কবিতায় গ্রামীণ ও

লোকজ জীবনের চালচিত্র ব্যাপকতা লাভ করে। ভাব ভাষা গঠনরীতি ছন্দে অলংকারে তিরিশের কবিতা স্বতন্ত্র চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে উঠলো।

বাঙালির স্বাধিকার লাভের প্রশ্নে ১৯৪২ সালে লাহোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে আস্থা এবং দ্বিধার সঞ্চার হয়। মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নানাবিধ কারণে কলকাতায় বসবাসকারী অনেক বাঙালি মুসলিম কবি ঢাকায় চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের মনে মননে পাকিস্তান প্রীতির জন্ম নেয়। তাঁদের কবিতায় তিরিশের চলমান ধারা নতুন রূপ লাভ করে। চল্লিশের দশকের কবিতায় ঘটতে থাকে তিরিশের দশকের কবিতার রূপ-রূপান্তর। আহসান হাবীব মধ্যবিত্তের চিত্তের ঔজ্জ্বল্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হন। তাঁর কবিতার বিশাল ক্যানভাস জুড়ে আছে শহরে বসবাসরত চাকরিজীবী, বিভিন্ন পেশার মানুষ, জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে ছুটে আসা অসহায় নগরমুখি মানুষ :

> তিরিশের কাব্যান্দোলনের উজ্জ্বল ধারা নিয়ে আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় যে জনজীবনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন, তা জীবনের কোলাহলময় দিকের নয় বরং জীবন যেখানে সংসারের বিবিধ সমস্যায় কাতর, ভগ্ন-দীর্ণ দুর্বিসহ বোঝার ভার বইতে না পেরে ব্যথায় অস্থির, মানবাত্মা যেখানে দলিত-মথিত, জীবনের সেই নৈরাশ্যময় ব্যথাদীর্ণ সমস্যা কণ্টকিত প্রতিচ্ছবি। (হোসেনউদ্দীন হোসেন, *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, পৃ. ৭)

বস্তুত, আহসান হাবীবের কবিতায় গ্রাম বা শহরের সমকালীন মানুষ এবং দেশ কাল সমাজ কাব্যবস্তুতে পরিপূর্ণ অবয়বে পরিণত হয়। এই চিত্র ফররুখ আহমদের কবিতায় তেমন নেই। তিনি ছিলেন ইসলামি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করার জন্য রোমান্টিকতার আশ্রয়ে মধ্যযুগে রচিত কাব্যের অনুসরণে বাংলা কবিতায় তার ছায়ারেখা অঙ্কন করেছেন তিনি। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন চিন্তাচেতনার ফসল বপন করার চেষ্ট করেছেন তিনি।

সিকান্দার আবু জাফর গণমানসের ছবি কবিতায় চিত্রণে ছিলেন পটু। তাঁর কবিতায় বাংলার মাটি ও মানুষের প্রকৃত রূপ নির্মাণের চেষ্টা স্পষ্ট। শ্রেণিবৈষম্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির মন্ত্র পাঠ করেছেন তিনি। ফলত, তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় জীবনের জয়গান। আর সৈয়দ আলী আহসান প্রকৃতিসংলগ্ন কবি ছিলেন বিধায় তাঁর কবিতায় মোটাদাগে ধরা পড়ে সৌন্দর্য প্রীতি মুগ্ধতা। স্নিগ্ধ পূর্ববাংলার রূপ রস কণ্ঠে ধারণ করে তিনি আবহমান বাংলার সৌন্দর্য অঙ্কনে দীর্ঘ সময় কবিতা নির্মাণে ব্যয় করেন। সব মিলিয়ে দেখা যায় চল্লিশের দশকের প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব এবং সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় গ্রামীণ জনপদের কথা, লোকায়ত জীবনের কথা, সর্বোপরি ব্যথাদীর্ণ জীবনের রিক্ততার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিরিশের দশকের কবিতার ভাবধারার

ধারাবাহিকতা চল্লিশের দশকের কবিদের মনে মননে অনেকাংশে বজায় থাকে। কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর ঘটতে শুরু করে চল্লিশের দশক থেকেই।

গ্রন্থ-সহায়িকা :

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *কবিতাসমগ্র ফররুখ আহমদ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯

৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৫. আবদুল হাফিজ, *আধুনিক সাহিত্য : বিবেচনাসমূহ*, মুক্তধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯১

৬. আহমদ রফিক সম্পাদিত, *আহসান হাবীব* রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

৭. আহসান হাবীব, *কবিতাসমগ্র*, তুষার দাশ [স], অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭

৮. নাসির আহমেদ, পূর্ববাংলার কবিতায় নব্য আধুনিকতা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, (সম্পাদনায় : সাজ্জাদ আরেফিন), ঢাকা, ২০১৩

৯. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *কবিতার শব্দ-সাঁকো*, নিই এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮

১০. মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

১১. মাসুদুল হক, *হাজার বছরের বাংলা কবিতা*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

১২. মাহবুবা সিদ্দিকী, *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজসচেতনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

১৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৮৫

১৪. মোতাহার হোসেন সুফী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কাকলী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০১

১৫. মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮

১৬. রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

১৭. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০১

১৮. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *কবি ফররুখ আহমদ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

১৯. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা, *আমাদের সাহিত্য*, [সম্পাদনায় : সরদার ফজলুল করিম], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

২০. সৈয়দ আলী আহসান, *কবিতা সমগ্র*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

২১. হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, সময়, ঢাকা, ২০০০

২২. হোসেনউদ্দীন হোসেন, *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক নানা কারণে বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমলগ্নে এসে রাজনৈতিক কপট সিদ্ধান্তে উপমহাদেশের এক প্রাচীন জাতি কেবল ধর্মীয় বিবেচনায় আলাদা রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হয়। বহুমাত্রিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিবেচনায় আত্মপরিচয়ের বেড়াজালে নিমজ্জিত পূর্ববাংলার বাঙালিরা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে বাংলা কবিতা দ্বিস্রোতে বিভক্ত হয়ে বাংলা কবিতা এবং বাংলাদেশের কবিতা হিসেবে উর্মিমুখর হয়ে পড়ে। সাতচল্লিশ পরবর্তী ঢাকাকেন্দ্রিক কবিতা বাংলাদেশের কবিতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দেশ বিভাগ এবং নতুন স্বপ্নে বিভোর কবিতায় যোগ হয় নতুন মাত্রা এবং আলোড়ন।

পূর্ববাংলার সাহিত্য রচনা তথা কাব্য রচনায় শিল্পের আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পায় ধর্ম, জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিকবোধ। রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় পাকিস্তানি হলেও শিল্প, সংস্কৃতি এবং নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় বাঙালিই থেকে যায় পূর্ববাংলার জনগণ। দেশবিভাগের ফলে সাংস্কৃতিক অবদমন, স্বপ্ন ভঙ্গ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, নতুন শোষক শ্রেণির উদ্ভব– সব মিলিয়ে পূর্ববাংলায় চলেছে চাপা ক্ষোভ এবং তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। যে স্বপ্নে দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিল এ দেশের জনগণ তা যে সঠিক নয় বুঝতে বেশি সময় লাগেনি পূর্ববাংলার মানুষের। প্রথমে অর্থনৈতিক শোষণ এবং পরে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিভেদ। ধর্মকেই রাষ্ট্র গঠনের ও জাতীয়তা নির্ধারণের একমাত্র নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রুচি, রীতিনীতি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলা অন্তর্ভুক্ত হলো পাকিস্তানের। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক কাঠামোও ছিল ভিন্ন। অর্থাৎ স্ববিরোধ একটা নয়, বহুবিদ। এর প্রভাব আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশের কবিতায়। রাষ্ট্রভাষা এবং জাতীয়তার প্রশ্নে কাব্যে যে ধারা বহমান হয়, ঊনসত্তরের পর তা রাজনৈতিক জীবনবোধের গভীরতায় পর্যবসিত হয়। প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারা সমকালীন পূর্ববাংলার কবিতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। কবিতা ব্যক্তিমনের মর্মমূল থেকে উৎসারিত হলেও, তার উৎস সমাজচেতনা, যা ব্যক্তিচৈতন্যকে প্রভাবিত করে। কবিতার যে প্রকরণগত এবং তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য তা পঞ্চাশের কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়ে বাঙালির আত্মসংকট এবং তা থেকে মুক্তির কাব্যিক সনদ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পঞ্চাশের কবিতা দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে :

এক. পাকিস্তানি বা ইসলামি ধারা, দুই. মানবতাবাদী বা দায়বদ্ধ ধারা। প্রথমোক্ত ধারার অনুসারী ছিলেন প্রধানত চল্লিশ দশকের দু'জন কবি সৈয়দ আলী আহসান এবং ফররুখ আহমদ এবং শেষোক্ত স্রোতের সঙ্গে

যুক্ত হচ্ছিলেন পঞ্চাশের নতুন প্রজন্মের প্রায় অধিকাংশ কবি। (মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২৩০)

পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন : আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-'৭৬), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-'৮৩), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩২-২০০১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৬-২০১৬), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৯-২০০৮) প্রমুখ।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ববাংলার নতুন কাব্য আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেছিল দুটি সংকলন, তা হলো : [*নতুন কবিতা* (১৯৫০) সম্পাদক : আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান এবং *একুশে ফেব্রুয়ারী* (১৯৫৩)]। *নতুন কবিতা* দেশ বিভাগোত্তর বাংলাদেশের প্রথম কবিতা সংকলন, *একুশে ফেব্রুয়ারী* একুশের চেতনাসমৃদ্ধ প্রথম কাব্য সংকলন। এছাড়াও ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় *পূর্ববাংলার কবিতা* (সম্পাদক : আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ) নামে আরেকটি সংকলন। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে মতাদর্শগত মেরুকরণ পুরো পঞ্চাশের দশকের কাব্যভুবনকে টালমাটাল করে রেখেছে। পঞ্চাশের কবিদের প্রসঙ্গে সৈয়দ আকরম হোসেন লিখেছেন :

> পঞ্চাশের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনদর্শন ও চৈতন্য প্রবাহগত প্রশ্নে দ্বি-স্রোত লক্ষণীয়। একটি বুর্জোয়া মানবতাবাদ– মযহারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ, আজীজুল হক, আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ এর অন্তর্ভুক্ত। অপর পক্ষে মার্কসবাদী জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতিবাদী কবিবৃন্দ– আবদুল গণি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ। (সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৩৮-৩৯)

পঞ্চাশের দশকের কবিগণ তিরিশের চেতনাকে ধারণ করে তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্ত করেছেন দেশ, মাটি, সময়, সমাজ ও সংস্কৃতিভাবনা। অতি রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন বলেই তাঁদের কাব্যচর্চায় ব্যক্তিসত্তার চেয়ে গণতন্ত্রই মূল প্রবণতা হয়ে উঠেছে। এর ফলে রাজনীতি, সমাজ ও প্রেম তাঁদের কবিতাকে বহুক্ষেত্রে বিষয় ও বৈচিত্র্যহীন করেছে। সমকালীন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-কাব্যিক নানামাত্রিক সংকটসমূহ তাঁদের কাব্যচর্চায় ভাবনার জগতকে সংকীর্ণ করেছে। আধুনিক কাব্যভাষা এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে বহুমাত্রিকতা এ দশকে প্রায় নেই বললেই চলে। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশের অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ :

> শহীদ কাদরীর বিষণ্ন নাগরালি, আত্মমেহন ও বোদলেয়রীয় অশুভ চিন্তন, রাহমানের আত্মগত স্বপ্ন-বিক্ষোভ, আল মাহমুদের আবহমান বাংলার আধুনিক কাব্যভাষা নির্মাণ এবং হাসান হাফিজুর রহমানের আরক্তিম

> সমাজভাবনা পঞ্চাশের কবিতা তথা এই ভূখণ্ডের আধুনিক কবিতার ভিত্তিভূমিটি নির্মাণ করে। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ৩৪০)

প্রকৃতপক্ষে, এ দশকের কবিগণই কবিতাকে দেশজ ও মানবতাবাদী করেছেন, দিয়েছেন নান্দনিকতা। তিরিশের দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতায় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমুখিতা ছিল তা থেকে অনেকাংশে পঞ্চাশের দশকের কবিগণ মুক্ত হয়েছিলেন। ইসলামি ভাবধারায় নিমজ্জিত যে কাব্যধারাটি এ দেশের কবিতাকে মূলধারা থেকে বিচ্যুত করে সাম্প্রদায়িক আবহ সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিল তাও পঞ্চাশের দশকে গতিহীন হয়ে পড়ে। এ দশকের কবিরা বৈচিত্র্যসন্ধানী হয়েছেন নানা সংকটে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে সৃষ্ট অভিজ্ঞতা কবিতায় এনেছে বিচিত্রতা ও বহুমুখিনতা। এ সময়ের কবিতা নান্দনিকতা, রোমান্টিকতা, নাগরিকতা, বিশুদ্ধবাদিতা আর মৃত্তিকাস্পর্শী নানা চেতনার মিশেল ভাণ্ডার। মাটি, মানুষ, দেশ, সমাজ, নারী, নিসর্গ, জাতীয়তাবোধ, সমাজমনস্কতা, স্বদেশ ও বৈশ্বিক রাজনীতি ছিল পঞ্চাশের দশকের কবিদের কবিতার মূল উপজীব্য।

পঞ্চাশের দশকে সামাজিক রূপান্তরের এক বিরাট প্রভাব পড়ে শিল্প-সংস্কৃতির ওপর। শিল্প হোক মূর্ত বা বিমূর্ত, সমাজে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তারই প্রচ্ছায়া পড়ে শিল্পীর মনে। আধুনিক কবিদের মানসলোকেও তার ছায়াপাত সুস্পষ্ট। পঞ্চাশের দশকের কবিদের প্রসঙ্গে কবি আজীজুল হক (১৯৩০-২০০১) লিখেছেন :

> আমাদের পঞ্চাশের দশকের কবিতাকর্মসমূহ এখানে এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কেননা, সামাজিক অস্থিরতা, বিভ্রান্তি ও ঐতিহাসিক ছিন্নস্রোতে বিমূঢ় থেকেও তখনকার তরুণ কবিকুল আধুনিক বাংলা কবিতার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আদি অহঙ্কারকে চৈতন্যগত করে নেবার প্রাথমিক প্রয়োজনটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে থেকে ভিন্নকালের পটভূমিকায় স্বতন্ত্র উদ্যোগে বাংলাদেশের কবিতার নতুন যাত্রা শুরু। (আজীজুল হক, *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*, পৃ. ৭৬)

পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ কবিই হলেন মানবতাবাদী বা দায়বদ্ধ ধারার। যার ফলে বুর্জোয়া মানবতাবাদী বা দায়বদ্ধ ধারার মানসিকতার বুদ্ধিজীবীগণ যে সংগঠন তৈরি করেন 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর উদযোগে কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদনা করেন '*একুশে ফেব্রুয়ারী*' (১৯৫৩) যা একুশের ঐতিহাসিক সংকলনরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরই হাত ধরে আধুনিকতা আর মানসিকতার ধারা বহমান হয়।

আবার পঞ্চাশের দশকে দেখা যাবে সেখানেও মূলত দু'টি ধারা বহমান। এক. বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধারা– এঁরা হলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং আবদুল গণি হাজারী। আর দ্বিতীয়টি বলতে দায়বদ্ধ কবিতার ধারা। এই ধারার

কবিরা হলেন- আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং হাসান হাফিজুর রহমান। *নতুন সমাজ*, *নতুন কবিতা* ও *২১শে ফেব্রুয়ারী* সব মিলিয়ে বেশ কিছু তরুণ কবি বাংলা কবিতার ধারাকে আধুনিকতায় পর্যবসিত করে তা স্পষ্ট। বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়েছিল সেখান থেকে প্রতিবাদ করা হলো সবদিক থেকে। কবিতাতে এই প্রতিবাদ ধরা পড়ে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের ঐতিহাসিক সংকলন *২১শে ফেব্রুয়ারী*তে। পাকিস্তান গঠনে কবিদের মনে যে ভুল ধারণা ছিল, তা ভাঙতে দেরি হলো না। তাদের মনে আস্তে আস্তে ইসলামি ভাবধারা দূর হয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকল অসাম্প্রদায়িক– সাম্যবাদী ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনায়। ফলে :

> কবিদের যৌথ কাব্যভাবনায় প্রকাশ পেল বুর্জোয়া মানবতাবাদ, দর্শন, মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রতিবাদী মন, রোমান্টিকতা, স্মৃতিরোমন্থন, পরাজয় চেতনা, ভাববাদ-বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব, পলায়নী মনোবৃত্তি, আত্মরতি, ইতিহাস জ্ঞান প্রভৃতি। (রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, পৃ. ৮৯)

ইসলামি ধারা যখন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এলো অর্থাৎ কবিরা যখন বুঝতে পারলেন যে সংকীর্ণতায় নয় বরং উদারভাবে সাহিত্য রচনার মধ্যে রয়েছে মানব মুক্তির উপযুক্ত পথ। তখন পঞ্চাশের কবিরা ঐতিহ্যের পরম্পরায় আশ্রয় নিলেন তিরিশের কবিদের কবিতায়। বিশেষ করে প্রকৃতি, প্রেম, জীবন ধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। পঞ্চাশের দশকের প্রায় সব কবিই ছিলেন আত্মবিশ্লেষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী। সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিক, সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে তখনকার যে পরিস্থিতি তার প্রভাবে সবাই প্রভাবিত ছিল। তাই তাঁদের রচনায় এই প্রভাব অনস্বীকার্য। আর তিরিশ ও তিরিশ-পরবর্তী কবিতার ধারা ও ঐতিহ্যকে লালন করেছিলেন পঞ্চাশের কবিবৃন্দ।

লক্ষ করা যায়, পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলার সাহিত্য বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। এর কারণ হিসেবে বলা যায়– আবহাওয়াগত যে পরিবর্তন, ষড়ঋতুর যে পালাবদল, গ্রামবাংলার সহজ সরল খেটে খাওয়া মানুষ, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, মাঝি, গাছপালা, শালিক, ময়না, গ্রামের ভেতর ছনের বাড়ি, পূর্ণিমার চাঁদ, সকালবেলার সূর্য, গোধূলিলগ্ন এসবই বাংলাদেশের কবিতায় মিশে আছে। তাই পঞ্চাশের কবিরা স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা তাঁদের কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসান হাফিজুর রহমান

পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতার উজ্জ্বল নক্ষত্র হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)। তিনি ছিলেন পঞ্চাশের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল কবি। হাসান হাফিজুর রহমানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : *বিমুখ প্রান্তর* (১৯৬৩), *অন্তিম শরের মতো* (১৯৬৮), *আর্ত শব্দাবলী* (১৯৬৮), *যখন উদ্যত সঙ্গিন* (১৯৭২) *বজ্রে চেরা আঁধার আমার* (১৯৭৬) প্রভৃতি। তাঁর কবিতায় রয়েছে নিজস্ব ভাবনার সম্প্রসারণ। তিরিশের পর থেকে এই পর্যন্ত তিনিই বাংলাদেশের কবিতাকে তুলে ধরেছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে :

> ১৯৪৮ সাল থেকে সূচিত ভাষা আন্দোলন, দ্বন্দ্ব-জটিল সমাজ-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সমাজমানসের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দুঃসহ বাস্তবতা এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদ ও আত্ম-উজ্জীবন সংবেদনশীল শিল্পিচিত্তে হয়ে উঠেছিলো নবসৃষ্টির পথনির্দেশনা। ফলে, অতীত-গর্ভে নিমজ্জিত রাষ্ট্রীয় আদর্শ হলো পরিত্যাজ্য; গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি প্রভৃতি মানবকল্যাণধর্মী মতাদর্শ ও চিন্তাধারা শিল্পকলার মৌল উপাদানে পরিণত হওয়ার অবকাশ পেল। শিল্পী যেহেতু সমাজের প্রাগ্রসর চেতনার প্রতিভূ, সে–কারণে এ–পটভূমিতে শিল্পীর দায় বৃদ্ধি পেলো বহুগুণে। বাংলাদেশের কবিতায় হাসান হাফিজুর রহমান সেই দায় বাস্তবায়নের অগ্রবর্তী শিল্পিপুরুষ। (রফিকউল্লাহ খান, *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৭৫)

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হাসান হাফিজুর রহমান মানসপ্রবণতার ধারক। তাঁর নিজস্ব কবিতাগুলোতে এর ছায়াপাত ঘটেছে। একজন কবি তার মানসলোকে নিত্যদিনে ঘটে যাওয়া আনন্দ, হাসি-কান্না, বেদনা, প্রেম, প্রকৃতি, শূন্যতা এই সবেরই বিচ্ছুরণ ঘটান। তার মানসপটে বাস্তবতার এই অনুভূতিগুলো আন্দোলিত না হলে তাকে কখনো সার্থক কবি বলা যায় না। হাসান হাফিজুর রহমান কবিতাকে রোমান্টিক ভাবনা থেকে দূরে রাখেন। কারণ, এই ভাবনা থেকে দূরে না থাকলে কবিতা বাস্তবতা থেকে বিমুখ হবে। বাস্তবতার পরাকাষ্ঠেই নিহিত থাকে কবির নিজস্বতা, আত্মোপলব্ধি, আত্মজাগরণ :

> আর এই অস্তিত্বের উপলব্ধি তখনই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে যখন কবি চৈতন্য নিন্মোদ্ধৃত চেতনার ত্রিস্রোতকে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত করে দিতে পারে তাঁর কবিতায় : প্রথমত, অন্তর্লীন ও আবহমান ইতিহাসবোধ; দ্বিতীয়ত, জাগতিক ঘটনা পারম্পর্য ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ প্রচেষ্টায় ধারণা সম্পাত ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ এবং তৃতীয়ত, অবচেতন সজ্ঞানতা ও মনোবিকলন। (মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২৪০)

সর্বদিক বিবেচনায় দেখা যায় হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে দেশ, কাল ও শিল্প। তিনি অনেক বেশি মানবিক কবি। কবিতাকে তিনি ইউরোপীয় কাব্যধারা থেকে সরিয়ে একান্তভাবে

বাংলাদেশের নিজস্ব আলো বাতাসের অর্থাৎ একান্তই বাংলা আবহাওয়ায় কবিতা করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক কবি। প্রথম দিকের কবিতায় তাঁর স্বদেশপ্রেম সহজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবহমান থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা অস্পষ্ট ও কঠিন হতে থাকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা তোলপাড় করে তুলেছিল তাঁকে। 'দর্পিত দর্পণ যেন স্বদেশ আমার' দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কবি দেশের মধ্যে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পান।

হাসান হাফিজুর রহমানের স্বদেশচেতনাবিষয়ক কবিতার সঙ্গে দেখা যায় প্রেমচেতনার মিশ্রণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবিতার মধ্য থেকে রোমান্টিকতাকে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন :

> ব্যক্তির চৈতন্যমুক্তি ও সমাজমুক্তির আকুলতা *বিমুখপ্রান্তর*-এর অধিকাংশ কবিতায় বিধৃত। এক আপাতবিমুখ, অনুর্বর ও রুক্ষ সময়ের অন্তরালবর্তী শিল্পিসত্তা জীবনের জন্য প্রত্যাশা এবং উজ্জ্বল মুক্তিসম্ভাবনাকে লালন করেছে ঐকান্তিকভাবে। (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ১১৯)

টি. এস. এলিয়টের The Waste Land কাব্যের সঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমানের *বিমুখ প্রান্তর* কাব্যের ভাবস্পন্দনের সাযুজ্য লক্ষণীয়। এলিয়টের কাব্যের অর্থ পোড়ো জমি। আর বিমুখ প্রান্তর অর্থ –মুখ ঘুরিয়ে আছে যে প্রান্তর। এ বিষয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের ভাবনা অনুধাবনযোগ্য :

> বিমুখ প্রান্তর–মুখ ঘুরিয়ে আছে যে প্রান্তর, আর Waste Land-এ মরা মাটির কথা। অবক্ষয়ের কথা আমি বলিনি, আটকা পড়া জিনিসের মুক্তি চেয়েছি আমার কাব্যে। Waste Land-এ decadence বা অবক্ষয়ের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, বিমুখ প্রান্তর-এ উত্তরণের কথা। এলিয়টের প্রস্থান ধর্মের দিকে, আমার গন্তব্য বাস্তবতার দিকে। (উদ্ধৃত : রফিকউল্লাহ খান, *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৭৮)

হাসান হাফিজুর রহমানের মতে, 'কবিতার বিষয়বস্তু হল, জাগতিক আবর্তের স্বরূপ, আর কবির মন।' (হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, পৃ. ১৩) তাই কবিমনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর ভাষাও হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকের সব কবিদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতা প্রাণ পায় তারই একান্ত অস্তিত্বে, বাস্তবতায় ও কল্পনার সমন্বয়ে। তিনি বাংলাদেশের কবিতাকে আধুনিকতার এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে রূপদান করেছেন।

পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় হাসান হাফিজুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ কবি-প্রতিভা। পূর্ব-বাংলার কবিতার সংগঠক এবং *একুশে ফেব্রুয়ারী* নামক কবিতার সংকলক ও সম্পাদক ছিলেন তিনি। হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন কবিতার নিরীক্ষক ও বৈশ্বিক কাব্যান্দোলনের পথিক। শিক্ষক ও সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি ছিল তাঁর। ব্যক্তিজীবনে তিনি পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে দায়বদ্ধ সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতি-

সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে শতভাগ দায়বদ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিবাদী ফসল *'একুশে ফেব্রুয়ারী'* (১৯৫৩)। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় অমর সৃষ্টি হলো : *বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র*। সমাজের অবক্ষয় দেখে এবং সাংস্কৃতিক আঘাতে ক্ষুব্ধ কবি হাসান হাফিজুর রহমান কুশলী শিল্পীর মতো শৈল্পিক জ্ঞানে কবিতা নির্মাণ করেন। সংগঠক-সম্পাদক-প্রাবন্ধিক-গল্পকার-অধ্যাপক-সাংবাদিক-কূটনীতিক ও গবেষক হিসেবে হাসান হাফিজুর রহমানের সারাজীবন কাটলেও, তিনি ছিলেন মূলত কবি।

বাঙালি-মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বলতম দশক পঞ্চাশের দশক। এই দশকের সৃষ্টিশীল শাখার নাম কবিতা। তিরিশ এবং চল্লিশের কবিরাও এ দশকে অধিক বিকশিত হন। কবি-সাহিত্যিকগণ প্রবলভাবে আলোড়িত হতেন আর তার ছায়াপাত ঘটত তাঁদের লেখনীতে। এ দশকের কবিদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে স্বদেশ-বন্দনা। স্বদেশের আনন্দ-বেদনায় কবিগণ সাড়া দিয়েছেন। হাসান হাফিজুর রহমানের ক্ষেত্রেও স্বদেশই হয়ে ওঠে তাঁর জীবন ও কবিতার একমাত্র অবলম্বন :

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক স্মৃতি ও রক্তচিহ্ন মানবমন থেকে অপসৃত হতে না- হতেই পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার অন্তর-বাহিরের ক্ষয় ও রক্তক্ষরণ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধকে যখন প্রায় অনিবার্য করে তুলেছে; ব্রিটিশ কলোনিশাসনের বিরুদ্ধে ভারত উপমহাদেশে যখন সূচিত হচ্ছে নিরন্তর সাধনা, আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম; সংঘটিত হচ্ছে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠোর দমন-প্রক্রিয়া এবং বিপ্লবীদের নব নব কর্মোদ্যোগ– জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমাজ-রাজনীতির এই অস্থির, দ্বন্দ্বময়, গতিশীল ও পরিণতিমুখী পটভূমিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত বাংলাদেশে হাসান হাফিজুর রহমানের জন্ম। (রফিকউল্লাহ খান, *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩)

হাসান হাফিজুর রহমানের কবি মানসের মূলে কাজ করেছে দেশাত্মবোধ। শুধু বোধ নয়, তাঁর মর্মে মর্মে তা অনুভূত হতো। তাই স্বদেশকে তিনি নিজেরই প্রতিরূপ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। হাসান হাফিজুর রহমানের কাছে :

> ভাষা আন্দোলন কেবল জাতিসত্তার নবজন্মই সাধন করে নি, কবিতার জন্যও সৃষ্টি করেছে নবতর উপকরণ-উৎস, জীবনচেতনা এবং শিল্পরীতি। ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, ক্ষোভ, যন্ত্রণা তাঁর কবিতায়ও রূপলাভ করেছে সত্য কিন্তু পরিণামে তিনি বৃহত্তর জীবনপ্রবাহের অংশভাগী হয়েই কথা বলেন। তাঁর সত্তার শেকড় নিজ ভূখণ্ডের মৃত্তিকামূলেই নিহিত আছে। এ-কারণেই বিমুখ প্রান্তর কাব্যের আবেদন যত-না আমাদের ব্যক্তিগত অভিররুচি-উপলব্ধির কাছে, তদপেক্ষা ব্যাপক অর্থে জাতির সঙ্ঘচেতনা, সংস্কৃতিচেতনা, রাজনীতিভাবনা ও স্বদেশ-অন্বেষার কাছে। (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ১১৮)

হাসান হাফিজুর রহমান দেশ, কাল-এর প্রেক্ষাপটে তাঁর স্বদেশচেতনার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার লোকজ দিকটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। কখনো ভাষা আন্দোলনে পাকিস্তানি অপশক্তি, কখনো

বাঙালি-সংস্কৃতি নস্যাৎকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন– তাঁর ঐতিহ্যবাহী গ্রামবাংলার নিত্যদিনের চলাফেরা এবং ওঠা-বসার মধ্যদিয়ে। তিনি আশাবাদী কবি। তাঁর কাছে মনে হয়েছে বাংলার প্রান্তর নারাজ, বিমুখ। তথাপি তাঁর বারবার মনে হতে থাকে মাটি ফুঁড়ে একদিন উঠবেই জীবনের আলাপন। তাঁর কবিমনের পেছনে যে ব্যক্তিসত্তা ক্রিয়াশীল তা সমাজমানসের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিত্য বিচরণশীল। হাসান হাফিজুর রহমান মরা মাটি ও বিমুখ প্রান্তরে জীবনের অস্তিত্বময় প্রাণস্পন্দন প্রত্যক্ষ করেন :

মরা মাটি ফুঁড়ে ওঠে জীবনের কায়া/লাল ত্বকে সবুজাভ ক্ষীণ তরু
হলুদ বসন্তে ওরে দেখা দিবি নাকি এই/বিমুখ প্রান্তরে (বিমুখ প্রান্তর, *বিমুখ প্রান্তর*, পৃ. ২৫)

হাসান হাফিজুর রহমান প্রবলভাবে চেয়েছেন যে কোনো বাধা থেকে উত্তরণের জন্য। পূর্ববাংলায় বাঙালির ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে ত্রিমুখী আক্রমণ চলে, তা ছিল মধ্যবিত্ত মানসে আশা-ভঙ্গের বেদনা। সে সময়ের অসহায়ত্ব অনেকটা তাকে বিষণ্ন ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। এই নৈরাশ্য ও অন্তর্মুখীনতার মধ্যেও তিনি স্বদেশ, মাটি, মানুষের কথা ভাবেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, কবিমন সবসময় মানুষ ও সমাজকে ঘিরে জায়মান। তাই তাঁর প্রথম কবিতা 'বিমুখ প্রান্তর' হয়ে ওঠে পল্লি-প্রকৃতি ও বীর কৃষকের বিষয়। হাসান হাফিজুর রহমান স্বদেশানুভূতির প্রকাশ করেছেন নদী-নালা, গাছ-পালা, বৈশাখের ঘূর্ণিবায়ু এবং আষাঢ়ের ঢল এর মাধ্যমে। তাঁর স্বদেশকে তিনি 'বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন। *বিমুখ প্রান্তর* কাব্যগ্রন্থের উপজীব্য হলো– স্বদেশ, সমকাল ও ঐতিহ্য। তিনি স্বদেশ প্রকৃতির অনিঃশেষ সৌন্দর্যে যেমন মহিমান্বিত, তেমনি তা সমাজ, মানুষ ও সুনির্দিষ্ট ভূগোলনির্ভরও বটে। 'দর্পিত দর্পণ' স্বদেশের বর্ণনায় দেশাত্মবোধের ভূগোল সম্পর্কেও সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। পঞ্চাশের দশকের পাকিস্তানি উন্মাদনার ভেতরেও স্বদেশের স্বপ্ন দেখা এবং কবিতায় স্বদেশকে তুলে ধরা রীতিমতো বিস্ময় :

দর্পিত দর্পণ যেন স্বদেশ আমার/নদীনালা গাছপালা প্রশান্ত খামার
বৈশাখের ঘূর্ণিবায়ু, আষাঢ়ের ঢল/মুগ্ধপটে ফুটে ওঠে বিম্বিত উজ্জ্বল। (স্বদেশ আমার, *বিমুখ প্রান্তর*, পৃ. ৩৭)

হাসান হাফিজুর রহমান কবিতায় উচ্চকণ্ঠ নন, তবে প্রতিবাদী ভাষা সোচ্চার হয় তাঁর শৈল্পিক সুষমায়। আবেগ, দর্শন, অস্তিত্বের সংকট– এসবের মাঝে রাজপথ থেকে কবিতা নির্মাণ পর্যন্ত পদে পদে তিনি ছিলেন শিল্পিসত্তার ধারক। 'সকলি ফিরবে প্রথমায়' কবিতায় দেখা যাচ্ছে মাটি, রাত্রি, বাঁশবন যা গ্রামবাংলার রূপকল্প :

বাঁশবনে চাঁদ নামে/রাত্রি নাম ধরে আলোছায়া
মাটি, কালো রঙ, বিস্মৃত সবুজ। (সকলি ফিরবে প্রথমায়, *বিমুখ প্রান্তর*, পৃ. ৩৭)

হাসান হাফিজুর রহমান গ্রামীণ ও লোকজজীবনের অতিবাস্তব অনুষঙ্গ নিয়ে তাঁর দেশমাতৃকার অন্তরে অবগাহন করেছেন। 'অমর একুশে' কবিতায় যেখানে শহিদের আত্মত্যাগের প্রেরণায় মূর্ত, সেখানেও উপমা হিসেবে এসেছে কৃষক ও কৃষিশ্রমের নানা অনুষঙ্গ। তাঁর অনুভূতির এমন চমৎকার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব হয়েছে আবহমান বাংলার চিরায়ত কৃষক ও কৃষিজ উপকরণের ভেতর দিয়েই। বর্ষার পলিসিক্ত মাঠ, রোপিত ধানের চারা, সোনালি শস্য, শস্যশিল্পী কৃষকের 'সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়' প্রতীক্ষা ছিল কবির। এই চেতনাধারায় তিনি লোকজসংসারের গণবোধকেই আকর করে নিয়েছিলেন :

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালি শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সবু সবু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি;
দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে-জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে
দেখিয়েছো– বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিলে; (অমর একুশে, *বিমুখ প্রান্তর*, পৃ. ৪০)

হাসান হাফিজুর রহমানের দেখা গ্রাম, গ্রামের সংস্কৃতি ও জনপদ ধীরে ধীরে অনবরত ভাঙনের কবলে পড়ে। মানুষ তখন নগরমুখী যাপিত জীবন-যন্ত্রণায়। যান্ত্রিক জীবন গ্রাস করে ফেলে সব। তবুও তাঁর কাছে গ্রামবাংলার সবচেয়ে অপরিহার্য বস্তু হলো নদী। বাংলার নদ-নদী ঘুরে ফিরে তাঁর কবিতার বিভিন্ন বিষয়ের ভেতর ঠাঁই করে নেয়। সেই সঙ্গে গ্রামের মাঠে, ঘাটে, ভাঙা মাস্তুলের নৌকা, লাল টিনে ছাওয়া ঘর, ক্ষেত খামার মিলে মিশে একাকার :

প্রকৃতি ও মানুষের অগোচর সমঝোতা,
ক্ষেত খামারের দেশ– স্রোতের অজান্তে বেড়ে-ওঠা। (যাবে নদী, *বিমুখ প্রান্তর*, পৃ. ৫৫)

কবি হৃদয়াবেগ ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁর পূর্ব-পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত গ্রামবাংলার কথা তিনি ভুলতে পারেননি। ইতিহাস ঐতিহ্য যে ভুলে থাকবার বিষয় নয়, তা তাঁর 'গ্রহণগ্রস্ত নগরী' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। পথের বাঁকে, নদীর কলকল শব্দে, পাখির মিতালিতে, লাঙলের ক্ষুধার্ত আঁচড়ে কবির ঐতিহ্য মিশে থাকে। নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না হাসান হাফিজুর রহমান। আধুনিক মানুষের মতোই তিনি সংশয়ী হন, তবে সংশয় তাঁর স্থায়ী নয়। তাই তাঁর যাপিতজীবনে মর্ত্যজীবনের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি লক্ষণীয়। এখানেও তিনি তাঁর ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভেতর দিয়ে জামরুল আতা আমলকির সুপক্ক সম্ভারে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির প্রান্ত ছুঁয়ে যান।

নিজ দেশে যেন পরবাসী কবি। বহিঃশত্রুর ভয়ে কারো জীবনে শান্তি নেই। পরাভূত হবার বাস্তবতা সম্পর্কে সজ্ঞান ধারণা লাভ করেছেন কবি। কিন্তু পরাজিত হবার ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্জ্বলিত অনীহা প্রকাশ

করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। 'অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি' কবিতায় তাঁর সংগ্রামশীল সত্তার জাগ্রত প্রতিধ্বনি বিধৃত হয়ে আছে। দুঃসহ দিনের ভেতরও তিনি তাঁর প্রাণের বাংলার রূপ-ঐশ্বর্যে ভরপুর চিত্রকলা অঙ্কন করেছেন গ্রামীণ ঝোপ-ঝাড় আর ডাহুকের নিবিড় নীড়ে :

বেতবনের গভীরে/ডাহুকের নিবিড় নীড়ের কাছাকাছি
এখন আমার অজ্ঞাতবাসের দিনগুলো। (অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি, *যখন উদ্যত সঙ্গিন*, পৃ. ১৭৪)

হাসান হাফিজুর রহমানের আশাবাদী, মানব ও জীবনমুখী অনুভবের রূপায়ণ ঘটেছে 'লেলিনের কণ্ঠ' কবিতায়। কবির অস্তিত্বের গভীরে অনুরণিত লেলিনের কণ্ঠ– যার মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে জীবন-যৌবনের প্রাণমন্ত্র, খুলে যায় ইতিবাচক জীবন-অভীপ্সার উজ্জ্বল উৎসমুখ। লেলিনের কণ্ঠের দৃঢ়তায় যেন সব তাপশক্তি দূর হয়ে যায়। সুখ-দুঃখে যে কোনো সময়ই দৃঢ় থাকাটাই তিনি জানেন। এ সব কিছুই তিনি তাঁর গ্রামবাংলার রূপচিত্রকল্পে সিদ্ধহস্তে কৃষকের লাঙলের ফলার মধ্য দিয়ে আঁকেন শ্রমিকের পেশি অর্থাৎ পরিশ্রমী ও মেহনতি মানুষে গড়া এই সোনার বাংলায় :

কবির ঘর্মাক্ত কারিগর এক, দুঃখ তার/রৌদ্রজলে ঢাকা, আঁধারে সমূল গাঁথা।
শিশুর কান্নার জল মুক্তো হয় শব্দের ঝিনুকে,/কৃষকের লাঙলের ফলা অন্নপূর্ণা মূর্তি গড়ে,
(লেলিনের কণ্ঠ, *বজ্রে চেরা আঁধার আমার*, পৃ. ২২৫)

হাসান হাফিজুর রহমান একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে নিভৃতে লালন করেছেন। তাঁর আত্ম-রসাশ্রিত কল্পনা ও সংক্ষুব্ধ অনুরাগ প্রাত্যহিক ধুলিমলিন পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষোভ ও নিরানন্দের মধ্যে মুক্তির সন্ধান করেছেন। হাসান হাফিজুর রহমান সমসাময়িক দেশজ চেতনা ও কালচেতনার ওপর ভিত্তি করে কবিতা লিখলেও তাঁর বিষয়বস্তুতে বারবার উঠে এসেছে বাংলার প্রকৃতিসংলগ্নতা, বাংলার গ্রামীণ আবহ ও লোকজজীবন-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়াদি :

> ঐতিহ্য-সম্পৃক্ততা হাসান হাফিজুর রহমানের কবিসত্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিপার্শ্বিক তীব্র অবক্ষয় সত্ত্বেও, তিনি এই ঐতিহ্যের অবলম্বন থেকে বিচ্যুত হন নি। এই অবলম্বনই তাঁকে আশাবাদে অবিচল রেখেছে, উজ্জীবিত করেছে সাহসে। বস্তুত চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পদাবলী-ময়মনসিংহ গীতিকা হয়ে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের যে প্রবহমান ধারা, হাসান হাফিজুর রহমান তারই উত্তরাধিকার বহন করছেন তাঁর মেধা ও মননে। তাই তাঁর কবিতা সহজে একটা সমৃদ্ধতর ও সুদৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে আমাদের কৃষিনির্ভর সমাজের অভ্যন্তরে। এর শেকড় বিস্তৃত রয়েছে সুদূর অতীতে এবং তার শাখা প্রশাখাগুলি আন্দোলিত হয়েছে বর্তমানের অস্থির প্রেক্ষাপটে। *বিমুখ প্রান্তর*-এর অধিকাংশ কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প। এও লক্ষণীয় যে, নাগরিক বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় নগর নয়, গ্রামই প্রধান হয়ে উঠেছে। (মিনার মনসুর, *হাসান হাফিজুর রহমান : বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘর*, পৃ. ৮১)

হাসান হাফিজুর রহমান সমাজসচেতন সংবেদনশীল চিত্তের অধিকারী একজন কবি। তাঁর মধ্যে চিত্তের গভীর আর্তনাদ নিরন্তর বহমান। দৈনন্দিন কর্মের যন্ত্রণা ও ক্লান্তির মধ্যে জীবনের স্বাদ এবং আগ্রহের সন্ধান করেছেন তিনি। হাসান হাফিজুর রহমানের প্রেম ও বিরহ জাতীয় কাব্যেও এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় :

এতকাল ধরে নদী পাড় ভাঙছে,/এতকাল ধরে নদী পাড় উপচে উঠে আসছে ঘরে,
তবু নদী সর্বনাশ নয়,/তবু নদী সানন্দ জলবতীই থাকে চিরকাল,
(এতবার করে দেখ, *ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী*, পৃ. ৩৩২)

কবি নব্য শহুরে হওয়াকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তার ভেতরও শোভা পায় গ্রামের হাট-বাজার, যেখানে গ্রামের সংবাদও অনেকে খোঁজাখুঁজি করে। অর্থাৎ, ঢাকা শহর যে আস্তে আস্তে নব্য আধুনিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে আবার সম্পূর্ণটা পারছেও না সেটিও কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণকে এড়াতে পারেনি। হাসান হাফিজুর রহমান ক্লান্ত হয়েছেন নগরাভিমুখী জীবনের টানাপোড়েনে। তাই তিনি দুঃখ ক্লিষ্ট আর হতাশা থেকে বের হয়ে ফিরে তাকান তাঁর লোকঐতিহ্যসমৃদ্ধ আবহমান বাংলার দিকে। চিরায়ত নৌকা মাঝি-মাল্লা আর অবারিত মাঠে একাকী হেঁটে যাওয়ার স্মৃতিরোমন্থনে :

কতদিন একা একা মাঠে জলে ভুলে/অজানায় কেঁপে কেঁপে হারাই না সন্ধ্যার শ্যামলে
দেখিনা দু-চোখ ভরে শেফালির বকুলের/ঝরে-পড়া আর ভেজা শিশিরের পরে
শীতের সকালে। (স্মৃতির আগুনে জ্বলে, *বিমুখ প্রান্তর*, পৃ. ২৯-৩০)

'স্মৃতির আগুনে জ্বলে' কবিতায় আছে– ধুলো-মাটি, নদীহীন, প্রাণহীন শহরের ভীড়ে মানুষ 'সুযোগ-শিকারে' ব্যস্ত নিরন্তর। নির্দয় শহরে প্রকৃতি-বৈভবের কোনো স্পর্শ নেই। শহর-নগর কবির মনে কোনো প্রেরণা জাগায় না। শহর এক বন্ধ্যা জনপদবিশেষ। নগরে বনবাতাসের ধ্বনি নেই। হাসান হাফিজুর রহমানের মানসপটে ভেসে ওঠে থরে থরে সাজানো ফুলের বাগান, আঁকা-বাঁকা নদীর ছবি। তাঁর স্বপ্নমননে গ্রামীণ সহজ মানুষের নিত্য আনাগোনা।

হাসান হাফিজুর রহমানের মনে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ম্রিয়মান। সমকালীন বাস্তবতা তাঁকে তাঁর ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শুরু হয় তাঁর মানসপ্রবণতায় আঘাত। তাই আশাবাদী কবি সাময়িক নেতির মধ্য দিয়ে অস্থির চিন্তায় ডুবে থাকেন। গ্রামীণ জীবনের হারানো ঐতিহ্য পালাগান তিনি যদিও আর বাঁধতে পারেন না তবুও তিনি সেই গান শুনতে চান তাঁর বংশ পরম্পরার মধ্য দিয়ে :

আজকাল কারা গান বাঁধে, কারা গান গায়?/কারা আজো ভোরেরও আগে উঠে
বকুলতলায় যায় ছুটে/শিশিরে ভিজিয়ে পা শুধুই ফুলের পিপাসায়?
(আমার ভেতরের বাঘ, *আমার ভেতরের বাঘ*, পৃ. ২৮০)

অর্থাৎ, ঘুরে ফিরে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় গ্রামীণ লোকজ-সংস্কৃতি, নদী-নালা, চাঁদ, পলিমাটি বারবার আসে। তিনি নগরকেন্দ্রিক হলেও নগরের সাজ-সজ্জা ও জৌলুস তাঁকে কখনোই

টানতে পারেনি। 'আমার নিয়তি তুমি' কবিতায় দেখা যায় স্বদেশই তাঁর নিয়তি। বিদ্যমান সমাজবাস্তবতার গভীর পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন থেকে স্বদেশ ও সমকালের 'তিতাস নদীর পিপাসায় মাখা পলিমাটি'র কাছে তিনি ফিরে যেতে চান :

তিতাস নদীর পিপাসায় মাখা/পলিমাটি- প্রাণ আর কিছু আছে ঢাকা,
চাঁদের হরফে গুঞ্জরিত কথা বলে প্রেমবন,/শূন্যের দোল্‌নায় হরিয়াল দোল খায় কিছুক্ষণ।

(আমার নিয়তি তুমি, *অন্তিম শরের মতো*, পৃ. ১৩৬)

হাসান হাফিজুর রহমান সমসাময়িক কালের কবি হলেও কালের অবক্ষয় থেকে তিনি দূরে থেকেছেন। তিনি কবিতায় মূল উপজীব্য করেছেন অমূল্য সম্পদ বাংলার প্রকৃতি ও লোকজ জীবন প্রণালী। তিনি মাটির সন্তান তাই আজন্ম মাটি আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর মন ও মননে তাই শিল্পিত হয়ে ওঠে গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্য। হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন শিল্প সচেতন কবি। দেশাত্মবোধ, প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি সবকিছুকে গ্রামীণ ও লোকজ সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে দক্ষ শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এটিই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ও পাণ্ডিত্য একজন আধুনিক কবির।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি প্রতিভা আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২–২০০৯) বিভাগোত্তর কাল থেকে নিরলসভাবে কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম : *মানচিত্র* (১৯৬১), *ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ* (১৯৬২), *সূর্যজ্বালার সোপান* (১৯৬৫), *লেলিহান পাণ্ডুলিপি* (১৯৭৫), *নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ* (১৯৭৫), *আমি যখন আসবো* (১৯৮৪), *সাজঘর* (১৯৯০), *চোখ* (১৯৯৬) প্রভৃতি। তাঁর প্রথম কাব্যের নাম *মানচিত্র*। এ কাব্যে তিনি সমকালীন যুগচেতনা এবং সমাজবাস্তবতার রূঢ়তা, শোষণ-শাসন, বৈষম্য, আর বাস্তবের রূঢ় বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন। গ্রামজীবনের ওপর নির্ভর করে আবহমান বাংলার কৃষকের দুঃখ ও বঞ্চনার কথাও ভাষারূপ দিয়েছেন তিনি।

পঞ্চাশের দশকের কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ভুবনের উজ্জ্বল ও অনন্য নাম। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী আলাউদ্দিন আল আজাদ নানা পরিচয়ে বিশিষ্ট। কেবল কবি হিসেবেই নয়– শিক্ষক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক পরিচয়েও তিনি অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রোম্যান্টিক ধারার কবি হিসেবে বাংলাদেশের কবিতার বিকাশে আলাউদ্দিন আল আজাদ রেখে গেছেন প্রাতিস্বিক প্রতিভার স্বাক্ষর :

> নবলব্ধ জীবনদৃষ্টির আত্যন্তিকতায় সমকালীন জীবন ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি একদিকে যেমন অধীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে নিজের পরিপার্শ্ব ও জাতীয় জীবনপ্রেক্ষিতকে অবলোকন করেছিলেন বস্তুনিষ্ঠ সমগ্রতায়। এ-জন্যেই তাঁর কবিতায় যে-জীবনভাবনা বিন্যস্ত, তা কখনো কখনো অনাগত সম্ভাবনার ইঙ্গিতে তাৎপর্যপূর্ণ। (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ৩০)

সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আলাউদ্দিন আল আজাদের উল্লেখযোগ্য এবং বহুল জনপ্রিয় 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতায়। 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন বায়ান্নর ২৬ ফেব্রুয়ারি। কবিতাটি তখনকার জন্য আলোচিত কবিতা। তিনি মাতৃভাষার টানে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের সঙ্গে সমস্বরে বলে ওঠেন :

> স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো চার কোটি পরিবার
> খাড়া রয়েছি তো! যে ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে। (স্মৃতিস্তম্ভ, *মানচিত্র*, পৃ. ৩৬)

আত্মশক্তির একাগ্রতায় আলাউদ্দিন আল আজাদ বাঙালি সমাজকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত করেন। একুশের তরুণদের প্রাণাবেগে এক রাতের উজ্জ্বল সাহসিকতায় গড়ে তোলা শহীদ মিনার ভাঙার

প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিমুখর হয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। তাৎক্ষণিক লিখেছেন 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতা। 'দৃঢ়সন্নিবদ্ধ, গাঢ়বুনোনিতে সংহত শব্দমালায় গাঁথা কবিতাটি স্মৃতিস্তম্ভের মতো বলিষ্ঠ স্থাপত্যের প্রতীক।' (আহমদ রফিক, *আলাউদ্দিন আল আজাদ : কবিতাসমগ্র–১*, মুখবন্ধ) ভাষা-আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য জাগরণের প্রাণপ্রবাহের অঙ্গীকার ছিল তাঁর। তখন তরুণ যুবাদের হাতে শক্ত গাঁথুনিতে ছোট্ট আকারে গড়া হলেও এই স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে ওঠে বাঙালির সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী চেতনার মূর্ত প্রতীক। পঞ্চাশের দশকের কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তৎকালকে ঘিরে আহমদ রফিকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক :

> পঞ্চাশের কবিতায় প্লাটফর্ম যে আয়োজনে বিস্তৃত হয়েছিলো, সময়ের অবস্থানকে ধারণ করার মতো উর্বর আধার হয়ে উঠেছিল তখন বাংলা কবিতা। রাজনৈতিক অস্থিরতা, নাগরিক হতাশাবোধ, নৈরাশ্য আত্মিক শূন্যতা সর্বোপরি অনাবিল জীবনোপলব্ধির পেছনে স্থির নিঃসঙ্গতা তখনকার কবিদের চেতনার আস্তিনকে টেনে ধরেছিল। কেউ নাগরিক টানাপোড়েন, কেউ লোকজ বৈভবের মুগ্ধতা, কেউ বৈশ্বিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্কারের সুখস্বপ্নে তখন বিভোর। কবিতার পথযাত্রাকে কাঁপিয়ে তাদের সমসাময়িক তারুণ্যচর্চা তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ সময়ের সেই প্রবহমান অস্তিত্বকে একান্তভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন। (আহমদ রফিক সম্পাদিত, *আলাউদ্দিন আল আজাদ : কবিতাসমগ্র–১*, মুখবন্ধ)

নিরীক্ষাপ্রবণ কবি-ব্যক্তিত্ব আলাউদ্দিন আল আজাদ। বিষয়ে ও প্রকরণে নানাবিধ নিরীক্ষা করেছেন তিনি। জন্মভূমি-মাতৃভাষা ও দেশজ সংস্কৃতি তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় :

> পূর্ব-বাংলার পদবাচ্যে গোড়ায় জলসিঞ্চন, কবিতা-কাঠামোর নির্মিতিতে সত্যসন্ধরূপে প্রতিষ্ঠা, স্বীয় মননের সর্বোচ্চ বিশ্বাসে নিঃশঙ্ক-প্রযুক্তি– আলাউদ্দিন আল আজাদ। ওই চেতনার জারণে বিভাসিত তাঁর কবিতাকর্ম। (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ১৩৭)

সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, স্বদেশপ্রেম, ইতিহাস, বিষণ্নতা এর সবকিছুই আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় ধরা পড়ে। বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নন তিনি। তাই বাঙালির নিত্যদিনের তৈজসপত্র তিনি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন :

> তবে একাত্তর-পূর্ব কবিতা আর পরবর্তী কবিতার মধ্যে প্রকরণগত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। সেটি ঘটেছে তাঁর প্রস্তুতি ও পরিচর্যার কারণে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সরলরৈখিক, নিরীক্ষাপ্রবণ, আন্তর্জাতিক দীক্ষাদর্পিত তিনি। প্রথাগত ফর্মের পুনরুজ্জীবন তাতে আছে, আছে অভিনবত্ব ও নতুনত্ব। অনেকাংশে গল্পময়-স্বপ্নভুক ও নাটকীয়তা আচ্ছন্ন। তবে সার্বিকভাবে জীবনবাদী রূপই তাতে ধরা পড়ে। (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ১৩৮-১৩৯)

আলাউদ্দিন আল আজাদের রোমান্টিকতার পরিচয় পাওয়া যায় 'দ্বীপ', 'ছিপ ছিপে নদী', 'জলঙে', 'বিকেলের লাল মেঘ' প্রভৃতি কবিতায়। 'প্রেমের রোমান্টিকতা আধুনিক কবির চৈতন্যগুণে সমাজচেতনার সঙ্গে একাকার হয়ে যে দ্বৈতরূপের সমন্বয় ঘটাতে পারে বাংলা কবিতায় তেমন উদাহরণ বহুল দৃষ্ট। আলাউদ্দিন আল আজাদের উল্লিখিত প্রেমের কবিতাগুলোতেও ঐ একই চরিত্রের

প্রতিভাস ধরা পড়েছে।' (আহমদ রফিক, *আলাউদ্দিন আল আজাদ : কবিতাসমগ্র–১*, মুখবন্ধ) আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন সচেতন ও দায়িত্ববান কবি। কবিতার ভেতরে ডুব দিয়ে তিনি কবিতাকে সমসাময়িকভাবে উপস্থাপন করেছেন দক্ষ কারিগর হিসেবে :

> পঞ্চাশের কবিতায় তিনি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করতে গিয়ে চেতনার কোন স্তরকেই তিনি অতিক্রম করে চলে যেতে চান নি। তিনি মূলত চেয়েছেন সময়ের বাস্তবতাকে ধারণ করতে হলে আত্মার ভাবুলতার পুরোটাই ধারণ করতে হবে। আংশিক বা অসমাপ্য চেতনাকে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যেই অস্বীকার করে গেছেন। (আহমদ রফিক, *আলাউদ্দিন আল আজাদ : কবিতাসমগ্র–১*, মুখবন্ধ)

আলাউদ্দিন আল আজাদ ব্যক্তিক অনুভূতিকে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলতে বিশেষভাবে উন্মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সর্বজনীনভাবে মানুষের কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন :

> আমরা নতুন যুগের সূর্য-সম্মত জনতা
> উজ্জ্বল এক সমবায় দিনের সঙ্গমে
> এমন মহৎ কিছু এমন বিরাট কিছু এমন সুন্দর কিছু
> পঞ্চাতে রেখে যাবো (মিউজিয়ামের সিঁড়ি, *মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২৭)

আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রবহমান শিল্পকর্মের নন্দনতত্ত্বের বুনুনির কারিগর। তারই ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে পরের ষাটের দশক থেকে আশির দশক এবং তারও পর। তাঁর কবিতায় রয়েছে 'নগরের হতাশা, অবক্ষয়, শরীরী প্রেম, রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা, প্রকৃতির বিবর্তিত রূপ– কবির নিরন্তর নিরীক্ষায় যুক্ত।' (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ১৩৯) অর্থাৎ, তাঁর সম্পর্কে পঞ্চাশের দশকের কবিতাবিষয়ক পত্রিকা '*নতুন কবিতা*'র ভাষ্য– 'উগ্র আধুনিক না বলে অত্যাধুনিক প্রগতির সংজ্ঞায় যাঁরা নিজেকে আখ্যায়িত করতে চান আলাউদ্দিন আল আজাদ সেই শ্রেণীভুক্ত দ্বিধা নেই।' (উদ্ধৃত : শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ১৩৯) হাসান হাফিজুর রহমানের মতো আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায়ও জীবনজিজ্ঞাসার অঙ্গীকার বিদ্যমান। সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর গ্রামীণ-সংস্কৃতি ও নগরজীবনের নবতর ভাবনা কবিতায় প্রবলভাবে প্রাধান্য লাভ করে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতার ভেতর ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিষণ্নতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি থাকলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতা অধিক পরিলক্ষিত হয়। দেশাত্মবোধে জাগ্রত কবি সব সময় চেয়েছেন দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম হিসেবে দেখতে। যেখানে থাকবে না কোনো স্বৈরাচার, যেখানে জয়গান হবে মানবতার। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাই ব্যক্ত করেন :

> মানুষ যাকে আমি চিনি এবং যার পরিচয়েই দেশ, সুখে দুঃখে সংগ্রামে যে প্রাণপণে টিকে আছে চারদিকে অজস্র শিকড় চালিয়ে সেই আমার এবং তারই জন্য শিল্প। দেশের শিরায় শিরায় আমাকে ডুব দিতে হবে, হতে হবে মাঝি মাল্লা চাষী মজুরের একজন। (আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, পৃ. ৩২)

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা রচনার সময়কাল বিশেষ করে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মানচিত্র*-এর বেশিরভাগ কবিতা পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে লেখা। তাই চল্লিশের সময়ের প্রভাব কিছুটা ধরা পড়ে আর বায়ান্নর একুশের প্রভাব যে সর্বতোভাবে ছিল তা একজন দায়িত্ববান কবি-পুরুষের পরিচয় বহন করে। আমাদের আলোচ্য বিষয় সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তাঁর কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজজীবন কতটুকু উঠে এসেছে, তা নির্ণয় করা। ঐতিহ্যনির্ভর কবির প্রথম শর্তই হলো মা, মাটি ও মানুষের সংস্কৃতিকে বহন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে কমবেশি আলাউদ্দিন আল আজাদও পিছিয়ে নেই। খুব বেশি পরিমাণে না হলেও তাঁর রচনায় আবহমান বাংলার গ্রাম, হাজার বছর ধরে গ্রামে বসবাসরত সরল সহজ মানুষের সংস্কৃতি ও লোকাচার সুস্পষ্ট। গ্রামীণ-সংস্কৃতিবিষয়ক ভাবনায় তাঁর শৈশব-স্মৃতি বড়ই চমৎকার। আলাউদ্দিন আল আজাদ নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেন :

> সে হিসেবে আমের বোলের পুঞ্জ পুঞ্জ থোকা থোকা ঘন সবুজ পাতার ঝোপরা যখন উজ্জ্বল রৌদ্রে ঈষৎ কাঁপছে, দুলছে– সেদিকে আমার শিশুচোখের মুগ্ধদৃষ্টির একটা অর্থ ছিল। ডালে আবডালে দোয়েল, শালিক। ছোট পাখির কিচিরমিচির। কা-কা করে কাক উড়ে যায় জামগাছে এবং আরও কত দৃশ্যমালা। মেঘ বৃষ্টি ঝড়। জোনাকির বিন্দু বিন্দু আলো, হাস্নাহেনার গন্ধ। আমার শৈশব আজকের আমারই একটি জীবন্ত অধ্যায়। (আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, পৃ. ৩৫১)

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় প্রাধান্য পায় জনগণ। জীবনের, অফুরন্ত প্রেরণার উৎস জনগণ। তাঁর মতে, বারবার 'সেখানে যেতে হবে, অবগাহন করতে হবে, ডুব দিতে হবে। কারণ, সেখানেই উর্বরতা; মণিমুক্তা রত্নখনি।' (আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, পৃ. ৭৮) তিনি প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে চান। মিছিলে চৈত্রের ঝড়ে বাস্তুভিটা হারানো প্রেয়সী যেন সংগ্রামের প্রতীক। হারানোর বেদনায় কাতর না হয়ে প্রেয়সী যাবে মিছিলে :

> আমার প্রেয়সী নয়া সড়কের ওপারে জাগে/হাতে শাঁখা নেই, পোড়া ধানশিস, আকুল সিঁথি
> চৈত্রের ঝড়ে হারায়েছি যেই বাস্তুভিটা/তারি খড়কুটো খুঁজছি দু'পারে দিকশূন্য।
>
> (জনান্তিক, *মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ২৯)

'প্রান্তিক' কবিতায় গ্রামবাংলায় চিরায়ত রূপ ধরা পড়ে। গ্রামে নকশি-কাঁথার আমন্ত্রণে কবি বসন্তে ফুলশয্যা রচনা করেন। এখানে ডালিমের রঙে অধর, হরিণ-চোখ, অরণ্যের চঞ্চলতা, রামধনুর রঙিন বাহার, ফসলে ভরা মাঠ কবিকে মুগ্ধ করে :

> ঘন মেঘ-কেশে রামধনু চেলী সোনার মতো/ক্ষণ-বিদ্যুৎ প্রভায় দাঁতের তীক্ষ্ম হাসি
> ফসলের খেত বিছালো বাসর শয়নখানি/হলুদে-সবুজে নকশি-কাঁথার আমন্ত্রণে।
> খর-সূর্যের শিকারী কিষাণ, তপ্ত মাঠে (প্রান্তিক, *মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ৫৫)

রাখাল গাভী চরায়, কদম্ব-তলে বাঁশি বাজায়, সারারাত বালিহাঁস ডাকাডাকি করে ধানছোপা নদীর জলে, পাখির বাসার ডিম পাড়া, চাতক-চাতকির বুকের উষ্ণতা ও সান্ত্বনা ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের

চলমান বিষয়টি আদরণীয় হয়ে রয়েছে তাঁর 'আমার মৃত্যুর পর' কবিতায়। আশাবাদী কবির ভাবনায়– বসন্ত অনন্ত যৌবনা, চাঁদ হাসে উজ্জ্বলতায়, পাখিরা সারাক্ষণ গান গায়। ধূসর শীতের মাঠ আচ্ছাদিত হয় প্রগাঢ় সবুজে :

বসন্ত মরেনি আজো, চাঁদ হাসে, গান গায় পাখি/ধূসর শীতের মাঠ ছেয়ে যায় প্রগাঢ় সবুজে
রাখাল চরায় গাভী, বাঁশের বাঁশীটি চোখ বুঁজে/বাজায় কদম্ব-তলে, হাওয়া বয় বিবাগী বৈশাখী।

(আমার মৃত্যুর পর, *মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ৫৬)

'কৃষকের গান' কবিতাটির মধ্যে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের রূপচিত্র নির্মিত হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই বাংলার মাটি কৃষকের। কৃষকের কর্ষিত উর্বর ভূমিতে শকুনিদের চোখ পড়ে বারবার। যার কারণে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহই বেশি সংগঠিত হয়। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে অনাহারে অর্ধাহারে কৃষক-কিষাণী জমি বুকে আগলে রাখে। বর্গীর দল সংগ্রামী কৃষকের সাহসের কাছে পরাজয় বরণ করে। 'ঘুমপাড়ানি' প্রচলিত লোকছড়ার আদলে আলাউদ্দিন আল আজাদ ফসল উদ্ধারের ঘটনার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ও লোকজ সংস্কৃতির চমৎকার চিত্রকল্প রচনায় সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন :

ধান ফুরাক না, পান শেষ হোক/রোদে বৃষ্টিতে
রশুন বুনেছি মাঠে/তবুও খাজনা দেবোনা দেবোনা
অনেক দুঃখে জেনেছি কেননা।/জমির মালিক আমরাই কোটিজনা।

(কৃষকের গান, *মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ৫৭)

আশাবাদী সংগ্রামী কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ। দেশ মাটি মা মানুষের হাসি তাঁর নিত্য ছিল কাম্য। 'শান্তিগাথা' তাঁর গ্রামবাংলাকেন্দ্রিক অত্যুজ্জ্বল কবিতা। বিশাল বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে রচিত এই কবিতায় বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পুনর্নির্মিত হয়েছে। তবে প্রতিদিনের ব্যবহার্য প্রকৃতির অনায়াস প্রয়োগ করে তিনি সফল। দুর্বাদলের শিশির, রৌদ্রমেদুর শিরীষ, চৈতি হাওয়ায় পত্রে পুষ্পে ফসলে শিশুর হাসি কবির কাঙ্ক্ষিত ফল :

স্বপ্ন রচেছি যুগযুগান্তে কত না/মুগ্ধ হাসির দুর্বাদলের শিশিরে
বাসনার গান রৌদ্রমেদুর শিরীষে/আশার পলাশ চৈতি হাওয়ার দিশারী;

(শান্তিগাথা, *মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ৩১)

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় জীবনের প্রাপ্য অধিকারের সঙ্গে না পাওয়ার বিরোধ, প্রার্থিত সুন্দরের সঙ্গে বাস্তবের টানাপোড়েন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিফলন ঘটেছে। কর্মময় শহুরে জীবনে বসেও তাঁর চোখে বারবার গ্রামবাংলার অপরূপ রূপ ভেসে ওঠে। নদীমাতৃক বাংলার গ্রামে জন্মেছেন কবি। গ্রামকেন্দ্রিক উপমা রূপকে ভর করে তিনি অনেক সাহসী সংগ্রামী কথাচিত্র বয়ন করেছেন। আঁকাবাঁকা নদী, মাটির কলস, ধূসর খড়, ঝড়ে কুড়ানো পাখির পালক, কদম গাছের শাখা, বাঁশির সুর

সব কিছু যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। প্রতীক্ষারত কবি যেন চাতকের মতো চেয়ে থাকেন শুভদিনের আশায়। কবির প্রত্যাশা কেবল শ্যামলীর প্রতি– 'শ্যামল কর পৃথিবীকে' :

বাঁশরীর সুর নেই, জপে মালা কদম্বের শাখা
অগাধ আকাশতলে যাতনায় চাতকেরা ডাকে,
বালুকায় ঘাড় গুঁজে দূর প্রান্তে নদীর মেখলা
ধূলায় মিলিয়ে গেল সবুজের অবুঝ কাকলি। (শ্যামলীর প্রতি, *মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ৪২)

বলা যায়, মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চনা, হতাশা এবং বস্তিবাসি মানুষের কঠিন কঠোর জীবনালেখ্যই *মানচিত্র* কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় ঠাঁই পায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদের দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের নাম *ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ* (১৯৬২)। কবি নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে কারাবাসকালে এই কাব্যের কবিতাগুলো রচনা করেন। সমকালীন সমাজজীবনের নানা অভিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্লান্তি-হতাশা ছাড়াও একধরনের আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে উপর্যুক্ত কবিতাগ্রন্থে। তাছাড়া প্রেম ও প্রকৃতিচেতনার পাশাপাশি গ্রামীণ ও লোকজীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে এখানে। গ্রামীণ ও লোকজীবনের ঐতিহ্যের কারিগর তাঁতিসম্প্রদায় কটিবাস মেঘমালা শাড়ি বোনে। পসারিণী লাল নীল বিভিন্ন রঙের চুড়ির পসরা সাজায়। সাঁওতালিমেয়ের হাসির জন্য লোকজীবনের সাজগোজের সব কিছু কবি এনে দিতে পারেন, যার চিত্রকল্প বাস্তব সুন্দর। শুধু তাই নয় তার প্রেয়সী যদি এই বন্ধুত্বকে অবিশ্বাস করে সে নীলকণ্ঠ হতে প্রস্তুত মুখে তুলে নিয়ে শঙ্খবিষ। শাশ্বত প্রেমের অত্যন্ত আবেগীয় নাট্যরূপ নির্মাণ করেছেন কবি :

তাঁতীরা এখনো বোনে/কটিবাস মেঘমালা শাড়ি
পসারিণী আনে/লাল নীল চুড়ি
তোমার হাসিটি পাব যদি বল,/সব কিনে আনি।

(সাঁওতালী, *ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ৯৬)

আলাউদ্দিন আল আজাদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম *সূর্যজ্বালার সোপান* (১৯৬৫)। এ কাব্যে স্বদেশের অস্থির পটভূমিতে সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের নানারূপ চিত্রিত হয়েছে। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা এ কাব্যের উপজীব্য। এছাড়া ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি ও মেকি ভণ্ডামি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। ইতিহাস, লোকজজীবন ও ঐতিহ্যচেতনার রূপায়ণ ঘটেছে কয়েকটি কবিতায়। স্বদেশের প্রকৃতি, আরণ্যক শোভা বিভিন্ন কবিতায় নানারূপে এসেছে। অর্থাৎ, তাঁর সমাজচেতনা ও বিপ্লবধর্মী কবিতায় লক্ষ করা যায় ক্রমঅগ্রসরমান ধারাটি মানবতাবাদী চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কবির অভিমানী হৃদয় চেনাজানা ভুবন থেকে দূরে সরে যাবেন বহু দূরে, সেখানে তিনি যাবেন গ্রামে গ্রামে হেঁটে সওদা বিক্রির

অজুহাতে, তিনি যাবেন তাঁর স্বপ্নের খোঁজে। তাঁর 'কান্তার পেরিয়ে' কবিতার ভেতরে এই খোঁজাখুঁজির ভেতর দিয়েও তিনি গ্রামীণ আবহ ফুটিয়ে তুলেছেন বেদনার উপমায় :

টিয়া কাকাতুয়া : সতেজ পাঁপড়ি পুষ্পরাজি
দুঃখের আগুনে পাকা শস্য দুর্লভ ক্ষণের যত অশ্রু মুক্তারাশি, অনেক যতন
করে থরে থরে/নিয়েছি রে। (কান্তার পেরিয়ে, *সূর্যজ্বালার সোপান*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ১৪৪)

আলাউদ্দিন আল আজাদ স্বদেশ প্রেমের মধ্য দিয়ে পরিশীলিতভাবে গ্রামীণ ঐতিহ্যের ছবি এঁকেছেন। স্বাধীনতাকে তিনি গ্রামবাংলার উপাদানে অলংকৃত করেছেন। স্বাধীনতাকে কখনো তিনি দেখেছেন কুমড়োলতায় মনের সুখে টুনটুনি পাখির লাফানোর মধ্যে, জামডালে হলদে পাখির ভেংচি কাটা, সোনা ধান, আঙিনা ভরা ফসল, মাঠজোড়া শালিকের ঝাঁক, সলিলে ভাসানো কাঁখের কলস বা ভিজে নীলশাড়ির রঙিন বাহারের মধ্যে। স্বাধীনতাকে কবি দেখেছেন আবহমান বাংলার নীড়ে :

যেন পারো কাঁখের কলস/ভাসাতে সলিলে নিরিবিলি
ভিজুক না ঊরু, নীলশাড়ি। (স্বাধীনতা, *লেলিহান পাণ্ডুলিপি*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ১৬৬)

আলাউদ্দিন আল আজাদ কবিতায় রোমান্টিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কঠোর বিপ্লবাত্মক বক্তব্যের উপস্থাপনও ঘটেছে গ্রামবাংলার লোকজ-সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে। কবিতার শরীরের গভীর তল বিশ্লেষণে ধরা পড়ে তৎকালীন রাজনৈতিক অনাচার। কবি সেই কূট-রাজনীতিকে তুলে ধরেছেন প্রকৃতির লতায়-পাতায়। নারীপ্রেমে মুগ্ধ কবি নারীর রূপগুণের ও সাজসজ্জার বর্ণনার ভেতরও লোকজভাবনার পরিচয় তুলে ধরেছেন :

গাছের তলে তখন শাদা উল বলের মতন/মুরগির ছানাগুলো কিচিকিচি শব্দে কিছুক্ষণ
মাতে এবং যখন তুমি গোল আর্শিতে নির্ভুল/ভুঁরুতে কাজল দাও সীথি কাটো নাকফুল
টিপ দিয়ে পরে, মিটিমিটি হাসো অকারণ। (প্রতিকৃতি, *নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ২৫২)

মাটির টান কবিকে সবসময় বিচলিত করত। তিনি বারবার ফিরে যেতে চান মা, মাটির কাছে। দুখিনী মায়ের সেবা তাঁর নাগরিক জীবনের চেয়ে অনেক সুখের। দেশমাতৃকা ও গর্ভধারিণী এক হয়ে মিশে যায় তাঁর অস্তিত্বে– যা কখনো ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের উপমায়, কখনো মহামায়ার প্রতিমার বাঁশখড় খসে-পড়া মাটির রূপকে, কখনো জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবির ভাবনায় :

মা আমার জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি
সানকিতে মরা হাত থুয়ে আসমানের পানে তাকিয়ে
বিলাপ করতে করতে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে–
প্রবল তুফানের পরে ভাঙাচোরা বিশাল প্রাচীন বটগাছের পাশে
(বাড়ি ফিরে যাব, *আমি যখন আসবো*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ২৬৫)

রোমান্টিক কবি হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদ অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রেম, প্রকৃতি, দেশ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে ব্যবহার্য করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন গ্রামীণ ও লোকজীবনের ছোঁয়ায়। প্রিয়া হারানোর বেদনায় ভেসে ওঠে কিছু ছবি। নারীর বেনারসীর সাজ-সজ্জা, হাতভরা সোনার কাঁকন, শুভদৃষ্টির আয়না, অলকার ফুল সবই কবির কিংবদন্তীর ফসল :

> তেমনই তোমার শরীর, যদিও কন্যা সাজন
> লাল নীল হলুদ নকশা বেনারসী অপরূপ
> করেছিলো কোনো অলকার ফুল অলঙ্কার ঘন–
> হাতভরা সোনার চুড়িতে অশ্রু ঝরে টুপটুপ্।
>
> (কিংবদন্তীর, *এই নাও আমার প্রেম লালগোলাপ*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ১০১)

গ্রামবাংলার শিশু-কিশোরদের শৈশব-কৈশোরে রাক্ষস-খোক্ষসের ভয়, রূপকথার গল্প অপরিহার্য উপাদান। উপকথার আদলে মায়ের স্মৃতির তর্পণে আলাউদ্দিন আল আজাদ বুনেছেন 'আমার মাকে যখন' কবিতায় :

> কা'কে ভয় করি আমি? এই দ্যাখ আমার বাজুতে বাঁধা জননীর
> স্নেহের তাবিজ, তার চুম্বনের দাগ সারা শরীরেই ধরে আছি :
>
> (আমার মা'কে যখন, *আমি যখন আসবো*, কবিতাসমগ্র ১, পৃ. ২৭৯)

আলাউদ্দিন আল আজাদের লোকবিশ্বাস দৃঢ় রক্তে প্রবাহিত। তিনি আত্মবিশ্বাসে বলেন- 'কাকে ভয় করি আমি? এই দ্যাখ আমার বাজুতে বাঁধা জননীর স্নেহের তাবিজ'। জননীর স্নেহের রক্ষাকবজ যার সাথে থাকে, তিনি নির্ভীক :

> লোকগল্পে কিংবা রূপকথায় নিদ্রিত রাজকুমারীর মাথা আর পায়ের কাছে সোনার কাঠি রূপার কাঠি রেখে ঘুম পাড়িয়ে রাখা কিংবা কৌটার মধ্যে রাখা রাক্ষসের প্রাণ-ভামরার পাখা ছিঁড়ে ফেলে তাকে হত্যা করা ইত্যাদি রূপকথা আমাদের জীবনসংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আলাউদ্দিন আল আজাদ সেই লোকজ সংস্কৃতির আন্তর্নিহিত প্রাণবীজ কবিতায় ব্যবহার করেছেন। (মাহবুব হাসান, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান*, পৃ. ১৪৮)

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় সমসাময়িক প্রতিটি বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রধানত দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষাপটে কবিতা রচনা করেছেন তিনি। পঞ্চাশের প্রথম দিক তাঁর কবিতা রচনার সময়কাল। কবিতায় মূলত বাংলার বাঙালিকে ঘিরেই বসবাস। মানবীয় মূল্যবোধে শানিত কবি তাঁর ভাবনায় সদা সঞ্চরমান মানুষ। তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং নগর সভ্যতার বিষয়ে বলতে পারেন :

> আমাদের প্রায় সব তরুণ কবিই শিক্ষিত এবং ছাত্র; যে নাগরিক সমাজের মধ্যে ওরা বাস করছেন, তার প্রতি তাদের অনাস্থা এবং সেইজন্যই ব্যঙ্গ বেদনা বিষাদ। এই আশাভঙ্গের অনুভূতি কি সাময়িক বিকার অথবা

জীবনেরই মৌলিক ট্র্যাজেডির স্বীকৃতি? একটা গণ্ডির ভেতরে থেকে ওঁরা নকশা আঁকছেন এবং তা কখনো কখনো বিচিত্র এবং সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রচণ্ডতা ও নিবিড়তা নতুন কবিতার জন্ম দেবে, তার উৎস গণ-চৈতন্য, যে রূপময় হয়ে ওঠে প্রতীকে রূপকে নানাবিধ বিমূর্ততায়। সেখানেই আছে হাহাকার; সেখানেই আছে মরমীয়তা, অপার বজ্র বিদ্যুৎ ও অন্ধকার। আছে প্রেম। ঘৃণা, নানা ক্ষুধা। মানবীয় আদিমতার মধ্য দিয়েই আসছে যে নতুন ঋতু তাকে আমি চোখ ভরে দেখতে চাই। (আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, পৃ. ৭৯)

পঞ্চাশের দশকের কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ মানবতাবাদী গণ-চৈতন্য শাশ্বত লোকজজীবন যেমন স্পর্শ করেছেন, তেমনি নাগরিক জীবনচেতনাও তাঁর কবিতার অন্যতম রূপ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। তবু তাঁর কবিতায় অল্পবিস্তর হলেও গ্রামীণ ও লোকজীবন যেভাবে উঠে এসেছে তা প্রশংসার দাবিদার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৈয়দ শামসুল হক

সাতচল্লিশ পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তরের এ পর্যায়ে আলোচিত দিক পঞ্চাশের দশক। অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতায় যে গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ কবিদের কবিতায় রয়েছে তা দেখানোর আগে উল্লেখযোগ্য কবিদের মানসপ্রবণতা আলোচনার দাবি রাখে। এ পর্যায়ে আলোচিত কবিদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৮) এর কবিমানস নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারি। তাঁর কবি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রোমান্টিকতা ধরা পড়ে বেশি। রোমান্টিকতাকেই তাঁর কবিতার প্রেরণাকেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করা যায়। তাঁর কবিতায় নারী, নিসর্গ, অবদমনজনিত প্রেম ও অপ্রাপ্তিজনিত বিকলন ক্রিয়াশীল :

> সৈয়দ হকের কবিতায় দেখা যাবে আরো ব্যাপ্তি; অর্ন্তগূঢ় ভাষাশৈলী এবং একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। তবে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সৈয়দ হকের কবিতার ভাষা ও বক্তব্য দুই-ই অভিনব, পরস্পরের সঙ্গে জটিল বুননে সমীকৃত। (মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২৪০)

সৈয়দ শামসুল হকের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : *বুনোবৃষ্টির গান* (১৯৫৯), *একদা এক রাজ্যে* (১৯৬১), *বিরতিহীন উৎসব* (১৯৬৯), *বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা* (১৯৭০), *প্রতিধ্বনিগণ* (১৯৭৩), *পরাণের গহীন ভিতর* (১৯৮০) প্রভৃতি।

সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে প্রেম, নারী ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব। প্রেমের ক্ষেত্রে না পাওয়ার বেদনায় মানসিক টানাপোড়েন তাঁর মনস্তত্ত্বের ভেতর নানা ক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাঁর প্রেমচেতনা রিরংসাজাত হয়ে ওঠে। তাঁকে ফ্রয়েডীয় চেতনা বা লিবিডো প্রভাবিত করে :

> সব্যসাচী হলেও প্রধানত কবি। বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূলে বিশ্বস্ত থেকে কাব্যচর্চা করেছেন। স্মৃতি-নস্টালজিয়া, প্রেম-নৈঃশব্দ্য, চেতন-অবচেতন ক্রিয়ায় নিরীক্ষিত তিনি। (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ৮৩)

সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় প্রেমের আকুতি চোখে পড়ে। আবার অপ্রাপ্তিজনিত প্রেমের কারণে মনস্তাত্ত্বিক যে সমস্যা তার পরিচয় মেলে। তাঁর কবিতায় বাইরের জগৎ অর্থাৎ বাস্তব জগৎ সম্পর্কেও যোগাযোগ ছিল তবে অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রে অন্তর্মুখীতারই পরিচয় মেলে। তিনি বেশিরভাগ সময়ই আত্মনিমগ্ন থেকে মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্বে পড়েছেন তবে সেখানেও খুব বেশি তিনি বিচলিত নয় কেমন যেন নির্লিপ্ততাই ধরা পড়ে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর ভাষাশৈলী ও স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা রীতির কারণে সেই সঙ্গে ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন তত্ত্বে পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে অন্যতম।

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন মূলত কবি। পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে নিরীক্ষামনস্ক তিনি। লিরিক কবিতা থেকে কাব্যনাট্য, অজস্র গদ্য কবিতা থেকে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন তিনি। পঞ্চাশের দশকে শুরু করলেও ষাটের দশকের গোড়া থেকেই মূলত স্বকীয় ধ্যান-ধারণায় সৃজনশীল সাহিত্যের গ্রন্থ-রচয়িতা হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। সমকালে বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী প্রতিভার প্রতীক সৈয়দ শামসুল হক। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূলে আস্থা রেখেই তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টিশীল যন্ত্রণা তাঁকে অস্থির করেছে, কোনো কাব্যাদর্শে তিনি স্থিত হননি :

> সৈয়দ শামসুল হকের মধ্যে আধুনিক জীবনের স্বরূপ অন্যতর অবয়ব নিয়ে দেখা দিলো। বহির্জগতের সংঘর্ষ, রক্তপাত ও জাতীয় জীবনপরিক্রমা তাঁর কবিতায় মুখ্য উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি পেলো না; ব্যক্তির আত্মরতি, রিরংসা, মনোবিকলন প্রভৃতিকে ফ্রয়েডীয় চেতনার অঙ্গীকারের মাধ্যমে কবিতার উপজীব্য করলেন তিনি। আধুনিক নগরজীবন-অন্তর্গত ব্যক্তিহৃদয়ের সমস্যা, সংকট, প্রেম, বিকৃতি ও আত্মহননকে কাব্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হকে বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ২৪)

পঞ্চাশের দশকের প্রতিভাবান কবি সৈয়দ শামসুল হক অর্ধ-শতাব্দীর নিরলস সাধনায় আধুনিক বাংলা কবিতায় সঞ্চয় করেছেন বাংলার নদীবিধৌত পলি আর পুনর্নির্মাণ করেন নিজস্ব ভূগোলের মানচিত্র। শৈশব কেটেছে তাঁর ধূলি-ধূসরিত পল্লির পথে হলেও সারাজীবন ব্যয় করেন শহরে। নগরসন্ততি হলেও তিনি কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপচিত্র পরম মমতায় মূর্ত করে তুলেছেন :

> বিচিত্র বিষয় এবং একই বিষয়ের বিচিত্র তল-অবলম্বী তাঁর কবিতা নিরীক্ষাপ্রবণ আঙ্গিক-বুননে ঋদ্ধ। কাব্যসৃষ্টির সূচনায় বস্তুপৃথিবীর সংঘর্ষ-সংঘাত ও জাতীয় জীবনপরিক্রমার পরিবর্তে তাঁর কবিতায় প্রাধান্য লাভ করে ব্যক্তির মনোজাগতিক সংকটের নানা প্রসঙ্গ। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৯৫)

সৈয়দ শামসুল হক তীব্রভাবে জীবনবাদী কবি। প্রতি মুহূর্তের সতর্ক সযত্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি কবিতাকর্মী হয়েছেন। তাঁর অন্তর্সত্তার চেতনার আলোড়নই তাঁকে ঐতিহ্যের দিকে ধাবিত করেছে। তিনি নগর জীবনের মধ্যে বসবাস করেও গ্রামকে একদণ্ডও ভুলে থাকতে পারেন নি। তাঁর স্মৃতিতে জেগে ওঠে বাঁশবন, জারুল গাছ, ধুলো উড়ানো রাস্তা। গ্রামীণ পথঘাটের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দুঃখ কষ্টকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার তাঁর 'আসন্ন অরণ্যদেশ' কবিতায় দেখা যায় নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক অল্প চাহিদার মানুষ অর্থাৎ জীবনের চাকচিক্য যেন কবির পছন্দ নয়। তাই ঝামেলাহীন শান্তিময় জীবন তাঁর কাম্য, সেখানে পানাহারের জন্য সামান্য রুটি ও পানি আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন থাকে নিশ্চিন্ত। অরণ্যের শান্ত-নিস্তরঙ্গ আবহকে কবি আত্মায় ধারণ করতে চান। তিনি নিজের অনুভব আর অনুভূতি মিলিয়ে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সাযুজ্য স্থাপন করেন :

> আমি এক নিতান্তই গেঁয়ো লোক, সহজেই ভীত।

পরম করুণা মানি সামান্য রুটি ও জল,
আর স্ত্রীলোকের ত্রিসীমার মাড়াইনি ছায়া,
ঘরে আছে প্রিয়তমা, তাকে প্রেম-সন্তানেরা,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। (আসন্ন অরণ্যদেশ, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ৪১)

স্বদেশ ভাবনার মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার ভেতর উঠে আসে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়, তাঁর পরিচিত পদ্মানদী। তিনি এশিয়া, আফ্রিকা বহু জায়গায় ঘুরে অবশেষে এই বাংলার ঘরেই দেখেছেন খাঁটি সোনা। কবি স্বদেশপ্রীতির মাধ্যমে নিজেকে বাংলার লোক হিসেবে তুলে ধরেছেন গ্রামবাংলার বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে। জাতশিল্পী তার কাব্যভাবনায় শিল্পিত স্বভাবের পরিচয় দেন। কবি নিজেকে মা, মাটি দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঐতিহ্য লালন করেছেন। এই গ্রামবাংলার দুঃখ ক্লিষ্ট জীবনই কবির সাধনার ধন। কবির আত্মা যেন পলিমাটির এক স্তূপ :

আমিও বাংলার লোক, স্বভাবত বাংলার মতই
সমতল, সংগীতের শস্যভারে নত দূরগামী
পদ্মার মতই ধীর, পলিমাটি আত্মায় সঞ্চিত। (আমিও বাংলার লোক, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ১৪৭)

সৈয়দ শামসুল হকের মানস গঠিত হয়েছে পাললিকভাবেই। গ্রামবাংলার সমৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি আবার শহুরে পরিণত হয়েছেন। তিনি বর্ষার কোমল কাদা জলে একাকার চৈত্রের খড় রোদে যেন পোড়ামাটির মতই খাঁটি। কবির স্মৃতিতে মুখরিত গ্রামীণ ঐতিহ্য, অনুভূতির অতলে ডুবে অন্বেষণ করেন ফেলে আসা অতীত। এখানে গ্রামীণ এক বধূর স্মৃতি বিজড়িত কাহিনি কবে তার ভালোবাসার ধন বিগত হয়েছে কিন্তু স্মৃতি অমলিন। প্রাণনাথ বধূকে এনে দিত সবুজ রঙের শাড়ি। অর্থাৎ, গ্রামবাংলার এক অতি পরিচিত বিষয়ও কবি সৈয়দ শামসুল হকের চোখ এড়াতে পারেনি। পিতা মারা গেলে পারিবারিক ঐতিহ্যস্বরূপ পুত্র লাঙল জোয়াল, মোষ ইত্যাদির মালিক ও সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নেয়। বাংলার মা ছেলের মেঠো পথের দিকে চেয়ে থাকে এই চিত্রকল্পটি কবি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন গ্রামীণ বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে :

তার পথ চেয়ে আঙিনায় চোখ, কলস রেখেছি পূর্ণ
এলো সে স্বচ্ছ সন্ধ্যায় ফিরে, কোঁচড়ে কি যেন তার!
(মুখোশে ঢাকা জননীর গাথা, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ১৭৯)

আবহমান বাংলার বৈশিষ্ট্য অনুসারে সৈয়দ শামসুল হক কবিতায় নিয়ে এসেছেন লাল চালের ভাত, মিঠে রাঙা আলু। 'মুখোশে ঢাকা জননীর গাথা' এই কবিতায় কবি গ্রামবাংলার সহজ-সরল নারী তার স্বামীহারা বেদনা লুকিয়ে রাখেন ছেলের সামনে থেকে তারই চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন চরণে চরণে। 'আষাঢ়ের প্রথম দিনে' কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন ঘাসের গর্ত থেকে পোকামাকড় বের হয়ে আসছে

যা বাস্তব অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে দেখা। সৈয়দ শামসুল হক বাংলার মানুষের তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে কাল গহ্বর থেকে আশার আলোর দিকে ধাবিত করেছেন মাঝি, জাল, লাফানো নদীর মাছ, নৌকা ইত্যাদি নানা গ্রামীণ আবহের :

জেগে উঠছে আশার জ্বলন্ত রোদ,/বিহ্বল মাঝির জালে
একটি রূপালী মাছ/ধরা পড়ে আচমকা লাফাচ্ছে। (বলতে পারা যায়, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ৮৯)

সুদিনের আশায় অধীর আগ্রহে কবি দূরে কোথাও যেন উৎসবের ডাক শুনতে পান। মনে হয় যেন ঢাকের আওয়াজ- সংগ্রামী মানুষ প্রতিনিয়ত যেন ভালো কিছুর আশায় স্বপ্ন দেখে যদিও স্বপ্ন স্তম্ভিত নৌকার মতো ছড়াতে থাকে এবং ক্ষত-বিক্ষত হয়। লোকঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে নৌকাকেই চিত্রিত করেন তিনি। কবির নৌকা তৈরির প্রত্যাশার মধ্যে প্রতীকী তাৎপর্যে লোকসংস্কৃতিকে ফিরে পাওয়ার হৃদয়ী সংরাগ স্পষ্ট। কবি তাঁর কবিত্বশক্তির বলেই এই অবস্থার বর্ণনা করেছেন :

ভাঙনের জ্যোছ্নায় নেমে এলো অপরাহ্ণ এবং স্বপ্নগুলো
স্তম্ভিত নৌকোর মতো আছড়াতে লাগল তার নীচে। (শূন্য প্রেক্ষাগৃহ, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ৯১)

সৈয়দ শামসুল হক দেশপ্রেমে আত্মহারা। মা, মাটি, মানুষ এক ও একাকার হয়ে মিশে থাকে তাঁর অধিকাংশ কবিতায়। মা, মাটি স্বদেশ ঘুরে ফিরে গ্রামীণ ও লোকজীবনের অনুষঙ্গে তাঁর কবিতায় ধরা দেয়। তাঁর কবিতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় গ্রামের মেঘ-রৌদ্র খেলার মেঠো পথ, যুঁই ফুলের ঘ্রাণ, মেলার বাজিকর, জননীর রূপের হাঁসুলি এবং গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সবচেয়ে আবেগীয় বস্তু পূর্ণিমার চাঁদ। যা গ্রামীণ ও লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। *বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালার* কেন্দ্রবিন্দুতে আছে শেকড়-সন্ধানের নিরলস প্রয়াস। প্রাচীন সাহিত্যের সরণি বেয়ে মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে। চাঁদ সওদাগরের পৌরুষদীপ্ত চরিত্রে মানব জীবনরসের পরিস্ফুটন ঘটেছে। দৈবশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরন্তন পৌরুষের প্রতীকরূপে চাঁদ সওদাগর দীপশিখার মতো উদ্ভাসিত হয়েছে। বেহুলা ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক। তার মধ্যে কুলবধূসুলভ কোমলতা ও মনোবল বিদ্যমান। স্বামীর মৃতদেহসহ কলার ভেলায় পাথারে ভেসে বেহুলার গাঙ্গুরের পথে রহস্যালোকে যাত্রা বাঙালি জাতির নির্ভরশীল লোকজ প্রতীকে পরিণত হয়। সৈয়দ শামসুল হক চন্দ্রাবতীকে বোন হিসেবে সম্বোধন করে শিল্পসংসারের অঙ্গীভূত করে নেন। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবি মনসার হিংস্র কুটিলতার কোপ পড়েছে সওদাগরের পুত্র আর পুত্রবধূর ওপর। লোহার বাসরঘরে কালরাত অতিক্রমের সুপরিচিত লোককাহিনির সারাৎসার বয়ন করেছেন কবি :

আমারও সংসার হবে–/শিল্পের সংসার। চন্দ্রবতী হবে বোন,
কালিঘাটে আত্মীয় আমার। আমি জানি/মনসার ক্রোধ মানে মানুষের জয়,
চাঁদ রাজা হার মানে। লৌহ বাসরের/ কালছিদ্রে চোখ রেখে আমি কালরাতে

পুর্ণিমার ধবল দেহে আজো জেগে থাকি। (*বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা*, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ১২৫)

লোকবাংলার চেতনায় পরিবাহী হয়ে চলেছে যে মনসার কাহিনি, সৈয়দ শামসুল হক তাকেই ব্যবহার করেছেন আলোচ্য কবিতায়। *বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালায়* কবি বাংলার দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছেন। 'যন্ত্রণার গরলে নীলকণ্ঠ কবি দেখেছেন পুরনো মূল্যবোধের বিনষ্টি, নতুন মধ্যবিত্তের উচ্চাশা, কলাকৈবাল্যবাদের পতন।' (আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী*, পৃ. ৪১১) এই কাব্যে কবির সময়, পারিপার্শ্বিকতা, বেড়ে ওঠা ও উপলব্ধির ব্যাপ্তির রূপায়ণ ঘটেছে আত্মকথনের মধ্য দিয়ে। সমালোচকের ভাষায় :

> *বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা* কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো চরণে জীবনের যে স্বরূপসত্য উন্মোচিত, তা নববিন্যস্ত নগরজীবন-অন্তর্গত কতিপয় উচ্চবিত্ত ও আত্মরিরংসাপ্রবণ ব্যক্তিমানসের শব্দ-প্রতিবিম্ব। (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ২৫)

সৈয়দ শামসুল হক সমসাময়িক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে তাঁর মানসপটে ধারণ করে তিনি গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে একাকার করে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক হতাশা, নীতিহীনতা, অরাজকতা এ সব কিছুই কবিকে নেতিবাচকতার দিকে অগ্রসর করতে গিয়েও শেষে তা হয়ে ওঠে না। তিনি গ্রামবাংলাকে উজার করে ভালোবেসেছেন। শত হতাশার ভেতরও তিনি খুঁজে ফিরেন আলোর পথ। বলা যায়– 'জীবনের গ্লানি, সমাজের নৈরাজ্য সত্ত্বেও জীবনকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা জাগে, বারবার বাংলার বুকে ফিরে আসার বাসনা উদিত হয়।' (সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ২৯৪) গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, আর দুধে ভাতে সন্তান– এ সবই সমৃদ্ধ বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্য। ফলত, কবি বাংলাকে ধ্বংসের হাত থেকে ফিরে আসার অনুরোধ জানাতে গিয়ে তাঁর ঐশ্বর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। শৈশব-স্মৃতি রোমন্থনের ভেতর দিয়ে গ্রামবাংলার চির সাথী নদী, নৌকা, দুধভাত মাখা হাতের বর্ণনায় ভরপুর :

> ফিরে এসো, তোমার নদীর কাছে,/তেরোশ নদীর জল যার আছে তার মতো কে আছে সচ্ছল?
> ফিরে এসো, সন্তানের স্নানরত সিক্ততার পাশে,/আয়নায় মেয়েটির মুখের বাঁ ধারে,
> ফিরে এসো উঠোনের ধান গন্ধে। (ফিরে এসো বাংলাদেশ, *কবিতাসমগ্র* ২, পৃ. ৩১)

চিরায়ত গ্রামবাংলার দৈনন্দিন যে লোকজ বিষয়াবলি তা সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁর কবিতায় বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। গ্রামবাংলার চিরন্তনরূপ তাঁর রক্তে প্রবাহিত। 'শাশ্বত আর বৈচিত্র্যময় প্রেমানুভব, নারীর কামনা-চারিত্র্য আর গ্রামীণ জীবনের সার-সত্য প্রেমজ ধারাকে ধরতে চেয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক।' (মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, পৃ. ৯০) তাই যে কোনো পরিস্থিতিতেও তিনি তাঁর লোকায়ত গ্রামীণ ঐতিহ্য থেকে কখনোই

বের হতে পারেননি। গ্রামসন্নিহিত এ দেশের নদীমাতৃক রূপকে কবি তেরোশ নদীর জল আর লোকজীবনের নিত্যনৈমিত্তিকতাকে ঢেঁকির শব্দের উপমানে চিত্রিত করেছেন। ধ্বংসের দিকে কবির দেশ যেন কিছুতেই পতিত না হয় তাই বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন গ্রামবাংলার অমূল্য ঐতিহ্যকে। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় বারবার ফিরে আসে ভাষা আন্দোলন, গণআন্দোলন, একাত্তর আর এর ভেতরই তিনি যেন স্মৃতিরোমন্থনে ডুবে থাকেন তাঁর ঐতিহ্যসমৃদ্ধ দেশ মাতৃকার অপার সৌন্দর্যে :

দুলে ওঠে নৌকোর গলুই,/নদী হানে জলের চাপড়;
এখন নক্ষত্র ছাড়া আর কেউ জেগে নেই/ব্রহ্মপুত্র নদে।

(অবিরল ঝরে পড়ে বাংলার অক্ষর, *কবিতাসমগ্র* ২, পৃ. ৪০)

সৈয়দ শামসুল হক গ্রামীণ ও লোকজ যে বিষয়াবলি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন তা সহজেই আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায়। 'লবণ' কবিতায় দেখা যায় গ্রামে যে সাধারণ ঘটনা নিয়ে খুনাখুনি বেঁধে যেতে পারে এবং খুনের মতো হৃদয়বিদারক ঘটনাও এই শ্রেণির মানুষ নিত্যদিনের ঘটনা মনে করে সহজেই মেনে নেয় :

তরকারিতে কম হয়েছে একটুখানি নুন,
এতদিনের বৌটা হলো তার জন্যে খুন। (লবণ, *কবিতাসমগ্র* ২, পৃ. ২৫৮)

আজীবন গ্রামপিপাসু কবি নগর জীবনে হাঁফিয়ে উঠেছেন। তাই তিনি তাঁর শৈশব ফিরে পেতে চান। তাঁর মনের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে ফিরে পেতে চান হারানো দিনের গ্রাম। যেখানে গ্রামের সহজ-সরল জননী তরকারিতে লবণ দিতে ভুলে যান বয়সের কারণে। তার চোখে ছানি। তাই বরবটিকে মরিচ ভাবেন। সেখানেই কবির আত্মতৃপ্তি যেখানে রান্নার কাঠের আগুনের ঘ্রাণ, মসুরের গাঢ় ঘ্রাণ আর নদীভরা মাছের ঘ্রাণ :

কি আছে লজ্জার যদি সাময়িকভাবে এই কাবাবের প্লেট ঠেলে দিয়ে
মনে মনে মাকে বলি, চোখে ছানি, নুনের ওজন যিনি নিত্য ভুলে যান,
ধনে ও জিরের মধ্যে কোনটা কি স্পষ্ট নয় যাঁর কাছে আর এ বয়সে,
মরিচকে বরবটি মনে করে ঢেলে দেন মাটির পাতিলে,
কাঠের আগুনে ঘ্রাণ, মুসুরের গাঢ় ঘ্রাণ, মাছের নদীর ঘ্রাণ,
সেই বাল্যবেলাটির ঘ্রাণ, (কি আছে লজ্জার, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ৩৮৮)

যে গ্রাম তিনি ফেলে এসেছেন সেখানে যে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব না, সেই বেদনাবোধই তাঁকে তাড়িত করে বেড়ায়। শিল্পীমনের অভিঘাতে কবি লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানে কবিতাকে সিঞ্চিত করেন; কিন্তু ব্যক্তিমনের আসক্তিতে তিনি লোকজীবনকে ভুলে যেতে বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ করেন না। কবির এ-ও এক বৈপরীত্য।

নগরাশ্রিত জীবনে বসে সৈয়দ শামসুল হক গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপবন্ধন সৃষ্টি করেন। *পরাণের গহীন ভিতর* তেত্রিশটি সনেটের সমন্বয়ে গঠিত প্রকৃতিকেন্দ্রিক সংস্কারাশ্রিত জীবনের আলেখ্য। তিনি গ্রামীণ ও লোকজজীবনের বিষয়বস্তু তুলে এনেছেন আঞ্চলিক ভাষার দক্ষ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। *পরানের গহীন ভিতর* নাম কবিতার মধ্যে তিনি গ্রামীণ আঞ্চলিক ও লোকমুখের ভাষাকে অত্যন্ত দক্ষ কারিগরের মতো গাঁথুনি দিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। লোকস্নাত কবি নগরনন্দন হলেও ঐতিহ্যের পিঁড়িতে আসীন :

> জামার ভিতর থিকা যাদুমন্ত্রে বারায় ডাহুক,
> চুলের ভিতর থিকা আকবর বাদশার মোহর,
> মানুষ বেকুব চুপ, হাটবারে সকলে দেখুক
> কেমন মোচড় দিয়া টাকা নিয়া যায় বাজিকর।
> চক্ষের ভিতর থিকা সোহাগের পাখিরে উড়াও,
> বুকের ভিতর থিকা পিরীতের পুন্নিমার চান, (পরানের গহীন ভিতর, *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ২২৯)

এখানে গ্রামীণ লোকমেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। হাটের দিনে জাদুকর জাদু দেখিয়ে বেশ টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়। এখানে কবিতার ভেতর রূপকের আড়ালে আরো একটি অন্তর্নিহিত ভাব প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ বাজিকর এমনি বাজিকর যে মানুষ বোঝে কিন্তু তার জাদুর কেরামতি ধরতে পারে না, তাই সে এমনভাবে রুমাল নাড়ায় সেটা পরানের গহিনে স্পন্দন তোলে। এখানে আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক মানুষের জন্মের ভেতর রহস্যকে বাজিকর, জাদুকর অর্থাৎ গ্রামীণ লোকসংস্কারের সঙ্গে তুলনা করেছেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্তে। এ কাব্যের আঞ্চলিক ভাষা সুগন্ধে ভরপুর :

> আঞ্চলিক ভাষার আদলে তিনি যে একটি সর্বাঞ্চলিক কাব্যভাষা সৃষ্টি করে '*পরানের গহীন ভিতর*'– এর সনেটগুচ্ছে প্রয়োগ করেন, তাতে সম্পৃক্ত হয় গ্রামীণ মানুষের যাপিত জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাষিক উপাদান-উপকরণসমূহ। তাঁর কবিতায় গ্রামজ শব্দের প্রয়োগও স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর কবিমানসে বৃহত্তর লোকায়ত সমাজের ভাষায় সক্রিয় উপস্থিতির কারণে এই প্রয়োগ শিল্পসাম্য লাভ করে। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ১৩৫)

সৈয়দ শামসুল হক কবিতায় লোকায়ত সমাজের যেসব আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নরূপ : ভেলা, আনাজ, নস্যি, আধলা, ইঁদারা, ভাঙা হাট, মেঠোপথ, কবাট, জলা, পৈঠা, গলুই, ভাঁড়ার, তালুক, বেগানা, চাতাল, পাথার, ইজারা, খেরোখাতা, বেদের বহর, হালখাতা, ঝাঁপি, কোদাল, খন্দ, খড়ি, পিদিম, কোঁচড়, আচানক, সিথান, পাটাতন, কবিরাজ, আকাল, খন্তা, আন্ধার, বিরান, বেবাক, বাইন তালাক, বিষনিম, আদাড়বাদাড়, বিছন, চোৎরার পাতা, দুফর, পিন্ধায়া, চিক্কুর, সাতনরী ছিকা, সাপের ছলম, বয়াতি, গাভির ওলান, তুষ, নায়ের বাদাম, যৈবন, বিহান, দুধের

ঘেরান, ছিনাজোঁক, ফাল, নাগর, ভাতার, খা'ব, লোকমা, চুবান, আইলের বেড়া, কাছাড়, গাভীন, লোহার ঈষ, খালুই, সানকি, মৌরলা, ভাতঘুম, ঢেঁকির পাড়, বাওয়ালি, খলিশা, ডিঙা, ঘাগরা, বেগার, গোহাল, মাকু, খাটাল, তাগা, কাবিন প্রভৃতি।

সৈয়দ শামসুল হক ঐতিহ্য সন্ধানী কবি। নিজস্ব ঐতিহ্যকে আজীবন পরানের গহীন ভিতরে তিনি লালন করে আসছেন। তাই শহরবাসী হলেও তাঁর পরানটা শুধুই টান খায় তাঁর গ্রামবাংলার সংস্কৃতির উদ্দেশ্যে। সৈয়দ শামসুল হক দক্ষ শিল্পীর মতো গ্রামীণ ও লোকজজীবনের চিত্র নিখুঁতভাবে বুনে গিয়েছেন যা আধুনিক ও বাস্তবসম্মত। বলা যায়, স্বদেশ, স্বজাতি, ইতিহাস-জনপদ-ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর কবিতা আলাদা মাত্রা যুক্ত করেছে। 'নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত এই কবি বাংলার প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন, তবে নাগরিক বাক-চিত্রই বেশি ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়।' (মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, পৃ. ১০৮) সৈয়দ শামসুল হক শহরকেন্দ্রিক কবিতা রচনার পাশাপাশি গ্রামীণ ঐতিহ্যানুসারী কবিতা রচনায় স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় প্রাচীন বাংলার লোকজীবন থেকে শুরু করে লোকবাংলার মনসার কাহিনি পর্যন্ত পুনর্জাত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল মাহমুদ

পঞ্চাশের দশকের একজন গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক কবি আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯)। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *লোক লোকান্তর* (১৯৬৩), *কালের কলস* (১৯৬৬), *সোনালি কাবিন* (১৯৭৩), *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো* (১৯৭৬)। তাঁর কবি প্রতিভার মধ্যে আলোকিত হয়ে আছে বাংলায় লোকঐতিহ্যের অনুষঙ্গ বিষয়াবলি। তবে আল মাহমুদের কবি মানসের স্বরূপ প্রধানত দু'টি ধারা প্রতিভূ হয় :

> এক-দিকে আধুনিক জীবনের তুচ্ছতা, আনন্দহীনতা ও জটিলতার তিনি উত্তরাধিকারী, অপরদিকে ফেলে-আসা গ্রামজীবনের প্রশান্তি ও আনন্দের স্মৃতি তাঁর কাছে পরম আবেগের উৎস। (সাঈদ–উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ২৬১)

আল মাহমুদ তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে চোখ মেলে দেখেন প্রকৃতির বিচিত্র পালাবদলে মানুষের জীবন প্রবাহ অর্থাৎ 'পুরাণ অনর্গল গেঁথে চলে নদী-নারী-ভূমির একার্থরূপে; অভিন্ন থাকে জীবন-যৌনতা, রাখালী প্রকৃতি ও সুগন্ধি গ্রাম। শব্দসম্ভারে বুনতে থাকেন সনেটের গাত্র, অমোঘ হয়ে আসে বৈষ্ণবযুগের ধারাবাহিক সমুজ্জ্বল পুনর্নির্মিত বার্তা। এভাবেই তাঁর সাফল্য।' (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ১৫৮) সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে দ্বন্দ্ব সংঘাত বহমান ছিল তিনি সে সবকে অতিক্রম না করে বরং তার ভেতর দিয়ে নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতায়। তিনিও বাস্তবতা বর্জিত নন। তবে বাস্তবতায় স্বীকরণ আশাবাদী কবি। এ কারণেই তাঁর কবিতায় বাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। আল মাহমুদ চিত্রকল্প নির্মাণ ও অলংকার সৃষ্টিতে বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আধুনিকতার দিকে আরো একধাপ বাংলা কবিতাকে তিনিই উপস্থাপন করেন। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় বাংলার লোকঐতিহ্য গ্রামীণ আবহ :

> কঠিনে-কোমলে গড়া কবির সত্য। আসলে আল মাহমুদ নিজেও জীবনকে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে অনুভব করেছেন। আর যেহেতু তিনি জীবনে সহজতার সন্ধান পান না, ফলে তাঁর জীবনবোধ সব সময়ই উন্মুখ হয়ে থাকে অস্তির দিকে। আর এখানেই লুকিয়ে আছে তাঁর কবিতার আধুনিকতার সূত্রটি। (মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ৩০৩)

গ্রামবাংলার ঐতিহ্য রক্ষক কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিতাকে নিয়ে যান আধুনিকতার স্বর্ণ শিখরে। এখানে তিনি পঞ্চাশের দশকের একজন সফল ও আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান। আল মাহমুদ সমসাময়িক অবস্থাকে উত্তরণের চেষ্টায় যে বিচলিত ছিলেন তার পরিচয় তাঁরই স্বঘোষিত উক্তিতেই পাওয়া যায় :

> ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কবির অসহায়তা ও জীবিকার অনিশ্চয়তা অন্যান্য কবির মত আমাকেও কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াতে দেয়নি। আর আমিতো জন্মেছি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র্যতম দেশে। কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে এর প্রতিকার চিন্তায়। (আল মাহমুদ, *আল মাহমুদের কবিতা*, ভূমিকাংশ)

সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে লোকঐতিহ্য নির্ভর কবি আল মাহমুদের কাব্যযাত্রা অব্যাহত। সমালোচকের ভাষায় :

> বাঙলা কবিতায় শ্রেণী-সংগ্রাম, বিপ্লব তথা মার্কসবাদের অনুভব এর আগেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু একটি দেশের, একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠির মানসিক গঠন, তার মেজাজ, তার আবেগ ও উচ্ছলতায় এতটা সিক্ত হয়ে ওঠেনি আর কোন কবিতা, আর সেই সঙ্গে মেটাতে পারেনি শিল্পের কঠোর দাবি। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা, অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ১৪৯)

বলা যায়, আল মাহমুদের কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল গ্রামজীবন নয়, শৈশবে ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে তিনি বারবার তাঁর চিরচেনা গ্রামে ফিরে যেতে চেয়েছেন। নগরজীবনের মধ্যে ক্লান্তি হতাশা অস্থিরতা থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছেন। জীবনজটিলতায় আল মাহমুদ অসহায়। প্রায় সারাজীবন নগরে বসবাস করা সত্ত্বেও আল মাহমুদ নগরের চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে নয়, নগরের চোখ দিয়ে গ্রামকে নয়; নগরবাসীর একজন কবি পল্লির চোখ দিয়ে পল্লিকে আবিষ্কার করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে আল মাহমুদ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য আধুনিক কবি। আল মাহমুদের কবিতার মূল বিষয়বস্তু হলো : প্রেম, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও স্বদেশবোধ। তাঁর কবি প্রতিভার মধ্যে আলোকিত হয়ে আছে গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্যের অনুষঙ্গ বিষয়াবলি। আল মাহমুদ সহজ সারল্য কবি স্বভাবের বলে তাঁর কবিতাকে ঐতিহ্য ও লোকজ সমৃদ্ধ পথে দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়েছেন । 'পাণ্ডিত্যের প্রগলভ প্রকাশ নয়, বরং বাংলাদেশের লোকজঐতিহ্য ও গ্রামবাংলার পরিচিত বিষয়বস্তুর ব্যবহার তাঁর কবিতাকে একটি ঈর্ষণীয় স্বাদুতা ও সহজবোধ্যতা দিয়েছে।' (সাঈদ–উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ২৫৮) আল মাহমুদ নিজ ভাষায়, নিজ শ্রমে, নিজ চেতনায় সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে তিনি পথের দু'পাশ থেকে কুড়াতে লাগলেন এদেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সামাজিক নিয়মনীতি, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলার কোমল প্রেম। বলা যায়, 'লোকায়ত প্রাণস্পন্দনের প্রতীকীরূপ আল মাহমুদের কবিতা। গ্রামীণ ও লোকজ-ঋতুজ উপাদানকে আধুনিক মাত্রায় অভিষিক্ত করেন তিনি।' (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ১৫৭) আল মাহমুদের কবিতার নেতিবাচকতা ও অনিচ্ছাবাচকতা এই দু'টি দোদুল্যমানতায় ছিল দোলাচল। আর এই দু'টির মধ্য দিয়ে তিনি মানসিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তাঁর কবিতাকে ভিন্ন এক মাত্রায় নিয়ে গিয়ে কবিতাকে করে তোলেন শিল্পসমৃদ্ধ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর*– এর কবিতার

মধ্যে ধরা পড়ে শহুরে পরিবেশে ম্লান কবিকে। তিনি ইটের তৈরি এই শহরকে কৃত্রিম ও মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করেছেন–'যেখানে সারাদিন খুঁজেও পিপাসার বারি পাওয়া যায় না।'(সাঈদ–উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ২৫৮) তাই আল মাহমুদ অকপটে ব্যক্ত করেন :

তাকাও, এখানে কারো মুখ নেই, দেহ নেই, সমস্ত কিছুই
নিষ্কলা বালুতে বিলীন। ১৯৬২ টি উষ্ট্র যায়
শূন্যপিঠ নির্গন্ধ বালুতে
খৃষ্টের মৃত্যুর পর একে একে নিঃশব্দ নিয়মে। (অকথ্য অলীক, *লোক লোকান্তর* পৃ. ৪৪)

শহুরে সভ্যতা কবির পক্ষে ধারণ অসম্ভব। নগরে বাস করেও কবির মন পড়ে থাকে পল্লিবাংলার ধানের সোনালি খড়ের চাতালে। শহুরে ক্লান্তি-হতাশা-অস্থিরতার 'এই পরিবেশে সাহিত্য সংস্কৃতির সাধনা বা প্রেম-ভালবাসার পরিচর্যা কবির কাছে অর্থহীন মনে হয়।' (সাঈদ–উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ২৫৯) আল মাহমুদ নৈরাশ্যের গহ্বর থেকে উঠে এসে আশার আলোতে পথ চলতে চান। তাই তাঁর অন্তরের সকল বিভেদ আর দ্বন্দ্ব ভুলে তিনি যেন বিজয়ের জয়ধ্বনি শুনতে পান : লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়। (লোক লোকান্তর, *লোক লোকান্তর* পৃ. ৩৩)

'লোক লোকান্তর' আল মাহমুদের আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে রহস্যময়তা বিরাজমান এ কবিতা। এই কাব্য থেকেই আল মাহমুদের লোকঐতিহ্য রূপায়ণের সূচনা :

> প্রথাগত কাব্যধারার নাগরিক অনিকেতবোধ ও হতাশা-নির্বেদ রূপায়ণের পরিবর্তে লোকায়ত জীবনচেতনাকে আধুনিকতার রূপসংলগ্ন করে কবিতায় পরিস্ফুটনের মাধ্যমে আল মাহমুদ সমকালীন কবিদের মধ্যে ব্যতিক্রমী প্রতিভা হিসেবে সুচিহ্নিত। কবিতার রূপচিত্র নির্মাণে তিনি গণজীবনের বৈচিত্র্যময় শব্দ-সম্ভার, গ্রামীণ নিসর্গ ও লোক-অভ্যাসের বিবিধ প্রসঙ্গকে অনায়াসে নতুন তাৎপর্যে ব্যবহার করেন। বস্তুত, বৃহত্তর লোকায়ত জীবনের বিপুল সম্ভারের অক্লেশ শিল্পায়োজনে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর কাব্যসৌধ। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ১৪১)

আল মাহমুদের কবিতায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে জীবনের বর্ণিল রূপসৌন্দর্য গঠনবৈশিষ্ট্যে, শব্দে, ছন্দে, অলংকারে, চিত্রকল্পে এবং পুরাণ ব্যবহারে। চিরায়ত বর্ণময় গ্রামবাংলার সপ্রাণ অস্তিত্ব থেকে কবি পৌঁছে যান কাব্যজগতের অনিন্দ্য রহস্যময় সৌন্দর্যলোকে লোক থেকে লোকান্তরে। নিসর্গাশ্রিত, গ্রামকেন্দ্রিক ও লোকজঐতিহ্যনির্ভর চিত্রকল্পে ভরপুর আল মাহমুদের কবিতা। কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে নিজস্ব যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ :

> আমি আমার কবিতার জন্য একটি পছন্দমত ভাষাভঙ্গি উদ্ভাবন করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। অকস্মাৎ আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাংলা ভাষার সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দরাজি বহু বিচিত্র ব্যবহারে ও যথেচ্ছ আচরণে তিরিশ দশকেই বিস্বাদ, এমনকি পরবর্তী কবিদের জন্য গন্ধহীন পুষ্পের

> পচা স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের যে অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে, সেখান থেকে ব্যাপকভাবে শব্দ আহরণ করে সাহিত্য রচনা করতে না পারলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একঘেয়েমি কাটবে না। এই আহরণ নির্বিচার হলে চলবে না। প্রতিভাবান কবি ও কথাশিল্পীর অন্তরর্দৃষ্টি সেখানে একান্ত দরকার। (উদ্ধৃতি : মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ৩০৪)

অর্থাৎ, এ থেকেই অনুমেয় আল মাহমুদ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কবিতায় গ্রামবাংলার লোকজঐতিহ্য সংস্কারকে তাঁর আঞ্চলিক কবি-ভাষার ভেতর দিয়ে আধুনিক কাব্যে রূপদান করেছেন।

আল মাহমুদ ভালোবাসায় অবলোকন করেন দেশ, মাটি ও মানুষকে। তাঁর বেদনাক্লিষ্ট হৃদয় বারবার ভালোবাসায় সিক্ত হতে চেয়েছে। জীবনে চরম হতাশায়ও তিনি আশার বীজ বপন করতে চান গ্রামবাংলার লোকজ ক্রিয়াকলাপের ভেতর দিয়ে। নীল শাড়ি কোমরে পেঁচিয়ে দুঃখের ঘরকে শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগানে প্রেয়সীর আবাহন অনুভব করেছেন কবি। কিন্তু গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ও শহরে যাযাবরের মতো জীবনে ভয়ানক একা পথচলা কবি প্রিয়তমাকে বারণ করেন আপন ঘরে আসতে। কেননা, নগর সভ্যতায় শুকিয়ে যায় জীবনের সজীবতার প্রতীক চালের লতানো ফুল বৃষ্টির অভাবে। তবুও দুঃখের চৌকাঠ ভেঙে নারীর আগমনের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় নিচের চরণগুলোতে :

> কেন যে আসতে চাও, এ যে বড় ভয়ানক দিন
> চালের লতানো ফুল মরে যাবে বৃষ্টির অভাবে
> দুঃখের চৌকাঠ ভেঙে যদি আসো, দাঁড়াবে কীভাবে? (বৃষ্টির অভাবে, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ২৭)

বাস্তবতার পরাকাষ্ঠে স্বপ্নময় কবির স্মৃতিতে জেগে ওঠে প্রিয় নদী ও দৈনন্দিন সকল অনুষঙ্গ জীবন প্রবাহ। শৈশবের তিতাসের বুক দিয়ে বয়ে চলা নৌকার বৈঠা কবির মানস-সঞ্জাত। গ্রামীণ জনপদে অধীর কোলাহল, মাটির কলস কাঁখে পল্লিবধূর ভিজে পায়ে পথ চলা, বিল থেকে পানকৌড়ি মাছরাঙা বকের পাখায় জলের ফোঁটা বহন করে উড়ে চলার চিত্রকল্প নির্মাণে কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত :

> কিছুই খুঁজি নি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে
> নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
> নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক। (তিতাস, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ২৯)

লোক লোকান্তরের কবি আল মাহমুদের শৈশব স্মৃতির সঙ্গী তিতাস নদী। তিতাসের কাছে তিনি বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন। কারণ, 'নাগরিক ঐশ্বর্যের প্রাণহীন পটভূমিতে তিনি অনুভব করেন তিতাসের মায়াবী প্রাণ-স্পন্দন। আর লোকজ উৎসের আঘ্রাণে তাঁর শিল্পীমন ক্রমাগত স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।' (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ১৩৫) আল

মাহমুদ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও লোকজীবনের যে চিত্রপট অঙ্কন করেছেন তা যেন বাস্তব হয়ে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যায় শানকিতে ভাত, মাটির প্রদীপ কুপি, ফুটো হাঁড়ি, ভাঙা চাল-চুলো প্রভৃতি গ্রামবাংলার লোকায়ত দ্রব্যাদির বিস্তর সমাহারে ভরপুর :

কী নিয়ে ঘর করবে? ফুটো হাঁড়ি ভাঙা চাল চুলো
শানকিতে শাদা ভাত, একটি মাটির দীপ জ্বেলে। (এমন তৃপ্তির, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ৩৩)

দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবন প্রণালীর ভেতরও কবি শান্তিময় নতুন দিন ও প্রজন্মের আহ্বান শুনতে পান। কবি মনে করেন যতই দারিদ্র্য আষ্টে-পিষ্টে ধরুক যদি দুঃখকে ভালোবেসে কোনো নারী জয় করতে পারে তবে সেই সত্যিকারের আগামী দিনের সমাজ গঠনের দক্ষ কারিগর। গ্রামবাংলার বৃহৎ জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করেছেন আধুনিক কবি আল মাহমুদ তাঁর 'স্বপ্নময় রোমান্টিকতা, লোক-ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতি হার্দ্য টান তাঁকে আধুনিক জীবনের পার্শ্ববর্তী গ্রামজীবনের খড়ের গম্বুজের নিচে স্থির করল।' (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ২৩-২৪) ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্ভর কবি আল মাহমুদ সর্বদা ঐতিহ্যের টান অনুভব করেন। তিনি ইতিহাসচেতনা ও সময়ের স্পন্দন অনুভব করেন নিজের অস্তিত্বের ভেতর। তিনি বহুযুগের আগের সভ্যতার সঙ্গে নিজের আত্মার টান অনুভব করেন। আত্মআবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাস অনুসন্ধান ও পরিচয় জানা তাঁর চেতনায় গেঁথে আছে। প্রত্নস্থাপত্য ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। পুরোনো সভ্যতা খুঁড়ে পেয়ে যান পূর্ব পুরুষের প্রাণহীন দেহাবশেষ। 'প্রত্ন' কবিতায় কালযাত্রায় আপ্লুত কবির অবস্থান নির্ণীত হয় এভাবে :

পাথর পাহাড় খুঁড়ে মিলেছে যে করোটি ও হাড়
বিস্ফারিত চোখে দেখি আত্মীয়ের জংধরা খুলি,
কেমন মমতা বাড়ে, হাতে নিই ঝেড়ে মুছে ধূলি,
কালোত্তীর্ণ রক্ত যেন কেঁপে ওঠে তোমার আমার। (প্রত্ন, *লোক লোকান্তর*, পৃ.১৯)

কবি গ্রামবাংলার লোকায়ত জীবনের সঙ্গে বাস্তবতার মিশেলে অত্যন্ত চমৎকার শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। নাগরিকতার বিপরীতে তাঁর কবিতার ভিত্তি ও উৎস গ্রামের মাটি, লাঙল, চাষি, বলদ, নদী, মাঝি, পাখি, রাস্তার ভবঘুরে ও ঘরনি। এই সব উৎস-উপাদান বাংলার গ্রামজনপদ থেকে গৃহীত। কোনো একজনকে ঠিকানা চেনানোর মধ্য দিয়ে তিনি গ্রামীণ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় : চাষা, হালের বলদ, নদী, লাউয়ের মাচা, শুঁটকির গন্ধ– এই সব এর ভেতর প্রবেশ করেন। গ্রামের সহজ সরল বিশ্বাসী এক তরুণী দুঃখিনী পল্লিবালা ভালোবাসার মানুষের মিথ্যা আশ্বাসে প্রতারণার স্বীকার। সে এখন মনোবেদনা নিয়ে অন্যের ঘর করছে :

এক নির্জন বাড়ির উঠোনে ফুটে আছে

আমার মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাসবতী

একটি ম্লান দুঃখের করবী! (রাস্তা, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ৩৫)

আল মাহমুদ প্রকৃতিকে বিশাল ও বিরাটরূপে শিল্পিত করেছেন। প্রকৃতি যা পারে তা মানুষের সাধ্যের অতীত। তাই প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য ও নিত্য পরিবর্তনের খেলায় মানুষ নিতান্তই অবুঝ শিশু। গ্রামবাংলার নদী অবলীলাক্রমে তার দুঃখ প্রকাশ করে, তার ঢেউগুলো যে ব্যথার প্রতিবাদ স্বরূপ, রজনীগন্ধা রাতে নতুন কিছু বয়ে আনে বাতাসে, এমনকি পেঁচা যা অনুভবের প্রতীক সেও শিশুকালে আমাদের ভীতির উদ্রেক করে অথচ শুধু মানবজীবন এর কিছুই পারে না :

মানুষের শিল্প সে তো নির্বোধের নিত্য কারিগরি

রুমালের আঁকা দাগে রঙিন সুতোয় ফুল তোলা,

সাপের অলীক চিত্রে নির্বিষ সাজানো কালো দড়ি,

কাদায় মূর্তিতে কারো সাধ্যমত আঁটা পরচুলা। (আমরা পারিনা, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ২৪)

এ কবিতায় জলের ফেনা, দুঃখী মানুষের চিরন্তন অভিব্যক্তি ফোঁপানির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। রজনীগন্ধা রাতের বাতাসে দান করতে পারে নতুনত্ব, পেঁচার ডাকের মধ্যেও স্বতঃপ্রণোদিত বার্তা থাকে আর শীতের তীব্রতায় বৃক্ষের হলুদ পাতাগুলো ঝরে গিয়ে মূর্ত করে তোলে ঝরে পড়ার অনিবার্য বাস্তবতা। কিন্তু মানুষ তার প্রকৃত অবস্থাকে অবিকল ব্যক্ত করতে অক্ষম। কবি মনে করেন নিসর্গ প্রকৃতি নগর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্থান, বসবাসের নয়। ফলত, কবি অরণ্যের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারেন নি। অরণ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার স্বাভাবিক পরিবেশে কবি বিস্ময় ও ক্লান্তি অনুভব করেন। তাঁর চিন্তায় দার্শনিক ভাবনা ও জীবন যাপনে নান্দনিক বোধের প্রকাশ ঘটেছে। 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন' কবিতায় কবি তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা অবলোকন করে নিজেকে বেমানান ও অসুখী ভেবেছেন। অরণ্য-প্রেমী কবি বনের ভেতর পরিবর্তন যেন বুঝতে পারেন না। কবি অপেক্ষায় থাকেন পরিবর্তের আভাস দেখতে চান কিন্তু অপেক্ষার আর শেষ হয় না :

বনের রহস্য কাঁপে যেন। ভুরুতে ক্লান্তির নুন

গ'লে পড়ে গালের দু'পাশে। আর আমি নির্বিকার

হতাশার মতো শুধু চেয়ে থাকি অরণ্যের দিকে। (অরণ্যে ক্লান্তির দিন, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ২৬)

আল মাহমুদ কবিতা লেখার প্রথম থেকেই নারীকে গৃহস্থ-প্রেমের প্রতীক ও যৌনতৃপ্তির আশ্রয় ভেবেছেন। তাঁর চিত্রিত নারী বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রাত্যহিক জীবনাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ বিষয়ে কবির নিজের উক্তি প্রনিধাণযোগ্য :

আমি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পড়েছি। সেই চর্যাপদ থেকে ইউসুফ-জুলেখা, সব পড়েছি। এসব সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় ছিল আসঙ্গলিপ্সা ও শারীরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ। তবে তা ছিল ইঙ্গিতময়

কাব্যভাষায়। এটা আমার মনে হয় ঐতিহ্যবাহী। আমি আমার রচনায় এই প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি মাত্র। (শানু মোস্তাফিজ, *কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আলাপচারিতা*, *কালি ও কলম*, পৃ. ৯১)

আল মাহমুদ তাঁর কাব্যে নারীকে উপস্থাপন করেন জৈবিক উপাদানে। নারী তাঁর কাছে কোনো আধ্যাত্মিক বস্তু নয়। নারী তাঁর কবিতায় চিত্রিত হয়েছে কামনা-কাতর অভীপ্সার সরাসরি লক্ষ্য হিসেবে। নারী সংস্পর্শে তাঁর কবিচিত্তে যে শিহরণ, প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয় তা ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি নির্ভীক ও সংস্কারমুক্ত। নারীর দেহের প্রতি কামজ দৃষ্টি ও যৌনতা আকৃষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি লোকজ সাজে সজ্জিত করেছেন :

জরির শাড়িটা পরো, রক্ত মাখো, আঁচড়াও চুল
আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখো বুকের গঠন
লুকানো যায় না তবু অনিবার্য যৌবনের ফুল
প্রতীকের মত যেন জেগে থাকে তোমার জঘন। (অহোরাত্র, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ৩১)

আল মাহমুদ এই যৌবনবতী নারীর ভেতর প্রবল আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছেন। নারী কামতৃষ্ণা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেক বড় আস্থার জায়গা তৈরি করে দেয়। অকুতোভয় নারী তার সঙ্গীকে নির্ভয় দেয় যা প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় বহন করে :

দেখবে না কেউ, এসো পার হই সাঁতরে
এতো ছোট নদী, মরবো না, এসো ঝাঁপ দি–
বলেছিলে তুমি আমার শরীর হাতড়ে
আমার তখন হলো না তেমন শক্তি। (ফেরার সঙ্গী, *লোক লোকান্তর*, পৃ. ৩৫)

গ্রামীণ ও লোকজীবনকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা আল মাহমুদের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ দু'টিতেও স্পষ্ট। কবির মানসপটে ফেলে আসা গ্রামবাংলা যেন তার তৃষ্ণার পানির পাত্র। তাঁর স্মৃতিরোমন্থনে সেই গ্রামীণ জীবন যেন তরতাজা হয়ে ওঠে– তার 'বেহায়া সুর' কবিতার ভেতর। তিনি অবলোকন করেন প্রিয় তিতাস নদী, পানকৌড়ি, কালো শালুক, গ্রামের মেলার মাটির পুতুল, মাটির সোঁদা গন্ধ, জোনাক পোকা, বর্ষার জল ও গ্রীষ্মকালের গরমের সময় ঠাণ্ডা বাতাস প্রভৃতি :

তুমি আমার তিতাস, কালো জলের ধারা
পানকৌড়ি আমি, আমি পানির ফেনা,
ডুব-সাঁতারে নিত্যকালের এই চেহারা
তুমি আমার কালো শালুক, চিরচেনা। (বেহায়া সুর, *কালের কলস*, পৃ. ৬৫)

প্রেয়সীকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়াদির চমৎকারিত্ব ঘটিয়েছেন। আল মাহমুদ ফিরে যান স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলোতে। ছোটবেলায় স্বপ্ন ভিতু ছেলেকে মা পরম যত্নে দক্ষিণ

হাতে রূপার মাদুলি বেঁধে রাখতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই ছেলে আজো যখন স্বপ্নে কাতর তখন তার হাতে মাদুলি বেঁধে দেয়ার মানুষ ও মাদুলি সবই যেন লোকজস্মৃতি :

স্বপ্নের আঘাতে আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না
অথচ বালককালে মা আমার দক্ষিণ বাজুতে
রূপোর মাদুলী তুই বেঁধেছিলি স্বপ্ন না দেখার,
তবু কেন জননী গো খোয়াবের অসুখ সারে না!
সামান্য আবেশ এলে ভেসে যাই নূহের নৌকায়।
অথবা উড়াল দিই আশার পাখিটি একা একা। (ফেরার পিপাসা, *কালের কলস*, পৃ. ৫৮)

আল মাহমুদের কাছে প্রধান অবলম্বন জীবন। জীবনবাদী কবির পক্ষে হতাশাজয়ী হতে বাধ্য। চরম নৈরাজ্যের পরও জীবনের পক্ষে দরজা ধরে দাঁড়ান। সামাজিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নতুন জীবন ও সমাজের জন্যে মন্ত্র পাঠ করেন তিনি। গ্রামীণ বিষয়াদির বর্ণনার মধ্য দিয়ে নবীণ-প্রবীণের মধ্যে যে পার্থক্য অর্থাৎ নতুনকে জায়গা করে দেওয়ায় শিল্পিত রূপ দিয়েছেন :

ঝরুক পাতা পুরনো পাতা হলুদ পাতা ঝরুক
বীজের মুখ সবুজ কুঁড়ি অবুঝ মাথা গড়ুক।
শুকনো সেই নদীতে আজ নতুন বান আসুক,
আটকে রাখা নৌকাগুলো স্রোতের টানে ভাসুক। (মন্ত্র, *কালের কলস*, পৃ. ৭৫)

কবি লোকজঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় গ্রামের যে সব পূর্ব-পুরুষ কৃষিকাজে পটু তাদের মতো তিনিও বুঝতে পারেন প্রাকৃতিক নিয়মকানুন। কবি খনার আত্মকথনে খনার বচন ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক, যৌক্তিকতা আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতির ঋতুপরিক্রমা, আবহাওয়া, জোয়ার-ভাটা, বীজ বোনা ও ফসল কাটার ক্ষণ কৃষজ নিয়মের নির্দেশাবলি খনার বচনে বিধৃত। এর সঙ্গে প্রকৃতি, পৃথিবী ও নারীকে কবি সমান্তরালে স্থাপন করেছেন :

কখন জোয়ার আসবে, কেমন গর্জন হলে বৃষ্টি হতে পারে
বাতাসে কিসের তৃষ্ণা, শস্যের ঘ্রাণ টেনে এমনও পেরেছি–
কখন ফসল উঠবে দিনক্ষণ সঠিক জানাতে।
একটি চাষীর মত এসমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত শিখেছি। (নির্ভুল নামে, *কালের কলস*, পৃ. ৭৮)

কবি এখানে নিজেকে মাটির কৃষক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করছেন। তিনি লোকঐতিহ্যের স্পর্শে অত্যন্ত নান্দনিক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়।

আল মাহমুদের গ্রামকেন্দ্রিক কবিতায় যে সফলতা তারই ধারাবাহিকতা চলে আসে *সোনালি কাবিন* কাব্যে। তাঁর *সোনালি কাবিন* কাব্যটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তবে *সোনালি কাবিন* কাব্যগ্রন্থে কবি কিছুটা দোলাচল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাই দেখা যায় 'যে কবি নিসর্গলালিত গ্রাম ও গ্রামীণ

ঐতিহ্যের আশ্রয়ে তাঁর ইতিবাচক জীবনচেতনাকে শিল্পিত করেন, ক্রমে তাঁর কবিতায়ই গভীর এক হতাশা ও অসহায়তার সুর অনুরণিত হতে দেখা যায়। 'তরঙ্গিত প্রলোভন' এর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দ্বিধার অনুকার থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেন।' (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ১৬৮) এই কাব্যেও তিনি লোকাচারের বিভিন্ন দিক সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বাংলার ঐতিহ্যের চিরায়ত যে মূল্য তা তিনি যত্নের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন কবি-প্রতিভার সহজ ও শৈল্পিক দৃষ্টিতে। ১৩ নং সনেটে দেখা যায় :

বাতাসে ভেঙেছে খোঁপা, মুখ তোলা হে দেখনহাসি
তোমার, টিক্‌লি হয়ে হৃদপিণ্ড নড়ে দুরু দুরু
মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী
উঠোনে বিন্নীর খই, বিছানায় আতর, অগুরু। (সনেট-১৩, *সোনালি কাবিন*, পৃ. ১০৫)

বাঙালির লৌকিক জীবনের ব্রত-পার্বণের চিত্র নানা রঙে বর্ণে বিচিত্র। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতির ইতিহাস বহু বর্ণিল। উপর্যুক্ত সনেটের মধ্যে আছে বাঙালির বধূবরণের দৃশ্য। নববধূ বরণে যে কল্যাণ নির্ভর কুলোর ব্যবহার তা বাঙালি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক সংস্কারের এক বিশেষ দিক। উঠোনে বিন্নীর খই, বিছানায় আতর, পরম মমতায় কুলোয় সাজানো ধান-দুর্বার সমাহারের মধ্য দিয়ে নববধূকে স্বামীর ঘরে প্রথম গমন– গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ।

আবার গ্রামীণ ও লোকাচার বিধির আওতায় পড়ে কসম কাটা বা দিব্যি দেয়ার যে রীতি সে বিষয়টিও আল মাহমুদ অত্যন্ত দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির নিজের উক্তি : 'আমি *সোনালি কাবিনে* অন্য এক বাংলার চিত্র, সুদূর অতীতের হয়েও সমকালের দৃষ্টিগোচর, এটা বলার চেষ্টা করেছি। এখানে আমি প্রেম ও কামের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছি আধুনিক জীবনের দাবিকে, যা ইতিবাচক।' (শানু মোস্তাফিজ, *কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আলাপচারিতা*, *কালি ও কলম*, পৃ. ৯১) কবি *সোনালি কাবিন* কাব্যের শেষ সনেটে যখন উচ্চারণ করেন :

বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর। (সনেট-১৪, *সোনালি কাবিন*, পৃ. ১০৬)

তখন আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না কবির উচ্চারণে ফুটে ওঠে মৈমনসিংহগীতিকার বাণীর অনুস্মৃতি। সাক্ষ্য মানা লোকসংস্কৃতির অংশ। এই সনেটে উচ্চারিত সাক্ষ্যগুলো একান্তভাবে গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্য থেকে গৃহীত। অনস্বীকার্যভাবে কবি-নায়ক প্রিয়তমার কাছে বৃষ্টির দোহাই দেয়। তিলবর্ণ ধানের দোহাই, মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর দোহাই কাটে, লাঙল জোয়াল কাস্তে

বায়ুভরা পালের দিব্যি কাটে। কাব্যের শপথ কাটে কবি। অর্থাৎ, লৌকিক জীবনের প্রতীকগুলোকে সাক্ষ্য মেনেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই এ জাতীয় প্রচ্ছায়া দৃশ্যমান হয়। এর মধ্য দিয়ে কবির মানস-প্রতিবেশের ফসল গ্রামীণ জীবন স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

আল মাহমুদের নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন ঘটে তাঁরই স্মৃতি অনুষঙ্গবাহী গ্রামে, নিজের শেকড়ে। সেখানে পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা। মেঠো পথে চলায় কবি যেন অনুভব করেন মাটির আজন্ম চিরচেনা স্পর্শ, গন্ধ, ভালোবাসা। গ্রামের অতি সাধারণ কৃষক সম্প্রদায় যেন কবিরই প্রতিরূপ, আত্মার-আত্মীয়। তারা কবিকে গাঁয়ে স্বাগত জানায় তাদের সহজ সরল জীবন-সংস্কৃতিক অঙ্গনে। সেখানে একদিন কবির পিতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলত :

> কে জানে ফিরলো কেনো, তাকে দেখে কিষাণেরা অবাক সবাই।
> তাড়াতাড়ি নিড়ানির স্তূপাকার জঞ্জাল সরিয়ে
> শস্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপরে কড়া তামাক সাজালো। (খড়ের গম্বুজ, *সোনালি কাবিন*, পৃ. ৯৫)

শস্যের শিল্পী কিষাণেরা কবিকে দেখে সোনালি ধানের খড়ের গম্বুজে বসে কড়া তামাকের সুখটানে বিভোর হয়। কৃষকের স্মৃতিচারণে কবির পিতার কণ্ঠে মারফতি গানের প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়। গাঁয়ের চাষি সম্প্রদায় সোনালি ধানের আলে দাঁড়িয়ে কবিকে অনুরোধ করে– ঠাণ্ডা ধানের বাতাসে হাঁটু গেড়ে বসার জন্য। কারণ, কৃষকদের অভিমত পৌর বাতাসে দূষিত গন্ধ ছাড়া আর কিছু নেই।

কবি প্রিয়ার ভালোবাসার ভেতর দিয়েও লোকঐতিহ্যের ছোঁয়া দিয়ে গেছেন– কবিকল্পনায় প্রিয়তমা যেন তাঁর পছন্দমত সব কিছু করে যায়। নদী আর নারী একাকার কবির মানস রাজ্যপাটে :

> এখনো অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে
> আমার পছন্দ মত শাড়ি কোনো নারী পরেছে কখনো।
> আমি ভালোবাসি নদী, তাই হাসতে হাসতে সেও
> হয়ে যেতো নদী। (আমার অনুপস্থিতি, *সোনালি কাবিন*, পৃ. ১১৮)

সোনালি কাবিন কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় কবি গ্রামীণ ও লোকজ সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ দেনমোহর বা কাবিননামা নিয়ে চমৎকারভাবে কাবিনবিহীন অর্থাৎ শুধু ভালোবেসে ঘরে আনবেন প্রিয়তমাকে। 'কাবিন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'ডকুমেন্ট অব লাভ'– বিবাহের চুক্তিনামা। সেখানে থাকবে না কোনো নিয়মের বেড়াজাল। ফলে সেখানেই রূপ পাবে সত্যিকারের ভালোবাসার জয়গান। প্রেয়সীকে অত্যন্ত আবেগঘন হয়ে কবি বলেন :

> সোনার দিনার নেই, দেন্‌মোহর চেয়ো না হরিণী
> যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি, (সোনালি কাবিন, *সোনালি কাবিন*, পৃ. ৯৯)

আল মাহমুদ *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো* (১৯৭৬) কাব্যের 'কৃষ্ণকীর্তন' কবিতায় মধ্যে মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অনুষঙ্গ পুনর্ব্যক্ত করেছেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-ত্যাগ-মহিমা সবকিছুই এই কবিতায় মূর্ত। রাধাকৃষ্ণের বিষয়াবলি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার চিরায়ত রূপটি প্রকাশে কবি উন্মুখ। গ্রামবাংলার প্রেমিক তরুণী যেন রাধারই প্রতিরূপ। প্রকৃতির নদীর ঢেউয়ে ছল-ছল করে ভেসে ওঠে শ্যামনাম। চারপাশের প্রতিটি জিনিসের ভেতর যেন প্রেয়সী খুঁজে ফেরে শ্যামনাম :

> কেন বা ঢেউয়ের মধ্যে ছল-ছল করে শ্যামনাম,
> কলস বুরাতে গিয়ে চোখ ভরে পানি নিয়ে এসে
> উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখি ঘরে ঘরে পড়ে গেছে খিল।
> তবে কি অকূলে যাবো? সর্বনাশী যমুনারই কাছে–
> খালি ঠিলা দেখে যেথা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ জপে ওঠে জল? (কৃষ্ণকীর্তন, *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো*, পৃ. ১৫৪)

লোকঐতিহ্য নির্ভর কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজকে নানাভাবে অলঙ্কৃত করেছেন আঞ্চলিক ভাষাশিল্পে। মাটিগন্ধী কবি আল মাহমুদ তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে মাটির গন্ধ ও গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তার ভাষার গাঁথুনি ও উপমা অলঙ্কার এত সুন্দর যে তা অতি সহজে আমাদের মনকে স্পর্শ করে। তাঁর কবিতায় অজস্র আঞ্চলিক লোকজাত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : খড়ের চাল, ঝোরা, ঠমক, বৈঠা, আওলানো, আইল, রেহেল, লানৎ, লোবান, পাটুনি, আঁটি, হুক্কাহুয়া, হুঁকো, কড়া তামাক, সুখটান, সোয়ারি, পানের বরোজ, পানের বাটা, নায়রি, মাদুলি, খোয়াব, খোয়াড়, খোড়ল, খোরাকি, ঝুলকালি, সোঁদা মাটি, মাটির ভাঁড়, গাঙ, শিকা, কাউয়া, কইতর, পোলা, জিয়ল মাছ, বইচা মাছ, ঠিল্লা, বুরানো, শরমিন্দা, নিশিন্দা, ছিনাল, সবক, ওলান, পাছা, ফাল, মস্করা, পুঁটলি, কাঁচুলি, কাউন, ঝিয়ারি, বুবু, তশতরি, খাড়ু, কুপি, গুয়া প্রভৃতি।

পঞ্চাশের কবিপুরুষ আল মাহমুদ সুদীর্ঘ অর্ধ-শতকে বাংলা কবিতার জগতে আজ এমন এক আসনে উত্তীর্ণ যা তাঁকে বাংলা কবিতার রাজ্যে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে। 'বাংলা কবিতার প্রচল কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক শব্দমালাকে প্রাতিস্বিক কুশলতায় প্রয়োগ করে তিনি নতুন বাক্‌স্পন্দ সৃষ্টিতে সার্থকতা দেখিয়েছেন।'(মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ১৯৪) লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গ দরদ দিয়ে অবলোকন করেন তিনি। তাঁর লেখনীর পরতে পরতে ধরা পড়ে দরদ আর মায়ার ছাপ। 'আন্তরিক উচ্চারণের টানেই উঠে আসে এমন শব্দাবলি যা মুখের ভাষা, যা অন্তরের এবং অকৃত্রিম, এমনকি অসংস্কৃত।' (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ১৫৫) গ্রামবাংলার ঐতিহ্য-রক্ষক কবি তাঁর কবিতাকে নিয়ে যান এক আধুনিকতার স্বর্ণ শিখরে। তাই আল মাহমুদ পঞ্চাশের দশকের একজন সফল ও আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান। আধুনিক

কবিতায় শিল্পচেতনা ও যুগচেতনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন আল মাহমুদ। লোকজ-নন্দিত কবি আল মাহমুদ কবিতার মধ্যে গণজীবনের বৈচিত্র্যময় সুর তুলে ধরেন। তাঁর মানস-শেকড় প্রোথিত জনজীবনের অভ্যন্তরে। কবিতায় ব্যবহৃত উপাদান-উপকরণ তাঁর বৃহত্তর লোক-লোকান্তরজাত হলেও প্রকরণ-পরিচর্যায় তিনি আধুনিক দৃষ্টি-শাসিত।

একটি দেশের সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন ধরা পড়ে রাজনৈতিক পবির্তনের মাধ্যমে। বিশেষ করে ইংরেজ শাসনের পর ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ ছিল পূর্ববাংলার অর্থাৎ বিশেষ করে আমাদের বাঙালি জাতির জন্য অভিশাপ। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার যা চিরাচরিত ব্যাপার। বিধাতার ঐশ্বর্যে ভরপুর আমাদের এই দেশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপনিবেশের কারণে পর্যুদস্ত। ইংরেজ শাসনামল থেকে দেশ বিভাগের আগে যেমন ছিল শোষণ এর পরে তার মাত্রা বেড়ে গেলে শুরু হয় ধর্মভিত্তিক বিভাজন। আর এর প্রভাব যে কীভাবে আমাদের ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হানে, আমাদের সত্তাকে তছনছ করে আর ইতিহাস বিকৃত করে সংস্কৃতিকে করে ফেলে পঙ্গু। আর এর সমস্ত কিছুর প্রভাব ভৌগোলিকভাবেও পরিবর্তন চলে আসে–প্রকৃতিতেও, মানুষের মানস প্রবণতায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন যেমন, তেমনি বাংলাদেশের কবিতায় চল্লিশের দশকে যে গ্রামবাংলা এবং গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়াবলি দেখা যায় তা পরবর্তী দশকগুলোতে আস্তে আস্তে এর রূপান্তরেও ধরা পড়ে।

চল্লিশের দশকের গ্রাম আর দেশ বিভাগের পর গ্রামের পরিস্থিতি এক হবার কথা নয়। তাই দেখা যায় চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে অর্থাৎ দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত যে চিত্রপট তা দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ সাতচল্লিশের পর এবং পঞ্চাশের দশকের গ্রামের পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের কবিতায় চল্লিশের দশকের গ্রামীণ জীবনে দেখা যাবে সরলরৈখিকভাবে বহমান। গ্রাম সেখানে সজীব-জীবন্ত যদিও চল্লিশের দশকের কবিরা যখন তিরিশি ঐতিহ্য বহন করে, তখন তিরিশের গ্রামবাংলা আরো বেশি প্রকৃতিসর্বস্ব হবে সেটাও স্বাভাবিক। চল্লিশের দশকে কবিতার মধ্যে যে গ্রাম ধরা পড়ে সেখানে মনে হয় কবিগণ যেন বর্তমানে সেই পরিবেশে বসবাস করছেন এবং সে গ্রামকে ছেড়ে বেশি দিন কবি কোথাও থাকেন নি।

চল্লিশের দশকে গ্রামীণ জীবনের রূপান্তর ঘটার মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশের পর এবং তা পঞ্চাশের দশকে স্পষ্টভাবে এই পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। চল্লিশের দশকে গ্রামীণ জীবন যেমন ছিল জীবন্ত ও বর্তমান তা পঞ্চাশের দশকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্মৃতির গ্রামে পর্যবসিত হয়। কবিদের মানসপটে স্মৃতিরোমন্থনে গ্রামকে দেখা যায়। সৈয়দ শামসুল হকের 'ফিরে এসো বাংলাদেশ' কবিতায় কবির স্বদেশ যেন নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে না যায়। ধ্বংসের দিকে যেন পা না বাড়ায় সেই আকুতি

তাঁর কণ্ঠে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশ যে কেমন উত্তাল তার প্রকাশ পায় তাঁর কবিতায়। গ্রামের রাখালের বাঁশি আর বাজবে না, ময়ূর আর পেখম মেলবে না–এ জাতীয় কষ্ট কল্পনা তাঁকে তাড়া করে। কবির স্মৃতিতে তাঁর গ্রামবাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য বহমান। তিনি নগর জীবন ছেড়ে গ্রামে নিঃশ্বাস ফেলতে যেতে চান। যদিও আধুনিক জীবন-জীবিকার টানাপোড়েনে একেবারে গ্রামে থাকা সম্ভব নয়, তবুও তাঁর এই ইট কাঠের নগরী ছেড়ে চলে যাবার সাধ জাগে।

আল মাহমুদের স্মৃতিতে কখনো গ্রামবাংলা ভেসে উঠলে তিনিও ছুটে যান আবহমান বাংলায়। কিছুদিনের জন্য প্রাণের অস্তিত্বের টানে সেখানে পূর্ব পুরুষের বাস্তুভিটা এই সমসাময়িক কবির ভ্রমণেও তিনি যেন অনুভব করেন মাটির আজন্ম চিরচেনা স্পর্শ, গন্ধ, ভালোবাসা। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক হলো নগর সভ্যতা। কবি একদিন গ্রাম ছেড়ে জীবন ও জীবিকার জন্য নগরে আশ্রয় নেন। কিন্তু গ্রাম ও শহরের বিচ্ছিন্নতা পুঁজিবাদী সমাজে অনিবার্য। 'খড়ের গম্বুজ' কবিতায় কবি গ্রাম ছেড়ে আসা যুবকের জবানিতে তা ব্যাখ্যা করেন। নগর সভ্যতার আকর্ষণে বেড়ে ওঠা যুবক মোহ ভেঙে গ্রামে ফিরে যেতে চায়। শহুরে সভ্যতায় কবি হাঁপিয়ে ওঠেন।

আল মাহমুদের কবিতায় যে গ্রামবাংলার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রাম। নদীময় ও কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণজীবন কবির অন্তর্জগতে প্রবেশ করে তাকে পুরোপুরি অধিকার করে আছে। সেই বিম্বিত বাংলাদেশই তাঁর কবিতা। এভাবে পঞ্চাশের দশকের কবিতায় গ্রামীণ জীবন বর্তমান থেকে স্মৃতির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অর্থাৎ দেশ, কাল, সমাজে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ও গ্রামীণ জীবনের যে দৈনন্দিন আচার, সংস্কৃতি তা আস্তে আস্তে পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্রামজীবনের রূপান্তর বিষয়ে কবি স্বীকার করেন :

> একেবারে গ্রামীণ পর্যায়ের নারীরাও এখন আর ঘরে বসে থাকছে না। তারা কাজের জন্য এখন দলে দলে শহরে ভিড় জমাচ্ছে। জীবন অনেক বদলে যাচ্ছে। হয়তো তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। কিন্তু সেটা বেশিদিন থাকবে না। তারা বুঝতে পারছে জীবনযুদ্ধ কী। ছেলেরা যেমন কাজ করতে এসে বুঝতে পারে পৃথিবীটা কীরকম, মেয়েরাও বাইরে বেরিয়ে এসে এটা বুঝতে পারছে। এভাবেই সমাজের যে-পরিবর্তন, বিবর্তন ঘটছে এটা তো অবশ্যই সাহিত্যের বিষয়। আমি এটা লক্ষ করি এবং মনে করি এর প্রয়োজন আছে জীবনে ও সাহিত্যে। (শানু মোস্তাফিজ, *কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আলাপচারিতা*, *কালি ও কলম*, পৃ. ৯৩)

চল্লিশের দশকের রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ছিল পাকিস্তান আমলের অপশাসনের প্রভাবে ভেঙে পড়া এক বিরূপ সময় প্রবাহ। পাকিস্তানের দুই অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় ঐক্য ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রেই মিল ছিল না। নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক জীবনধারা প্রভৃতির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে ভিন্ন ছিল। তৎকালীন কবিদের দেখা গ্রামবাংলার মানুষ ধীরে ধীরে জীবিকার সন্ধানে শহরে ছোটে। শহুরে পরিবেশে জীবন

কাটাতে গিয়েও গ্রাম তাঁদের কাছে চিরচেনায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের কবিসম্প্রদায় গ্রাম থেকে উঠে এলেও নগরের যাপিত জীবনে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করেন। কবিতার চরণে চরণে বারবার গ্রামকে, গ্রামের মানুষ ও তাদের জীবনে জড়িয়ে থাকা অনুষঙ্গ ব্যক্ত হয়। পাকিস্তানি অপরাজনৈতিক কূটকৌশলের মধ্যেই তাঁদের লেখায় ফেলে আসা গ্রাম নস্টালজিয়ায় রূপান্তরিত হয়। ভেঙে পড়া গ্রাম তাঁদের লেখায় আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। আবহমান বাংলার লোকায়ত জীবনকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এগিয়ে নেন কবিবৃন্দ। তৎকালীন রাজনৈতিক শত অনাচারের মধ্যেও সংগ্রামে সাহসে জাগরণে কবিতায় পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন প্রবাহ মূর্ততায় রূপলাভ করে।

গ্রন্থ-সহায়িকা :

১. আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

২. আজীজুল হক, *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

৩. আল মাহমুদ, *আল মাহমুদের কবিতা*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০

৪. আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, পঞ্চম মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯

৬. আহমদ রফিক সম্পাদিত, আলাউদ্দিন আল আজাদ : *কবিতাসমগ্র* ১, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৬

৭. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

৮. ফজলুল হক তুহিন, *আল মাহমুদের কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪

৯. মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

১০. মাহবুব হাসান, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫

১১. মিনার মনসুর, *হাসান হাফিজুর রহমান বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

১২. মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

১৩. মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

১৪. রফিকউল্লাহ খান, *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

১৫. রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

১৬. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

১৭. শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, রোদেলা, ঢাকা, ২০১৩

১৮. শানু মোস্তাফিজ, *কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আলাপচারিতা*, আবুল হাসনাত (সম্পা.) *কালি ও কলম*, দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৫

১৯. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০১

২০. সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

২১. সৈয়দ শামসুল হক, *কবিতাসমগ্র* ১, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮

২২. সৈয়দ শামসুল হক, *কবিতাসমগ্র* ২, পুণর্মুদ্রণ, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২

২৩. হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

২৪. হাসান হাফিজুর রহমান, *কাব্যসমগ্র*, সময়, ঢাকা, ২০০১

চতুর্থ অধ্যায়

ষাটের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

বিশ শতকের ষাটের দশক (১৯৬০-১৯৬৯) বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, এ সময়েই ঘটে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাপ্রবাহ। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক– সকল ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ে তার উত্তাল প্রবাহ। ষাটের দশক ঘটনাপ্রবাহে উন্মাতাল একটি দশক, দাবানলে জ্বলন্ত একটি দশক, পরাধীনতার দশক, স্বাধিকার আন্দোলনের দশক। এ সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের পাশাপাশি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঘটে পালাবদল। শিল্প-সাহিত্য পেয়ে যায় নতুন বাঁক ও পথের সন্ধান। প্রসারিত হয় গণ্ডি, বিস্তৃত হয় অবয়ব। এ সময়ের কবিদের চেতনায় যুক্ত হয় নতুন অভিজ্ঞতা এবং নবজাগরণ, যা প্রকাশ পায় তাঁদের কবিতা রচনায়। ষাটের দশক শুধু যে বাংলাদেশেই স্মরণীয় একটি দশক তা নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই ষাটের দশক একটি স্মরণীয় দশক। এ দশকেই পরাশক্তি ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন খেয়াযান প্রথমবারের মত মহাকাশ প্রদক্ষিণ করে, সমাজতন্ত্রের উত্থান প্রতিরোধকল্পে পুঁজিবাদ পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে তোলে সামরিক সরকার। এ সময়ে এ উপমহাদেশে ঘটে– ১৯৫৯ এ রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, ১৯৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ১৯৭১-এ সংগঠিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। এরপর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়।

ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন : শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬), শামসুল ইসলাম (১৯৪২-২০০৭), সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২-২০০৩), আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩), রফিক আজাদ (১৯৪৩-২০১৬), মোহাম্মদ রফিক (জ. ১৯৪৩), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪) প্রমুখ। ষাটের দশকের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিরা হলেন : নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), ফরহাদ মজহার (জ. ১৯৪৭), হাবিবুল্লাহ সিরাজী (১৯৪৮-২০২১), হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২), হেলাল হাফিজ (জ. ১৯৪৮), মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯), রুবী রহমান (জ. ১৯৪৬), জাহিদুল হক (জ. ১৯৪৯) প্রমুখ।

ষাটের দশকের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে– উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ উপাদান অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ। যদিও ষাটের দশকের কবিগণ প্রথাবিরোধী কবিতা লিখেছেন তবুও কোনো কোনো কবির কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের বহুবর্ণিল ব্যবহার আছে। ষাটের দশকের কবিতায় দু'টি পর্যায় দৃশ্যমান। প্রথম পর্যায়ের কবিগণ ষাটের দশকের কবিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন এবং নতুন কাব্যান্দোলনের নির্মাতা তাঁরা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের মধ্যে সেই ধারার আরো বিস্তৃতি ঘটেছে।

প্রথম পর্যায়ের কবিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কবি হচ্ছেন রফিক আজাদ ও মোহাম্মদ রফিক। রফিক আজাদ জীবনকে গ্রহণ করেছেন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে, মোহাম্মদ রফিক গ্রহণ করেছেন অস্তিবাদী জীবনদৃষ্টিকে। দ্বিতীয় ধারার কবিদের মধ্যে দেখা যায়– রাজনীতিচেতনা ও সমাজভাবনার অবক্ষয়ে বৈপরীত্য। এঁদের মধ্যে আসাদ চৌধুরী, আবুল হাসান, হুমায়ুন আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখ কবির কবিতায় উজ্জীবনী চেতনা ও রাজনৈতিক বোধ কাজ করেছে। ষাটের দশকের কবিগণ জীবনের আশাবাদকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। তাঁদের কবিতায় রাজনীতি- সমাজনীতি-অর্থনীতির উজ্জীবনী চেতনা কাজ করেছে জীবনের অপরিহার্য প্রেরণায়। এ প্রসঙ্গে মহীবুল আজিজ 'ষাটের কবিতা' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> ষাট এর আপন বৈভবেই ষাট কিন্তু ষাটের ষাটত্ব অর্জনের পেছনে পঞ্চাশের কতিপয় কাব্যমুখ মনে করতে হয়। শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব, আবদুল গনি হাজারী, আল মাহমুদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান এবং একটু পরে হলেও ওমর আলীর কথা তুলতে হবে। এঁদের কবিতা সামনে রেখে দেখবো রাজনৈতিক মানচিত্রে যেমন পূর্ববঙ্গের গর্ভে বাংলাদেশ হয়ে ওঠার একটা প্রক্রিয়া চলমান তেমনি পূর্ববঙ্গের সাহিত্যও বাংলাদেশের সাহিত্য হয়ে উঠবার একটি প্রত্যূষ-পর্ব উদ্‌যাপনরত। ষাটে এসে সেই স্রোত প্রবলতর যেমন প্রবলতর হয়ে উঠেছে কবিদের বাস্তব পরিপার্শ্বও। সঙ্গত কারণে পূর্বজদের চেয়ে ষাটের কবিদের বিষয়বস্তুরূপে স্বদেশ একটি বড় উৎসরূপে হাজির। পাশাপাশি অন্যতর কথাবস্তুরও সমাবেশ ঘটবে কিন্তু স্বদেশ ষাটের কবিদের একটা স্বতন্ত্র জোট গড়বার প্রণোদনা হয়েই আসে। (মহীবুল আজিজ, ষাটের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ১৪৪)

ষাটের দশকের কবিদের কবিতার বিশেষ লক্ষ্য বা গন্তব্যযাত্রা ছিল। স্বদেশ, সমকাল আর অস্তিত্ব সংকট তাঁদের সে যাত্রায় সহযাত্রী। নেতিবাচকতা ষাটের দশকের কবিদের কবিতায় বিশাল জায়গা করে নেয়। পঞ্চাশের দশকের কবিদের চেয়ে ষাটের দশকের কবিগণ জীবনাভিজ্ঞতায় মননির্ভর কবিতার ভাণ্ডার নিয়ে হাজির হন। এ দশকের কবিদের জীবনচেতনায় যুক্ত হয় নতুন মাত্রা, কবিতায় নতুনত্বের স্বাদ। ফলে ষাটের দশক বাংলাদেশের কবিতায় নতুন বাঁকের সৃষ্টি করে। ষাটের দশকের

শেষপ্রান্তে এসে কবিগণ স্বাধিকার আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতার জন্য গণজাগরণকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের কবিতাকে প্রচলিত কবিতাধারা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করেছেন।

ষাটের কবিরা ষাটের দশক পেরিয়েও পরবর্তী দশকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছেন। বিষয়-বৈচিত্র্যে এ দশকের কবিরা তাঁদের নিজস্ব কাব্য জগৎ সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। ষাটের দশকের কবিগণ পঞ্চাশের দশকের কবিদের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি প্রভাবিত করেছেন সত্তরের দশকের কবিদেরকেও। ষাটের দশকের কবিরা পঞ্চাশের দশকের কবিদেরকে অতিক্রম করেছেন স্বমহিমায় এবং সত্তরের দশককে ছুঁয়েছেন সমান্তরালভাবে। তাঁদের অনেকেরই এখনো কাব্যিক যাত্রা অব্যাহত। তথাপি ষাটের দশকের কবিদের অনেকের কাব্যজগতের মাঝে ছড়িয়ে আছে অতৃপ্তি, বিরক্তি ও হতাশা।

ষাটের দশকের কবিতায় দর্শনজাত বিমূর্ত ভাবনার প্রকাশ পায়। পাশাপাশি দৈশিক ও বৈশ্বিক সাহিত্য আন্দোলনের ঢেউও তাঁদের মননে ও লেখায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে। পাশ্চাত্যনির্ভর সাহিত্যিক মূল্যবোধ দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত ছিলেন। আমেরিকার 'বীট জেনারেশন'-এর অনুকরণে তাঁরা জীবন ও সমাজকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। ফলে বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা পাঠক সমাজে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমেরিকার 'বীট জেনারেশন' আন্দোলনের মূল প্রবণতাই ছিল– বিকৃত মানসিকতা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনবোধ এবং প্রচলিত সামাজিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি। এ বিষয়ে কবি অসীম সাহা 'ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন'-আন্দোলন' প্রবন্ধে লেখেন :

> 'বীট' আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা অ্যালেন গ্রীন্সবার্গের 'হাউল', উইলিয়াম এস বরোসের 'ন্যাকেড ল্যান্স', এবং ল্যাক কোরোয়াক্সের 'অন দ্য রোড' প্রকাশের পর তা অশ্লীলতার নগ্ন দৃষ্টান্ত হিসেবে সকলের মধ্যে এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু বীটের এই আন্দোলনের ফলে কবিতার জগতে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, যা কবিদের আত্মপ্রকাশের পথ নির্মাণে সহযোগিতা করে। বীট আন্দোলনের কবিরা চিহ্নিত হন 'শ্রেয়োবাদী বোহিমিয়ান' হিসেবে, যারা 'প্রথাগত রীতি'র বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাসী। (অসীম সাহা, ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন'-আন্দোলন, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ১৩০)

বীট জেনারেশনের সঙ্গে জড়িত কবিগণ শুধু নতুন ধারার কবিতা নির্মাণের জন্যই এ ধরনের কাব্য-আন্দোলন শুরু করেননি, তাঁদের নেতিবাচক মনোভাব এবং জীবনাচারকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের শুধু ষাটের দশকের কবিরা 'বীট' আন্দোলন দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন তা নয়, মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনকি ১৯৩০ সালের কবিরাও ফরাসি ও ইউরোপীয় নানামুখি সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিরিশের অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসু, ১৯৫৭

সালে ফ্রান্সের অন্যতম কবি বোদলেয়ারের কবিতার বই 'লা ফ্লর দ্যু মল'-কে 'ক্লেদজ কুসুম' নামে বাংলায় অনুবাদ করে তিনি যে নবযুগের সূচনা করলেন তাতে ষাটের কবিরা শুধু বোদলেয়ারের কবিতাকেই নয় বরং তার জীবনাচারকেও অনুকরণ করতে শুরু করলেন।

শুধু ষাটের দশকেই পশ্চিম বাংলায় আরো কয়েকটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। 'হাংরি' ও 'শ্রুতি' আন্দোলন তাদের অন্যতম। তিরিশের দশকের কবিরা বোদলেয়ারের লেখনিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করলেও তাঁর জীবনাচারকে অনুকরণ করেননি। 'বীট' ও 'হাংরি'কে অনুসরণ করে বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিরা 'স্যাড জেনারেশন' আন্দোলন' নামে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। যার ইশতেহার প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। কিন্তু ইশতেহার প্রকাশের আগেই ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় 'স্যাড'-এর মুখপত্র *স্বাক্ষর* পত্রিকা। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, সিকদার আমিনুল হক প্রমুখ কবিগণের নিয়মিত পদচারণায় *স্বাক্ষর* পত্রিকাটি মুখরিত হয়। সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তরা সকলেই 'লিটল ম্যাগ' বা 'সাহিত্য পত্রিকা'র ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এর ফলে ষাটের এ পর্বের কবিরা পঞ্চাশ এবং ষাটের অন্য পর্বের কবিদের থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে পড়েন। এছাড়া ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে 'শ্রুতি' নামে আরেকটি সাহিত্য-আন্দোলন। 'শ্রুতি' পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকারকের ভূমিকা পালন করেনি। তারা চেয়েছিলেন বাঙালির প্রচলিত ধারার বিপরীতে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে কবিতা হয়ে উঠবে মানুষের আত্মিক বহিঃপ্রকাশ।

সাম্প্রতিক নামক একটি ছোটকাগজকে কেন্দ্র করে ১৯৬৬ সালে 'হাংরি' এবং 'শ্রুতি'র পাশাপাশি 'ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন' গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মধ্যে কোনো উগ্রতা ছিল না। তাঁরা অতীতকে কবিতায় ঠাঁই দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালো কবিতা লেখা। স্যাড জেনারেশন আন্দোলনের কবিদের মূল লক্ষ্য ছিল পঞ্চাশের কবিতা থেকে নিজেদের আলাদা করা এবং স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। এক্ষেত্রে অনেকটা সফলও হয়েছেন তাঁরা এবং বাংলাদেশের কবিতাও পেয়েছে নতুন পথ ও ধারা, ঘটেছে পালাবদল। তবে তিরিশের দশকের কবিতাই বাংলা কবিতার আধুনিকতার সোপান। এ বিষয়ে অসীম সাহা একই প্রবন্ধে লেখেন :

> অস্বীকার করবার উপায় নেই পঞ্চাশের কোনো কোনো কবি ত্রিশের কাব্যধারাকে অনুসরণ করেই বাংলাদেশের কবিতাকে দিয়েছেন আধুনিকতার গতিপথ। শুধু ত্রিশের অনুকরণ করেই নয়, তাঁদের কাব্যপ্রেরণা হিসেবে যুক্ত হয়েছিল একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের ভৌগলিক পটভূমি, ইতিহাসের দায়ভার, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর ও অবকাঠামোগত অবক্ষয় বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ, জাতীয়তাবাদী চেতনাবোধের প্রেরণা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ। আত্মিক ক্ষুধা, ব্যক্তিক দায়বোধ এবং পাশ্চাত্যের বির্ণিমান

> কৌশলকে একীভূত করে প্রকৃত কোনো সাহিত্য বা কাব্য আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলেও বাংলা কবিতায় একটি নতুন ধারা সংযোজন করতে পেরেছিলেন। ষাটের কবিতা পঞ্চাশ থেকে আলাদা, আবার ত্রিশকে অনুকরণ করেও ত্রিশ থেকে আলাদা। (অসীম সাহা, ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন'-আন্দোলন, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ১৩৯)

ষাটের দশকের কবিদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল খুবই সীমিত। দু'একটি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা, কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যপাতার ওপর তাঁরা নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে 'স্বাক্ষর' হয়ে ওঠে কবিতা প্রকাশের সৃজনশীল মাধ্যম। 'স্যাড'এর মতো 'স্বাক্ষর'ও খুব স্বল্পায়ু সংকলন। 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক। 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলো :

> এ কথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পূর্ব-বাংলায় সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দুঃসাহসিক পত্রপত্রিকা একটাও নেই। যাও দু'চারটে পত্রিকা আছে, তাতে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মোড়লদেরই আধিপত্য। সেখানে তরুণতম অথচ নিরীক্ষণশীলদের প্রবেশাধিকার নেই। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তরুণতম নিরীক্ষণশীলদের মুখপত্র স্বাক্ষরের আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী সংকলন বর্ধিত কলেবরে মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ এবং অম্লমধুর সাহিত্যালোচনা নিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যেই বের হচ্ছে। মানসিক পরিণতির দিক দিয়ে যারা নিকট-শৈশবে বাস করছে-তেমন পাঠক-পাঠিকা, অভদ্র বিজ্ঞাপন-দাতা, অসৎ এজেন্ট এবং স্বাক্ষর-গোষ্ঠীবর্হিভূত লেখকদের কোনরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। (উদ্ধৃত : অসীম সাহা, ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন'- আন্দোলন, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ১৪১)

বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলনের নাম ষাটের দশক। এ দশক জুড়ে রাজনীতি সমাজ সংস্কৃতি ও কবিতা সমান এবং সমান্তরাল বেগে প্রবাহিত হয়েছে। এ সময় তরুণ কবিসম্প্রদায় '*কণ্ঠস্বর*' (১৯৬৫) নামক মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। পূর্ববাংলার প্রবহমান ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকজ জীবন, জীবনাচার, ভাষা-সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে ধারণ করে কবিতা রচিত হয়। ষাটের দশকের প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩), রফিক আজাদ (১৯৪৩-২০১৬), মোহাম্মদ রফিক (জ. ১৯৪৩), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪), নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), হেলাল হাফিজ (জ. ১৯৪৮), মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯) প্রমুখ। ষাটের দশকের কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় হলো– স্বকাল, স্বদেশ, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও মানুষের সর্ববিধ বিষয়। এ দশকের কবিদের কবিতায় সমাজজীবনের ভাঙনের তথা অবক্ষয়ের ছাপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আসাদ চৌধুরী

আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩) ষাটের দশকের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫), *বিত্ত নাই বেসাত নাই* (১৯৭৬), *প্রশ্ন নেই উত্তর পাহাড়ে* (১৯৭৯), *জলের মধ্যে লেখাজোখা* (১৯৮২), *যে পারে পারুক* (১৯৮৩), *মধ্যমাঠ থেকে* (১৯৮৪), *মেঘের জুলুম পাখির জুলুম* (১৯৮৫), *দুঃখীরা গল্প করে* (১৯৮৭), *নদীও বিবস্ত্র হয়* (১৯৮২) প্রভৃতি। তাঁর প্রথমদিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়। 'কবিস্বভাবের দিক থেকেও তিনি পৃথক সাম্রাজ্যের অধিবাসী। তাঁর মৃদু পরিহাসপ্রিয়, আনন্দউচ্ছল ও কোমল ব্যক্তিত্বই তাঁকে দিয়েছে এই দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য। নরম-কোমল কিছুর ওপর ভারী ধাতব পদার্থের তীব্র আঘাত যেমন জোর প্রতিধ্বনি তোলে না, অথচ শব্দ ঠিকই হয়, অনুভব করা যায় আঘাতের ব্যাপ্তি ও গভীরতা– আসাদ চৌধুরীর কবিব্যক্তিত্বে সময়ের প্রতিক্রিয়াও অনেকটা তদ্রূপ।' (মিনার মনসুর, ক্রান্তিকালের কবিতা : কবিতার ক্রান্তিকাল, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ২৫৮) বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম সংস্কার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে গভীর দরদী আসাদ চৌধুরী। মূলত তিনি একজন সমাজসচেতন কবি। সমাজের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা তাঁর কবিতার মূল সুর। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা ও স্পষ্টতা। আসাদ চৌধুরী কবিতায় দেশ, কাল, সমাজ, প্রেম উপস্থাপনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালির সংগ্রামী বিপ্লবীচেতনা, প্রতিবাদী কণ্ঠ ও দেশপ্রেমকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেন।

আসাদ চৌধুরীর কবিতায় দৃশ্যমান হয় শান্ত-সৌম্য-নির্বেদ ভঙ্গি এবং প্রতিবাদী চেতনাও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, প্রেমচেতনা, লোকজচেতনা এবং সামাজচেতনায় তাঁর কবিতা প্রভাস্বর। তবে লোকঐতিহ্য এবং লোকজ-অনুষঙ্গের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় সমভাবে বহমান। 'স্বল্পবাক, ঋজু এবং বক্তব্য প্রকাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিকীর্ণ এই কবি; বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতায় সংযোজন করেছেন নতুন মাত্রা। এ-মাত্রা লক্ষণীয় তাঁর ভাষা ও প্রকরণে; যেখানে তিনি ঐতিহ্য, শ্লেষ, প্রেম, সৌন্দর্য ও মরমি-মানসিকতা নিয়ে বাঙালি জাতির ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান করেছেন। আর তাই ছন্দে মেজাজে এবং বক্তব্যে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন।' (আসাদ চৌধুরী, *কবিতাসমগ্র* ফ্ল্যাপ) আসাদ চৌধুরীর কবিতায় প্রধানত দুটি বিষয় প্রাধান্য পায়– প্রেমচেতনা ও সমাজচেতনা। প্রেমচেতনায় নারী, প্রকৃতি ও গ্রামবাংলার মানুষ ক্রিয়াশীল। আর সমাজচেতনায় উঠে আসে তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত চোখে দেখা বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর কবিতার অধিকাংশ জায়গা দখল

করে নেয় গ্রামীণ লোকজচেতনা। লোকঐতিহ্য ও লোকজ-অনুষঙ্গের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় ব্যাপক লক্ষণীয়। লোকশিল্পের বর্তমান প্রয়োগ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেন :

> শিল্প যখন প্রসাধনের ভারে টেকনিকের চাপে ফ্যাকাশে হয়ে যায় তখনই তা লোকশিল্পের বিশাল সলীলে ঝাঁপ দেয়। আমাদের গর্ব করার মতো লোক-ঐতিহ্য আছে। অনেকেই আধুনিকতার মোহ এড়াতে না পেরে এক ধরনের অস্পষ্ট কুয়াশাময় জগতে বিচরণ করেছেন। আধুনিকতা সমকালের দাবি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে শুধু এই মাপের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে কেন? মহাকালের বিশাল পটভূমিতে দাঁড় করাতে না পারলে, জোনাকিকেই সূর্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে হবে। এটা বড়ই লজ্জার। আমাদের কালে খাঁটি দেশীয় সাহিত্য শিক্ষিতের হাতে গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এখনো পল্লীগ্রামে প্রচলিত লোক-সাহিত্য সেই নিষ্পাপ নির্ভেজাল, খাদহীন দেশীয় শিল্পের স্বাদ পাওয়া যায়। (আসাদ চৌধুরী, *কোন অলকার ফুল*, পৃ. ৭৯)

ষাটের দশকের কাব্যানুশীলনের পথে আসাদ চৌধুরীর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল, অনন্য। তিনি এই বাংলার আনাচে-কানাচে ডোবা খানাখন্দে জমে থাকা জলে তৃপ্ত– সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তাঁকে টানে না। 'যে ডোবার জল বিনীত হয়ে তৃষ্ণা মেটায়' তার প্রতিই কবির পক্ষপাতিত্ব। তিনি পৃথিবীর নানারূপ সংকটের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে বরং বাংলার জনপদের মধ্যে নিজের মুক্তি খোঁজেন। তাঁর প্রবণতা সবসময় রূপসীবাংলার নীড়ে :

> রূপসীর ঠোঁট অবজ্ঞায় বেঁকে গেলেই/আমি তাড়াতাড়ি নিজের বুকে টোকা দিই
> আর আমার প্রবণতাগুলো অল্প জলে/রূপোলি পিঠই দেখায়,
>
> (আমার প্রবণতাগুলো, *তবক দেওয়া পান*, পৃ. ৩৭)

ষাটের দশকের কবিতায় বাংলার স্বভাব-কবিদের ধারায় আসাদ চৌধুরীর অবস্থান। তাঁর কবিতায় কখনো কখনো বাউল সুর বেজে ওঠে। আবার মীর্জা গালিবের ঢঙে কবিতায় নিজের নাম ভণিতা হয়ে ওঠে। তাঁর প্রেমের কবিতা নির্মিত হয় গজলের লিরিক মেজাজ ও স্বচ্ছ শরীর অবলম্বন করে :

> ডেকেই দ্যাখো, ঠিক আসবো।/সুখের গানগুলো সম্পর্কে
> আমার কোনো মন্তব্য নেই।/সেখানে আমার স্মৃতির কোনো ভূমিকাও নেই।
> গালিবের বিষণ্ন গজলগুলো/আমার স্বীকৃতির জন্য
> এখনো আমার বারান্দা দিয়ে ঘোরে।/তবু ডাকলে আমি যাবো। ঠিকই যাবো।
>
> (ডেকেই দ্যাখো, *বিত্ত নাই, বেসাত নাই*, পৃ. ৭৭)

আসাদ চৌধুরীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা উদ্ভাসিত হয়েছে তীব্র স্বাদেশিকতার আন্তর-ভূমিতে। স্বাদেশিকতার বোধ তাঁর কবিতায় পরিশীলিত হয় গ্রামীণ জীবননির্ভর লোকঐতিহ্যকেন্দ্রিক উপকরণের পরম আশ্রয়ে। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন :

> দেশজতা- এই একটি শব্দে আসাদের কবিতাকে চিহ্নিত ক'রে নেওয়া যায়। এদেশের লোকঐতিহ্যকে আসাদের কবিতা খুব প্রবল-উজ্জ্বলভাবে আঁকড়ে ধরেছে : প্রাচীন লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব পদ, লালন শাহ

থেকে আসাদ তাঁর কবিতার উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন। (আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, *পৃ.* ২৮৬)

আসাদ চৌধুরীর কবিতার ভিটেমাটি লোকসাহিত্যের উপাদান, উপকরণে সমৃদ্ধ। ছড়ার ঢংয়ে কবিতায় তিনি আঞ্চলিক ভাষার বুনন স্বভাবশোভন করে গাঁথেন। বিশেষভাবে বাংলাদেশের লোকভাষার সঙ্গে আসাদ চৌধুরী তাঁর আবেগের আন্তরিকতা মিশিয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেন :

আলো শাউড়ী, ভালো মানষের ঝি/(তবু) আমারে অসতী ব'লে,
মিছে খোঁটা দেহ,/চন্দ্র সূর্য সাক্ষী আমার
শীতে কাঁপে দেহ। (সন্দেহ, *তবক দেওয়া পান*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২৭)

অধিকাংশ সময় আসাদ চৌধুরী পুরাতন ছড়া অবলম্বন করে নতুন আঙ্গিকে গেঁথেছেন। এর মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও লোকসাহিত্য-প্রীতি এবং প্রেরণার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। এই শ্রেণির কবিতার মধ্যে তাঁর আত্মভাষ্যও ফুটে উঠেছে। এ জাতীয় কবিতার আত্মায় ও শরীরে লোকজ-গন্ধ ভরপুর :

তাহাদের স্বপ্নের ভিতরে কোন শব্দে স্বপ্নের আবহ বেজেছিলো?/ কার সুরে?
কী ভাষায়?/ মানুষের? না পাখির? মেঘের? নদীর?
নাকি ফোকের সরল বাঁশি/ কেঁদে কেঁদে ফেলে গেছে আধোয়া জামায় মোছা
লেপ্টে যাওয়া দু'চোখের জল। (কোমল করাত, *তবক দেওয়া পান*, পৃ. ২৯-৩০)

দেশজতা এ সব কবিতার প্রাণ। স্বরবৃত্ত ছন্দের যথার্থ প্রয়োগ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। প্রাকৃত জীবনের অভিজ্ঞতায় অনুধাবনায় সমৃদ্ধ গ্রামীণ মানুষ প্রকৃতির আচরণ ও চারিত্র্য বিশ্লেষণ করে কৃষিকাজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতেন। গ্রামে বসবাসরত মানুষ প্রাকৃতিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের আগাম সংবাদ অনুভব করতেন। মাটির গন্ধ থেকে বুঝতে পারতেন দুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন। সেই সব জনপদের মানুষের সঙ্গে মিশে যান কবি আসাদ চৌধুরী :

দেয়ালে পিঁপড়ের সারি দেখে পিতামহ
আসন্ন ঝড়ের অঙ্ক নির্ভুল কষতেন।
মৃত্তিকার গন্ধ শুঁকে কাহাতের শরীর ছুঁতেন (নতুন সবক চাই, *তবক দেওয়া পান*, পৃ. ৩২)

দেয়ালে পিঁপড়ের সারি অথবা মাটির গন্ধ শুঁকে কবির পিতামহ নির্ণয় করতেন জৈবনিক অন্বেষণ। আসাদ চৌধুরী তাঁর পূর্বপুরুষের জীবনাভিজ্ঞতাকে প্রাণরসে জারিত করে শিল্পরূপ দান করেন। 'গ্রামীণ জীবন-কাঠামো এবং লোককথার নানাবিধ অনুষঙ্গকে কবিতার বিষয়ীভূত করে স্বদেশের মৃত্তিকামূল অন্বেষণের নবতর চেতনায় উজ্জীবিত হন আসাদ চৌধুরী।' (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ২৩৮) বলা যায়, আসাদ চৌধুরীর কবিতায় বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম সংস্কার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নান্দনিক তাৎপর্যে প্রভাস্বর।

আসাদ চৌধুরী ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে প্রথম গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গে আলাদা হয়ে প্রকাশিত হন। লোকছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোকসংস্কৃতির উপাদান থেকে তাঁর কবিতার মূল রস জোগাড় হয়েছে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গ্রামীণ জীবন-কাঠামোর সঙ্গে শহুরে মানুষের সেতুবন্ধনের স্পৃহাতেই তাঁর আবহমান পল্লিবোধ কার্যকর। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির সহজ বর্ণনভঙ্গি, ছড়ার লোকাঙ্গিক। *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫), *বিত্ত নাই বেসাত নাই* (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গ্রামীণ ছড়া, ব্রতকথা, মৈমনসিংহ গীতিকার ঢং তাঁর কবিতা ও প্রকরণে ভাষারূপ পেয়েছে :

নকশী করা কেঁথা বানাই রঙ্গীল সূতা দিয়া
ঘরের মানুষ বাহির হৈল রুমাল উড়াল দিয়া। (আয়না, *তবক দেওয়া পান*, পৃ. ২৮)

আসাদ চৌধুরী বরাবরই নগরবিমুখ কবি। আজন্ম নাগরিক সন্ত সেজে তিনি বুঁদ হয়ে থাকেন পরম মমতায় মাটির কোল ঘেঁসে। নগরবিষয়ক নিস্পৃহতায় তিনি বারবার অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। আত্মমগ্নতার অপবাদ মাথায় নিয়ে তিনি লোকজসংস্কৃতির জগতে বিচরণ করেছেন অবলীলায় :

কেন উচ্চারণ করো অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে?
(আগে মোছো ঠোঁট থেকে আমার চুমুর ভিজে দাগ)
নগন্য মানুষ আমি লড়াইয়ের নিয়ম জানি না,
জীবন-ধারণ নিয়ে ব্যস্ত আজ অনিচ্ছুক যুদ্ধে,

(স্বীকারোক্তি, *বিত্ত নাই, বেসাত নাই*, পৃ. ৭৮)

শহুরে জীবন ধারণের লড়ায়ে কবি পরাস্ত। তিনি প্রাত্যহিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাঁর কবিতার মধ্যে ঘর-গেরস্থালির নানা অনুষঙ্গ, প্রসঙ্গ বর্তমান। 'সমকালীন আধুনিক কাব্যশৈলী নিয়ে গ্রামীণ মানুষের জীবনানুষঙ্গ, তাঁদের ভাষা, জীবনোপকরণ প্রভৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর কবিতায়। নগর-বিমুখতা, ফলে নৈসর্গিক গ্রামবাংলার প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা পরিস্ফুট হয় তাঁর কবিতায়। লোকছন্দের প্রতি আকর্ষণ তাই স্বাভাবিক। ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ তাঁর কবিতাকে বিশেষত্ব দান করেছে। উত্তরাধুনিকতা ও উপনিবেশ-বিরোধী চেতনার অস্ফুট প্রকাশ তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়।' (খালেদ হোসাইন, *বাংলা ছন্দের মানচিত্র*, পৃ. ৪৩৯) আসাদ চৌধুরীর কবিতায় গ্রামীণ প্রবচন ও মেয়েলি লোককথার মধ্যে গ্রামীণ অনুষঙ্গ বর্তমান :

শীতল বলো ঠাণ্ডা বলো স্বামীর মতোন নয়।
বাপ বলো পুত বলো হলদীর মতোন নয়। (আয়না, *তবক দেওয়া পান*, পৃ. ২৮)

আসাদ চৌধুরী ব্যক্তিক আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতাকে গ্রামবাংলার প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানে মিশিয়ে প্রকাশ করেছেন। নদী, নারী, তরুলতা, দিগন্ত, রাত, ছায়া তাঁর কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

> নদীও বিবস্ত্র হয়, খুলে রাখে বেবাক বসন,/সূর্যাস্তের পর এই নদী–বহমান জলরাশি–
> এমন রহস্যময়ী, যেন তাকে কখনো দেখি নি।/কিছু পরিচিত গাছ, অন্ধকারে কিংবা জ্যোৎস্নায়
> কিছুটা আভাস দেয়, ইশারায় হাতে গুজে দেয়/অলৌকিক মানচিত্র– পরীক্ষার অবৈধ নকল
> পাখিরা ফিরেছে নীড়ে, মানুষেরা নিজ নিজ ঘরে/গাছেদের, নদীদের আচরণ প্রবাসীর মতো?
>
> (নদীও বিবস্ত্র হয়, *নদীও বিবস্ত্র হয়*, কবিতাসমগ্র, পৃ.৩৩৯)

বাংলার দ্বিধাযুক্ত সময়, সমাজের চালচিত্র তাঁর কবিতায় কালচেতনায় বিদ্ধ ও ঋদ্ধ। পারিপার্শ্বিক ও সমকালীন ঘটনাপুঞ্জ আসাদ চৌধুরীর কবিতায় যেমন ছায়া ফেলেছে, তেমনি ব্যক্তিগত রক্তক্ষরণ যন্ত্রণা কাব্যময় হয়ে দ্যুতি ছড়িয়েছে। 'এমনি এক আপাত-ভাববাদিতার উঠানে দাঁড়িয়ে মানুষ ও জীবনের আটপৌরে নিরাপত্তার টানে আসাদ চৌধুরীর কবিতা দুঃসময়ের বিন্দুগুলো এড়িয়ে চলে না।' (আহমদ রফিক, *কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, পৃ. ১৯৪) আসাদ চৌধুরীর কবিতায় লোকজ শিল্পকলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছে। সারাজীবন নগরে বসবাস করেও তাঁর মন পড়ে থাকে গ্রামের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে। লোকসংস্কৃতির ডুবসাঁতারে আসাদ চৌধুরীর মনে অনুরণিত হয়েছিল প্রবল তৃষ্ণা :

> বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ অনুরাগ। এ দেশের আউল বাউল ফকির সন্ন্যাসীরাও তাঁকে কম আলোড়িত করেনি। তাঁদের উদার ও অসাম্প্রদায়িক মানব-চেতনা তাঁকে মোহিত করেছে। এঁদের সকলের কাছ থেকেই তিনি পাঠ নিয়েছেন জীবনের। এবং সেই জীবনকেই কবিতার ছত্রে ছত্রে বিম্বিত করতে গিয়ে বাংলার লোকঐতিহ্যকে নতুন করে কুর্ণিশ জানিয়েছেন। তার চিরায়ত সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের স্পর্শে ঋদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন সমকালীন কবিতার প্রাণ-প্রবাহকে। তাই আধুনিক হয়েও তাঁর কবিতা অতীতের স্পর্শবিযুক্ত নয়, নাগরিক আভিজাত্যের সমুদয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করেও তা লোকজ উপকরণসমূহকে পরিত্যাজ্য মনে করেনি। (সরদার আবদুস সাত্তার, *আসাদ চৌধুরী : কবিতাসমগ্র*, পৃ. ৪১০)

আসাদ চৌধুরীর কবিতায় পারিপার্শ্বিক ও সমকালীন ঘটনাপুঞ্জ যেমন ছায়া ফেলেছে, তেমনি ব্যক্তিগত আবেগ-উপলব্ধিকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়। সমালোচকের ভাষায় :

> নিস্পৃহতার আলখাল্লা সত্ত্বেও সমকালীন সমাজ তাঁর কবিতার শরীরকে ছুঁয়ে যায় মাঝে মাঝে, আর তখনই আসাদকে মনে হয় তুলনামূলকভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও সৎ। আমাদের এই ভূখণ্ডের উত্থান-পতন, আন্দোলন ও উদ্বেগ তাঁর কবিতাকে যেখানে স্পর্শ করে সেখানে তিনি সহসাই নিজের নির্মোককে স্ফারিত করে বেরিয়ে আসেন এবং এসময়ের কবিতার মূলধারায় প্রবিষ্ট হন, যদিও তাঁর ফেরা পরক্ষণেই আলাপচারিতার আসাদীয় ঢঙে বিলীন হয়ে যায়। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ ১৪০)

সমকালকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরাসক্তির মধ্য দিয়ে দেখেননি, ব্যক্তি যেভাবে তার প্রতিক্রিয়া ফেলে তাৎক্ষণিক প্রণোদনা ব্যক্ত করে, সেভাবেই কালের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। নগর মনস্কতা তাঁর কবিতায় নেই একথা বলা যাবে না। তবে নগরের অধিবাসী হয়েও তিনি পরিভ্রমণ করেন পাড়াগাঁয়ে। গ্রামীণ আবহ থেকে তিনি তুলে এনেছেন কাদা মাখানো শব্দ, আঞ্চলিক বাকভঙ্গি এবং গ্রামের জীবন-ছবি।

লোকঐতিহ্য নির্ভর কবি আসাদ চৌধুরী গ্রামবাংলার প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজকে নানাভাবে অলংকৃত করেন আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে। লোকবাংলার ঐতিহ্য-প্রভায় পরিস্নাত মাটিগন্ধী কবি আসাদ চৌধুরীর কবিতায় মাটির গন্ধ ও গ্রামীণ অনুষঙ্গ একাত্ম হয়ে যায়। তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক লোকজাত অজস্র শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন : আনাজ, উম, কাছি, কুটুম্ব, কোঁচড়, খিল, গতর, গাঙ, গাভীন, গুদারা ঘাট, গেরাফি, ঘুঁটে, চিতৈ, চোপা, ছই, ছাও, ছাওয়াল, জিংলা, জোয়ান টঙ, টেবুল, ডিব্বা, তবক, তাগা, তামুক, ত্যানা, ত্যাঁদোড়, থুক্কু, দান্দালি, নাও, নাইওরী, পুত, পোটলা, পোয়াতী, বনবিরিক্ষি, বল্লা, বাউরি, বাজু, বিড়া, বেছন, বেবাক, বেড়া, বিহান, ভুখ, মরদ, মাচা, লগি, শিথান, সরা, সবক, সানকি, সালুন, হালট প্রভৃতি। আসাদ চৌধুরীর কবিতায় উপর্যুক্ত শব্দরাজির অনায়াস প্রয়োগকে গৃহস্থালির নানা অনুষঙ্গনির্ভর ব্যবহার বলে অনেক সমালোচক উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আশির দশকের কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন লেখেন :

> আসাদ চৌধুরীর অনেক কবিতায় গেরস্থালির নানা অনুষঙ্গের তালিকা-নির্ভর বর্ণনা পাওয়া যাবে যেখানে ক্বচিৎ কবিতার সাথে দেখা হয়। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ১৩৬)

আলোচিত বিষয়টি সর্বাংশে সঠিক নয়। কারণ, আসাদ চৌধুরীর কবিতায় মূলত গার্হস্থ্যজীবনকে ঘিরেই গ্রামবাংলার লোকজ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এসব শব্দের মধ্য দিয়ে তিনি সহজিয়া রীতিতে অধিক পরিমাণে প্রাণ-প্রাচুর্য নান্দনিকতার সৃষ্টি করেছেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব বাচনভঙ্গি, প্রাণখোলা বর্ণন ও ভরাট কণ্ঠের অধিকারী আসাদ চৌধুরী তাঁর কবিতাকে লোকজ উপকরণে সমৃদ্ধ করে বাংলাদেশের কবিতার ভুবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রফিক আজাদ

রফিক আজাদ (১৯৪৩-২০১৬) ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর উদ্যোগেই '*স্বাক্ষর*' নামে কবিতাকেন্দ্রী একটি স্বল্পায়ু তবে অসামান্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। আসাদ চৌধুরীর ভাষায় :

> বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক ষাট দশকের সাহিত্য আন্দোলনগুলোতে ছিল নিজেকে বাংলা কবিতার মূল স্রোতে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা, স্বতন্ত্র হয়ে ওঠা। আর বাংলাদেশের এই সময় খণ্ডের কবিতায় প্রধানত কাজ করেছে দেশ উদ্ধারের, দেশকে রক্ষা করার আবেগ, একটা স্বাজাত্যবোধ, সেই সঙ্গে নিজেকে আলাদা করে সৃষ্টির তাগিদ। এই পর্বের অন্যতম প্রধান কবি রফিক আজাদের কবিতা শুরু হয়েছিল তীব্র যৌনতায়, কিন্তু স্বদেশভূমির কথা ভেবে অচিরে তা এক গভীর সামাজিকতায় প্রতিভাত হয়েছে। (আসাদ চৌধুরী, *পূর্বপশ্চিম*, পৃ. ২০)

রফিক আজাদের কবিতা দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ় বস্তুভিত্তির ওপর। তাঁর লেখার প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের দুঃখিত মানুষ, বঞ্চিত মানুষ– তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ বাংলার নিসর্গ, খাল-বিল-হাওর-নদী, গাছপালা, বৃষ্টি– অসম্ভব প্রিয় বাংলার মাটি। তারুণ্যদীপ্ত রফিক আজাদ যেন তাঁর সময়ের যোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রফিক আজাদের নিজের কথায়, তিনি শিল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ অঙ্গীকৃত। তাঁর কবিতা সব সময়ই মানুষের স্বপক্ষে এবং তাঁর বক্তব্য সব সময়েই জীবনের প্রতি ইতিবাচক। কবিতার শৈল্পিক উৎকর্ষ ও বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্য তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

রফিক আজাদের কাব্যসম্ভার ব্যাপক : *অসম্ভবের পায়ে* (১৯৭৩), *সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে* (১৯৭৪), *চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া* (১৯৭৭), *সশস্ত্র সুন্দর* (১৯৮২), *এক জীবনে* (১৯৮৩), *অঙ্গীকারের কবিতা* (১৯৮৩), *প্রিয় শাড়িগুলি* (১৯৮৩), *হাতুড়ির নিচে জীবন* (১৯৮৪), *পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ* (১৯৮৫), *গদ্যের গহন অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া আমি এক দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক* (১৯৮৭), *অপর অরণ্যে* (১৯৮৭), *খুব বেশি দূরে নয়* (১৯৮৯), *ক্ষমা কর বহমান হে উদার অমেয় বাতাস* (১৯৯২), *করো অশ্রুপাত* (১৯৯৪), *পাগলা গারদ থেকে প্রেমিকার চিঠি* (১৯৯৫), *কণ্ঠে তুলে আনতে চাই* (১৯৯৬), *হৃদয়ের কী বা দোষ* (১৯৯৭), *বিরিশিরি পর্ব* (১৯৯৭), *বর্ষণ আনন্দে যাও মানুষের কাছে* (২০০৫) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই। তাঁর কবিতায় আকুতি বা প্রতিবাদ সীমাহীন। চিন্তাচেতনায় দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও সাধারণ মানুষের জন্য প্রীতি থেকে তাঁর কবিতার উৎসারণ। দেশে, সমাজে অবিচার, অসাম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। তাঁর কবিতা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

রফিক আজাদ ছিলেন ষাটের দশকের প্রথম প্রজন্মের কবি। ষাটের দশকের সূচনা থেকেই তাঁর কাব্যযাত্রা শুরু হয়। তিনি বিপ্লবী, তেজোদীপ্ত এবং প্রচণ্ড উচ্চকিত শিল্পীসত্তার কবি। মাতৃভূমিকে রক্ষার দায়িত্বে একাত্তরের রণাঙ্গণে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যুদ্ধের মাঠে। রফিক আজাদ তাঁর কবিতায় গ্রামবাংলাকে আধুনিকভাবে উপস্থাপন করেন। তাই অনেকে তাঁকে নাগরিক কবি বলে অভিহিত করে থাকেন। সরাসরি নাগরিক জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত হলেও তিনি গ্রামকে ভুলে যান নি। বরং তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে পল্লিবাংলায়, গ্রামসমাজকে কেন্দ্র করে তিনি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। কবি নিজেই লিখেছেন– 'বহিরঙ্গে নাগরিক, অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক'। রফিক আজাদের এই আত্মবর্ণনার নিহিতার্থ তাঁর ভেতরকার দ্বন্দ্ব– একদিকে নাগরিক জীবনের হতাশ্বাস, অন্যদিকে তাঁর লোকজ জীবনের সঙ্গে একাত্মবোধ। তাঁর আর্কেডিয়া চুনিয়া নামের ছোট্ট গ্রাম পৃথিবীর যাবতীয় কুরুক্ষেত্রকে সুগন্ধি ফুলের চাষাবাদে ভরে তুলতে চায়। অর্থাৎ, জীবনচেতনার বহিরঙ্গে তাঁর নাগরিকতার নিয়ন্ত্রণচিহ্ন স্পষ্ট হলেও অন্তর্লোকে জেগে থাকে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ বাস্তবতা :

> ষাটের দশকের সামাজিক অবক্ষয় এবং রাষ্ট্রিক যাঁতাকলের নিষ্পেষণের মধ্যে যে ক'জন কবি নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, মেধা ও মননে নতুন দ্যুতি ছড়িয়ে কাব্যজগতে সাফল্যের সঙ্গে বিচরণ করেছেন সদ্যপ্রয়াত কবি রফিক আজাদ তাদের একজন। মূলত রোমান্টিক চেতনাকে নির্ভর করে এই কবির কাব্যজগতে প্রবেশ ঘটলেও সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার অনিয়ম ও অসংগতির কারণে তারুণ্যের অবক্ষয়, হতাশা তাকে পীড়িত করে। তিনি ওইসব অভিঘাতের দ্বারা তাড়িত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার চেতনার মোড় পরিবর্তন করেন এবং কবিতায় ওইসব বিষয় সফলভাবে ধারণ করার প্রয়াস চালান। (সালাম সালেহ উদদীন, সাক্ষাৎকার, *পূর্বপশ্চিম*, পৃ. ১৬০)

রফিক আজাদের কবিসত্তা আধুনিক নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য আত্তীকরণের মাধ্যমে বিকশিত হয়। শহুরে বাস্তবতার নিরীখে তাঁর শিল্পসত্তা নাগরিক পরিচর্যার আবাহন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু রফিক আজাদের শিল্পবোধ নাগরিক কৃত্রিমতার বিপরীতে তাঁর শৈশব-কৈশোরে যাপিত জীবনের প্রত্নস্মৃতির সবুজ উপত্যকায় মূলীভূত হয়ে তাঁকে স্বস্তি দান করে। রফিক আজাদ রোমান্টিক ভাবনায় গ্রামীণ স্মৃতি ও লোকজ সংস্কৃতির বিবিধ অভিজ্ঞানে এবং মননসচেতন শৃঙ্খলাশাসনে গড়ে তোলেন এক স্বপ্নের ভুবন। স্বপ্নের টানেই শিল্পবাদী, আত্মবাদী কৃষকের ভূমিকা নিয়ে শিল্পের বাগান কর্ষণ করতে কবি রফিক আজাদ মনোযোগী হয়ে ওঠেন। এ প্রবণতার টানে রফিক আজাদকে দেখা যায় বিক্ষুব্ধ সময় একপাশে রেখে শিল্পিত বাগান তৈরির কাজে মগ্ন। সীমাবদ্ধ জলের সীমিত সবুজই কবির সবটুকু মনোযোগ ধরে রাখে। তাই স্বপ্নের হাত ধরেই :

একদিকে সবুজ প্রান্তর আর প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ মানুষের চিরায়ত জীবনের হাতছানি, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের হতাশ্বাস, বিবিধ বৈরিতা ও আক্ষেপ। তাই অসম্ভব জেনেও তিনি লোকজ জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে বনে যেতে চান। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ৮৪-৮৫)

নগরজীবন এবং শহুরে জীবনের টানাপোড়েন রফিক আজাদের কবিতায় অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় :

১. তুমি চাও শান্তিচ্ছায়াঘন এক
আদিম অরণ্য;
তুমি চাও জলের গভীরে জ্যোৎস্না, বিরল বসতি
সমূহ সারল্য, লাঙলের ফলপ্রসূ ফলা, নিধুয়া পাথার;

২. তুমি চাও
মাটির উনুন, শানকিতে শাদা ভাত,
পরিমিত নুন– স্বাদু তামাকের তাবু,
শাড়ির ভিতরে এক আলুথালু নরম শরীর,
শীতল পাটির সুখ, হাতপাখা আশার পিদিম;

(তুমি চাও, *চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া* , পৃ. ৪৩-৪৪)

কবির এই আকাঙ্ক্ষা অপূরণযোগ্য যা তিনি 'তুমি চাও' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কারণ, শহরের জীবন এবং গ্রামবাংলার জীবন কখনোই এক হতে পারে না। জীবন জটিলতার শহরে বসে গ্রামজীবনের স্বাদ পুরোপুরি পাওয়া যায় না। শহরের নর্দমা নোংরা জলে ভরা, গাছ-গাছালিতে শোভা পায় হলুদ বিবর্ণ পাতার সমাহার, কারখানা থেকে শহরে উড়ে আসা দূষিত ভারী বাতাসে শান্তির সুশীতল ছায়া বা জলের গভীরে দৃশ্যমান জ্যোৎস্না খুঁজে পাওয়া যায় না। 'অপ্রাপণীয় স্বপ্নের আবাস আর হৃত সারল্য-আনন্দ-হর্ষের স্মৃতিচিহ্নিত অতীত এই দু'য়ের মধ্যে ঝুলে থাকেন কবি।' (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ৮৫) রফিক আজাদ সারাজীবন কবিতা সৃষ্টিতে দ্বৈরথে চেপেছেন। একদিকে নগর জীবনের কোলাহল, অন্যদিকে শ্যামল বাংলার প্রতি মায়া। অবশেষে নাগরিক বাস্তবতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবি গ্রামীণ সমাজ ও লোকায়ত সংস্কৃতির উপাদানে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন :

মাটির নৈকট্যে আছি– সোঁদা গন্ধে; বিনীত জীবন
গাছের পাতার মতো কেঁপে ওঠে সামান্য বাতাসে।
তোমার গভীরে আরো চ'লে যেতে চাই– পেতে চাই
উষ্ণ আলিঙ্গনে। সমস্ত জীবনব্যেপে আঁকড়ে থাকি
শিকড়-সংলগ্ন প্রেমে। দুঃখ তাপে- মোহ্যমান নই,– (তোমাতেই পুঁতে রাখি আয়ু, *অসম্ভবের পায়ে*, পৃ. ২০)

অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের দিকে ধাবিত হওয়াই যে মানবের নিয়তি এ কথা তিনি প্রায়ই শান্ত চিত্তে মেনে নিয়েছেন। চারপাশের ঝোপঝাড়, লতাপাতা ও নদনদী দিয়ে ঘেরা মুক্ত আকাশের নিচে ঝড়-ঝঞ্ঝা-দলিত আজন্ম পরিচিত জন্মভূমির প্রতি তাঁর অসাধারণ মমতার প্রকাশ ঘটেছে কবিতায় :

মন থেকে মনে, মনে-মনে, কৃষকের ঘরে ঘরে,
দুঃখ-বেঁধা হৃদয়ে-হৃদয়ে ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি
মধুর শীতল স্পর্শে সান্ত্বনার ঠাণ্ডা হাত রাখে।
সকরুণ সুরের মূর্ছনা সম্পূর্ণত দেশোয়ালি–

(গান হ'তে বলি, *সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে*, পৃ. ২৫)

মননঋদ্ধ কবি রফিক আজাদ লোকজীবনকেন্দ্রিক ভাবনায় তাড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা নির্মাণের ভেতর মাটি ও মানুষ নিয়ত সঞ্চরণশীল ছিল :

> লোকায়ত বাংলার সাংস্কৃতিক বৈভবের ঐতিহ্যবাহী উপাদান লোকসংগীতের প্রাণরসে আত্মিক অবগাহনের আকাঙ্ক্ষায় আপ্লুত কবির শিল্পচেতনা। গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার কাব্য হিসেবে লোকসংগীতের ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালির হৃদয়প্লাবী সুরের প্রশান্তি কবিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি নগরবাস্তবতার অপরিহার্য বিষাদে অধিবাস করে মর্মে জমে-থাকা দীর্ঘশ্বাসগুলোকে ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালির প্রাণময় রসমাধুর্যে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। এই আকাঙ্ক্ষার চাদরে প্রতিফলিত কবির প্রশান্তিকামী শিল্পচেতনা লোকায়ত জীবনের মর্মমূলকে অনায়াসে স্পর্শ করে। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ২৯২-২৯৩)

শৈশব থেকেই রফিক আজাদ শিল্পের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। গ্রামীণ সোনালি স্মৃতি থেকে নগরে উত্থিত হয়েছেন রফিক আজাদ। তাঁর কবিতায় গ্রামীণ অন্তর্জীবনের গভীর সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে। 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কাব্যে তিনি লেখেন :

নদী ও নারীর মতো/ গভীরতাময়
কোনো জলাশয়ে নেমে/খর কিংবা সুকোমল জলের বারতা
করেছি ঘোষণা দ্রুত– এই আমি– নগরে-বন্দরে;

(মানবিক অভিজ্ঞতা এইভাবে সম্পন্ন হয়েছে, *চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া*, পৃ. ৬৭)

চুনিয়া শান্তিপ্রিয় গ্রামের নাম। মধুপুরের চুনিয়া গ্রামে বাস করে গারো সম্প্রদায়। চুনিয়া নিরিবিলি শ্যামল সবুজ প্রকৃতিসমৃদ্ধ গ্রাম। চুনিয়ার আদিবাসী জনগণ ভীষণ শান্তিপ্রিয়, কখনো গুলির শব্দ শোনেনি, মারণাস্ত্রময় সভ্যতার দুষ্কৃতি দেখেনি; রক্তপাত, হিংস্রতা, শিশুহত্যা, নারীহত্যা, হিংসা-বিদ্বেষ দেখেনি। চুনিয়ার প্রত্যাশা : 'পৃথিবীর কুরুক্ষেত্রগুলি সুগন্ধি ফুলের চাষে ভ'রে তোলা হোক।' চুনিয়া যুদ্ধবিরোধী কবিতা। শান্তির পক্ষে অহিংস দৃঢ়তায় দাঁড়ানোর আহ্বান এ কবিতায় অনুভববেদ্য ও শক্তিধর। নগর জীবন থেকে বহুদূরে ছিল তাঁর অবস্থান। গারো পাহাড়ী নৃগোষ্ঠীর লোকজসংস্কৃতির

কাছে তিনি বারবার শান্তি অন্বেষায় ছুটে গেছেন। লোকজীবনের প্রতীকী রঙ সবুজের মধ্য দিয়ে কবি চুনিয়া গ্রামকে চিত্রিত করেছেন তাঁর কবিতায়। লোকজীবন ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর পরম ভালোবাসা প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন কবিতায়। রফিক আজাদের কবিতায় যে জীবনায়ন তাতে ক্ষুধা আর প্রেমের সহাবস্থানেই তাঁকে দিয়েছে অম্লান অবস্থিতি। শিল্প-পরিমিতি ও স্বকীয় ভঙ্গির জন্যে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকের কাছে তিনি উল্লেখযোগ্য কবি প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর অধিকাংশ কবিতা জুড়ে স্বদেশের মানচিত্র, মানুষ ও জীবনের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। রফিক আজাদের মূল্যায়নে রফিকউল্লাহ খান বলেছেন :

> ষাটের দশকের কবিতায় নাগরিক উল্লাস, বিকার, আত্মরতি ও আত্মকথনের যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি, রফিক আজাদের সতেজ কবিমন তা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে। যেন এক বাউল পাখি নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছে– এই জগতের সবকিছু সে দেখতে ও অনুভব করতে চায়। কিন্তু নিজের মর্মের গভীরে লুকানো রাখালিয়া বাঁশির সুর সে ভুলতে পারছে না। রফিক আজাদ এই নতুন স্বভাবের কারণেই দীর্ঘ কবিতাপরিক্রমণের পথেও কখনো শেকড়হীন হয়ে পড়েন নি। (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ১৫৫)

অর্থাৎ, জীবন-সন্ধানী কবি রফিক আজাদ কবিতায় স্বপ্নের হাত ধরে তাঁর আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা, যন্ত্রণা ও বেদনার চরাচর অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তিনি নাগরিক বাস্তববাদী কবি এবং লোকবাংলার ঐশ্বর্য-প্রভায় পরিস্নাত কবি হিসেবেই বেঁচে আছেন পাঠকের মণিকোঠায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, চিরায়ত বাংলার মানুষকে তিনি মাটির মতো ভালোবেসে মাটিতে মিশে গিয়ে মাটি-মানুষ থেকে লোকজ রস সৃষ্টি করেছেন। মাটির গভীরে সঞ্চরনশীল তাঁর অনুভূতি :

> সর্বাংশে নাগরিক হয়েও তিনি চান– জলের গভীরে জ্যোৎস্না, বিরল বসতি, সমূহ সারল্য, লাঙলের ফলপ্রসূ ফলা, নিধুয়া পাথার, লিলুয়া বাতাস, তৃণের লাবণ্য, পলিময় বীজতলা, কুয়োর মতন দৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন হ্রদ, ব্যাপক খামারবাড়ি, লাবণ্যের ধারাবাহিকতা– শান্তিচ্ছায়াঘন এক আদিম অরণ্য। (রফিক আজাদ : *শ্রেষ্ঠ কবিতা* ফ্ল্যাপ)

রফিক আজাদ খ্যাতিমান কবি। তিনি শহর এবং গ্রামবাংলার কবি। নাগরিক জীবন এবং গ্রামীণ জীবনকে তিনি আত্মস্থ করেন নিজস্ব চিন্তন প্রক্রিয়ায়। দ্বৈরথ সমরে তাঁর অবস্থান। রফিক আজাদ মাটি ও মানুষের শিকড়সন্ধানী কবি। ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন। তাই তাঁর বহুমাত্রিক কাব্যিকতা চোখে পড়ার মতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহাম্মদ রফিক

মোহাম্মদ রফিক (জ. ১৯৪৩) ষাটের দশকের লোকজস্বর ও মননশীল কবি। ঐতিহ্যসন্ধানী ও সংগ্রামের কবি, গ্রাম ও শহরের কবি, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের কবি হলেন তিনি। বাংলার মানুষ ও নিসর্গ, গতিময় বহির্জীবন, বিবর্তমান ইতিহাস– তাঁর কবিতার বিষয়। বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং সমসাময়িক সময় তাঁর আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত লোচনে ভরা। লোক-অনুষঙ্গকে তিনি আন্তরপাঠমূলক করে তোলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য *বৈশাখী পূর্ণিমা* (১৯৭০)'র মধ্যে এর নিদর্শন বর্তমান। মোহাম্মদ রফিকের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম : *বৈশাখী পূর্ণিমা* (১৯৭০), *ধূলোর সংসারে এই মাটি* (১৯৭৬), *কীর্তিনাশা* (১৯৭৯), *খোলা কবিতা* (১৯৮৩), *কপিলা* (১৯৮৩), *উপকথা* (১৯৮৫), *গাওদিয়া* (১৯৮৬), *স্বদেশী নিঃশ্বাস তুমিময়* (১৯৮৮), *মেঘে ও কাদায়* (১৯৯১), *রূপকথার কিংবদন্তী* (১৯৯৮), *মৎস্যগন্ধা* (১৯৯৯), *বিষখালী সন্ধ্যা* (২০০৩), *কালাপানি* (২০০৬), *নোনাঝাউ* (২০০৮), *দোমাটির মুখ* (২০০৮) প্রভৃতি। প্রেমবোধ সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে আধুনিক সমাজ-জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে মোহাম্মদ রফিক বেশ কৌতূহল ও দরদের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর কবিতায়। তিনি লোকায়তজীবন ভাবনায় ও গ্রামীণ সংস্কৃতি চেতনায় স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ কবি হিসেবে বিবেচ্য।

মোহাম্মদ রফিক বাংলা কবিতায় শৈল্পিকতার সাথে দেশীয় রীতির মিশেলে এক অভিনব দিকের প্রকাশ ঘটান যেখানে চিত্রকল্প সৃষ্টি হয় নবরূপে। তাঁর কবিতার উপজীব্য বিষয় মূলত গ্রামীণ জীবনচিত্র। গ্রামবাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষাভঙ্গি, আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির নানাবিধ উপকরণ তিনি তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করেন। দূরবর্তী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দুঃখ-সুখ তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে নিরীক্ষাপ্রবণতায়। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক কথাসাহিত্য থেকে জীবন, চরিত্র ও ভাষারীতি সংগ্রহ করে তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সাজিয়েছেন। ষাটের দশকের কবিদের লেখায় যেখানে নগরচেতনা তীব্ররূপ ধারণ করেছে সেখানে মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় গ্রামীণ অনুষঙ্গ নতুন মাত্রায়, নবচেতনায় লোকজস্বর লাভ করে :

> ঢেঁকিঘর নিকোনো উঠোন পৈঠা কখনো দেহের/গন্ধে ঘামে কখনো বা ধানের খুশীর উষ্ণশ্বাসে
> থমথমে, একটি কুকুর একটা দাওয়ার ওপর;
>
> (ঢেঁকিতে পড়ে পাড়, *ধুলোর সংসারে এই মাটি*, পৃ. ৪৯-৫০)

মোহাম্মদ রফিক বাংলার মাটি, বাংলার লোক-প্রান্তর, বাংলার মাটির রূপকথা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ধারণ এবং অবলম্বন করে কবি-প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। গভীর রাতের নদীর জলে জাল বাওয়া

জেলে-মাঝি, মাঝি-বউ, গেরস্ত, গেরস্ত-বউ, চাষা, জলকাদামাখা মাঠের রাখাল, বাংলার মাটিঘেঁষা মানুষের যাপিত জীবন, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। গ্রামীণ-জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর কবিতায় মিশে আছে বাংলার মোহাবিষ্ট প্রকৃতি– অন্ধকার রাত, শ্মশান, চিতা, মাটি, বালি, কাদা, সুপুরি গাছ, কালপুরুষ :

> বাঙালির মাটির অন্তরঙ্গ ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্ছ্বাস। বাঙালির নাড়ির নিবিড়তম ধ্বনি, রক্তের উষ্ণ শিহরণ। বাঙালি অনুধাবন করে তাদের জীবনের কাছাকাছি নিঃশর্ত অঙ্গীকারবদ্ধ জীবনের দোলায়মান সুখ-দুঃখের আলেখ্য। কখনো দক্ষিণবঙ্গের, কখনো উত্তরবঙ্গের গ্রামবাংলার সবুজ শিহরণ নদীর ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস একসঙ্গে মিশে যায় কবির ধমনীতে। (অনিন্দিতা ইসলাম, অন্য স্বর অন্য আলো : মোহাম্মদ রফিকের কবিতা, *কালি ও কলম*, পৃ. ২২)

নদীর কাছে গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্বের কাব্যিক প্রকাশ ঘটে বারবার। তিনি অন্তর দিয়ে অবলোকন করেছেন নদীপাড়ের মানুষের বেদনা :

১. কখনো গভীর রাতে ওরা টানে দাঁড়/জলকাদা ভেঙে মাঠে
ছপ্‌ছপ শব্দ ওঠে নিকটে কখনো দূরে (ডাকে, *বৈশাখী পূর্ণিমা*, পৃ. ২৪)

২. ছেলে নিলি স্বামী নিলি একটিমাত্র মেয়ে তাকে নিলি/কী আর করবি তুই বড়োজোর আমাকেও নিবি,
কার্তিকের ভোরবেলা বকুলের কান্নামাখা কুঁড়ি/পড়ে আছে, তার সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক ভারী গাঢ়;
(ই, *কীর্তিনাশা*, পৃ. ৬৬)

বাংলার প্রকৃতি, গ্রামীণ মানুষের প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনসংগ্রাম ও তাদের দারিদ্র্যঘেরা প্রাত্যহিকতার ভেতর কবির শিল্পচেতনা ফুটে ওঠে। কবির শিল্পবোধে লোকায়ত প্রকৃতি কখনো কখনো শরীরী অবয়বে আত্মপ্রকাশ করে। প্রেম, প্রকৃতি, লোকঐতিহ্য ও স্বদেশভাবনার সঙ্গে মোহাম্মদ রফিকের সংগ্রামী চেতনার উন্মোচন ঘটে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার দহনে। সমকালীন পীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত গণচেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটনে তিনি ব্যবহার করেন লোকায়ত পটভূমির এক বিস্তৃত ক্যানভাস। নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবাত্মার শাণিত প্রতিবাদের দুর্বার চেতনা তাঁর কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করে।

ষাটের দশকের কবিতায় মোহাম্মদ রফিকের গ্রামাভিগমন বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড় এলাকার জলবেষ্টিত গ্রামীণচিত্র। তাঁর কবিতায় আছে ঋজু জীবনের বহমানতা, অর্ধ-আচ্ছাদিত নারী, মরদ, জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গাভিঘাত, গ্রামীণ হাট-বাজার। তাঁর প্রকৃতিচিত্রণে বাংলাদেশের জলমগ্ন গ্রামীণ জনপদকেই অন্বেষণ করা যায়। গ্রামকেন্দ্রিক জীবন, অঞ্চলভিত্তিক চেতনার প্রতীক হয়ে রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তিনি এ ধরনের গ্রামীণ জনপদ তাঁর কবিতায় নিরীক্ষণ করেছেন। গ্রামীণ

মানুষের ভাঙন, জলকেন্দ্রিক জীবনের তীব্র সংগ্রাম, প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব, নদীর সর্পিল গতিভঙ্গি তাঁর কবিতায় এসেছে নানাভাবে :

> অস্থির গোঙানি ফিসফাস/সমস্ত অঞ্চল ভেঙেচুরে
> চাপা ত্রস্ত ছোটাছুটি, মানে/বান নয়, নদীতে লেগেছে টান
>
> (আ, *কীর্তিনাশা*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ৬৫)

মোহাম্মদ রফিকের কবিতা আবহমান বাংলা কবিতার সঙ্গে পারম্পর্য রক্ষা করেই চারিত্র্যমণ্ডিত। ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতার যে বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বহমান, তা থেকে মোহাম্মদ রফিকের কবিতার স্বাদ গন্ধ আলাদা। ষাটের দশকের কবিদের জীবন-দর্শন ও চেতনাগত বৈপরীত্যও তাঁর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় :

> মোহাম্মদ রফিক স্বপ্নবাজ নন, অস্তিত্বকেই প্রত্যক্ষময় করেন। ঐতিহ্য-ইতিহাস-লোকপুরাণকে উপাদান করে দৃশ্যমান বাস্তবকেই কবিতায় দৃঢ়মূল করেন। সেক্ষেত্রে মৃত্তিকাসংলগ্ন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই প্রধান। কোলাজরীতিতে অন্বয়হীন অনুষঙ্গ সেখানে গভীরভাবে ব্যঞ্জিত হয়। (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ১৪২)

গ্রামবাংলার নিসর্গপ্রকৃতির নতুন মাত্রা মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় ভেসে ওঠে। জীবনানন্দ দাশ, আল মাহমুদ এবং জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় পরিস্নাত হয়ে তিনি কবিতা নির্মাণ করেন। তাঁর কবিতায় গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক নিম্নশ্রেণির জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত। হাজার বছরের গ্রামবাংলার নিসর্গপ্রকৃতি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায় আধুনিক কাব্যপ্রকরণের মধ্যদিয়ে :

> মোহাম্মদ রফিকের দৃষ্টি অবহেলিত বিশাল বাংলার মানুষ, প্রকৃতি, গাঁথা-কিংবদন্তি, রূপকথা, পুরাণ একে একে তাঁর উপাদানে রূপ নিল কবিতায়। প্রকৃতি মানুষের দ্বিতীয় সত্তা হয়ে অচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকল সেখানে। (মহীবুল আজিজ, ষাটের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ১৬৪)

মোহাম্মদ রফিকের কবিতা থেকে প্রকৃতির সংস্থানকে বাদ দিলে তাঁর কবিতার মূল তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর গ্রামীণ প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন উপাদান না হয়ে মানুষের জীবনযাপন ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মোড় নেয়। তাঁর কবিতার ভেতর স্পষ্ট হয় উদোম গায়ে দাঁড়ানো নিসর্গাশ্রিত কৃষকের রূপ :

> হালের ফলায় লেগে ঝুরঝুরে বালি কিছু মাটি,/এখন ভাটার টান খালের ঘোলাটে ম্রিয়মাণ
> জলরেখা, সারাটা আকাশে আলো গলে-গলে ছায়া,/হালের বলদ একা ঘুরে ফেরে, একাকী কিষাণ
> দাওয়ার ফ্যাকাশে রোদে চুপচাপ মূঢ় জুবুথুবু;
>
> (কিষাণের দিনলিপি, *ধুলোর সংসারে এই মাটি*, পৃ. ৫১)

সারা গায়ে ধুলোমাটি মেখে মোহাম্মদ রফিক গ্রামবাংলার পথে-পথে, ঘরে ঘরে, ক্ষেত-খামারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আজো। জসীম উদ্‌দীন ও আল মাহমুদের পর ষাটের দশকের কবি মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় অনাদৃত গ্রামীণ জীবন বাণীরূপ লাভ করে। গ্রামে বসবাসরত হতশ্রী জীবনের প্রভূত

উপাদানে ভরা তাঁর কবিতা। গ্রামে বসবাসরত নারী, পুরুষ, মাঝি-মল্লা, কৃষক, বউ-ঝি উপেক্ষিত মানুষের জীবনও বাণীবদ্ধ হলো তাঁর কবিতায়।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টিসীমায় কবিরা জন্মস্থানকে অনুধাবন করে থাকে। নগরে বসবাস করেও গ্রামীণ জীবনের হালচাল উদ্ঘাটনে লোকজভাবনায় তাঁরা বিচরণ করেন। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় বাংলার লোক-প্রান্তর, গ্রাম্যজীবনের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ঘটছে অনায়াসে। সহজ সাবলীল গতিতে তিনি কৈশোরে ফেলে আসা জীবন এবং প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া নানা রকমের ঘটনার বর্ণনে কবি লোকসঞ্জাত বিষয়নির্ভর আটপৌরে শব্দ-বাক্য বা প্রবাদ-প্রবচন কবিতায় চয়ন করেছেন। তাঁর কবিতায় অজস্র আঞ্চলিক লোকজাত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : ক্যান, খইস্যা, গ্যাছে, গতরখাগী, চাপি, চোতের, ছিক্যা, জইম্যা, তর, থুয়ে, ফুডা, বইস্যা, বিয়োবে, মাইস্যা, মনিষ্যি, রাহে, হাথি, ল্যাজা প্রভৃতি। এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে মোহাম্মদ রফিক লোকজীবনের নিবিড় রূপ এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। মোহাম্মদ রফিক দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন :

> এ-বাংলার জীবনের করুণঘন পরিস্থিতি কখনো কোনো দারিদ্র্য অথবা জীবনযন্ত্রণার কাছে মাথা নত করে না। উঠে দাঁড়াতে চায় ঋজু ভঙ্গিমায় আপন উচ্চারণে, জীবনের তাৎপর্যময় চেতনার আঁধারে যে-ইতিহাস যে-চেতনা যে-স্মৃতি বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির অংশ। (উদ্ধৃত : অনিন্দিতা ইসলাম, অন্য স্বর অন্য আলো : মোহাম্মদ রফিকের কবিতা, *কালি ও কলম*, পৃ. ২৪)

জীবনের এই বলিষ্ঠতা লোককবি মোহাম্মদ রফিকের নিজের অন্তরের এবং বাঙালির আচরিত জীবনে মননে বারবার উঁকি দেয়। মোহাম্মদ রফিকের লোকজসুর সঞ্জাত কবিতায় বাঙালি জাতির দুর্দিনের জীবনবাস্তবতার গূঢ় ধ্বনি প্রতিভাত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্মলেন্দু গুণ

নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫) বহুমুখী ও উচ্চকিত কবি। রাজনীতি-সচেতন স্বভাবসিদ্ধ সহজিয়া সাধন পন্থার কবি তিনি। ষাটের দশকের দ্বিতীয় পর্বের অন্যতম কবি নির্মলেন্দু গুণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও গ্রামীণ জনপদ তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। মানুষ-মানবতার স্বপক্ষ উচ্চারণ কবির মৌল অঙ্গীকার। অকপট, স্বতন্ত্র, স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল, বহির্মুখী পরিপাটি এক কবিব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রথম কবিতার বই *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি গণ-আন্দোলনের পদাতিক হয়ে ওঠেন, রাজনৈতিক ভাষ্যকে অনুপম শিল্পে বন্দি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলোর নাম : *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* (১৯৭০), *না প্রেমিক না বিপ্লবী* (১৯৭২), *কবিতা, অমীমাংসিত রমণী* (১৯৭৩), *ও বন্ধু আমার* (১৯৭৫), *আনন্দ কুসুম* (১৯৭৬), *বাংলার মাটি বাংলার জল* (১৯৭৮), *তার আগে চাই সমাজতন্ত্র* (১৯৭৯), *চাষাভুষার কাব্য* (১৯৮১), *পৃথিবীজোড়া গান* (১৯৮২), *দূর হ দুঃশাসন* (১৯৮৩), *শান্তির ডিক্রি* (১৯৮৪), *ইস্‌ক্রা* (১৯৮৪), *প্রথম দিনের সূর্য* (১৯৮৪), *আবার একবার ফুঁ দিয়ে দাও* (১৯৮৪), *কেন নেই সেই পাখি* (১৯৮৫), *নিরঞ্জনের পৃথিবী* (১৯৮৬), *চিরকালের বাঁশি* (১৯৮৬), *দুঃখ করো না বাঁচো* (১৯৮৭), *যখন আমি বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই* (১৯৮৯), *ধাবমান হরিণের দ্যুতি* (১৯৯২), *অনন্ত বরফবীথি* (১৯৯৩), *আনন্দউদ্যান* (১৯৯৫), *প্রিয় নারী, হারানো কবিতা* (১৯৯৬), *শিয়রে বাংলাদেশ* (১৯৯৮), *আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি* (২০০০) প্রভৃতি।

নির্মলেন্দু গুণ সমাজ ও রাজনীতিমনস্ক, বাউল, আজন্ম অস্থির এক প্রেমিক কবি। আত্মমগ্ন, সহজ, স্বার্থপর, ভোগলিপ্সু, প্রেমাবেগপূর্ণ সেই সঙ্গে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে কবিতার বিষয়বস্তু করে তিনি তাঁর প্রজন্মের একজন পাঠক নন্দিত কবি। লোকজীবনাভিজ্ঞতা, সমাজমনস্কতা ও রাজনীতি সচেতনতা তাঁর কবিচৈতন্যের মূল বৈশিষ্ট্য। নির্মলেন্দু গুণ গীতিময়, অন্তর্মনস্ক, বিষণ্ন এবং নৈঃসঙ্গ্যবোধে নিমজ্জিত এক লিরিক কবি। সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত, ব্রীড়াহীন, অনলঙ্কার সরাসরি প্রকাশভঙ্গি, কবিতার ভাষায় লিরিকসজল মেদুরতা ও আন্তরিক উচ্চারণের জন্য তিনি তাঁর কালপর্বে এক অনস্বীকার্য নায়ক। প্রবেশলগ্নে এই কবি বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গণজাগরণের অনুষঙ্গকে ধারণ করেছেন তাঁর কবিতায়। এক পর্যায়ে নারীপ্রেমের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমকে অন্বিত করে আটপৌরে ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশের কবিতায় নির্মলেন্দু গুণকে বলা যায়, তাঁর এক হাতে 'আনন্দ-কুসুম' কিংবা 'অমীমাংসিত রমণী' তো অন্য হাতে 'সমাজতন্ত্র', যদিও নিজেকে তিনি পরিচয় দেন 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' বলে,

কিন্তু তিনি প্রেমিক এবং তিনি বিপ্লবীও। এই দুই সত্তার সমন্বিত রূপ তাঁকে নিমগ্ন করেছে চতুর্মুখী বৈচিত্র্যে। ফলে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, স্বল্পপরিচিত থেকে বহুল পরিচিত, নিকট থেকে দূর বহুবিচিত্র বিষয়ে পরিপূর্ণ তাঁর কাব্যভুবন। আবার এক সহজাত কবিস্বভাব তাকে সারাক্ষণ জীবনসংলগ্ন করে রাখে। জীবনের অপূর্ণতায় তাঁর বিষণ্নতা হয় কিন্তু আবুল হাসানের মতো আস্থাহীনতা-অবিশ্বাসের ঘূর্ণিতে পড়েন না তিনি। শামসুর রাহমানের কবিতার মতো নির্মলেন্দু গুণের কবিতাও এদেশের ইতিহাসের সমান্তরালে পা ফেলে চলছে।

ষাটের দশকের কবি নির্মলেন্দু গুণ লোকায়ত জীবনের ভেতর দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা না করে নিজস্ব মেধা ও মননের সমন্বয়ে তাঁর কাব্যজগৎ সৃষ্টি করেছেন। *নির্বাচিতা* সংকলনে নির্মলেন্দু গুণ তাঁর কবিতা সম্পর্কে নিজস্ব স্বীকারোক্তি করেছেন। সেটিকে পর্যালোচনা করলে কবির কবিতাচর্চায় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বোধগম্য হয় :

> কবির এই স্বগতকথন থেকে কবিচৈতন্যের যে-বৈশিষ্ট্যগুলো উন্মোচিত হয়, তা হলো, লোকজীবনাভিজ্ঞতা, সমাজমনস্কতা এবং রাজনীতিসজ্ঞানতা। এই তিন স্রোতের সাথে সমান্তরাল প্রবাহিত হয়েছে শিল্পের সেই অনির্বচনীয় যে উনিশ শতকীয় রোম্যান্টিকতার স্বভাবধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, (রফিকউল্লাহ খান, কবিতার সংগ্রাম, সংগ্রামের কবিতা, *কাশবন*, পৃ. ২৬)

বলা যায়, নির্মলেন্দু গুণ রোমান্টিক ও সংগ্রাম বা বিপ্লবী যাই হোক না কেন তিনি দুই ধারারই কবিতা লিখে গেছেন। যদিও তাঁর কবিতাকে তিনি না প্রেমিক না বিপ্লবী বলে স্বীকারোক্তি করেছেন তথাপি তিনি মূলত দুটি ধারাই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যার সত্যতা পাওয়া যায় :

> তাঁর রোমান্টিক নিদ্রা কাটে না বহুকাল। রিরংসাসঞ্জাত নারীভাবনা তাঁকে গ্রাস করে রাখে আমুণ্ডু। এবং যদিও একটি চোখ তাঁর জেগে থাকে ঐ ঘুমের ভেতরেও, যে চোখের ভেতর শুধু উপলব্ধি আছে এক পরিবর্তনশীল, অসহায় অস্থির মাতৃভূমির, তবু আরেকটি চোখ রাজ্য ও রাজনীতি থেকে যোজনদূর কোনো এক আসঙ্গনিবিড় নির্ঘুমতার মধ্যে ঘুম যায়। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ১২৩)

এই দুই ধরনের কবিতা তিনি সমানভাবে লিখে গেছেন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে নির্মলেন্দু গুণের কাব্যে গ্রামীণ ও লোকজবিষয়ের আবহ বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। কবি নির্মলেন্দু গুণ *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* কাব্যগ্রন্থের 'হুলিয়া' কবিতায় দেখিয়েছেন বাস্তব জীবনের নানা অনুষঙ্গ, যেখানে কবির অনেক দিন পর গ্রামে ফিরে আসা এবং অতীত ও বর্তমানের যুগলে তাঁর লোকজীবনাভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পসম্মত চিত্রকল্পে রূপদান :

> দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি।
> সেই একই ভাঙাপথ, একই কালো মাটির আল ধরে

গ্রামে ফেরা, আমি কতদিন পর গ্রামে ফিরছি। (হুলিয়া, *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, নির্বাচিতা, পৃ. ২৭)

নগর থেকে সাময়িকভাবে ফিরে আসা কবি বহুদিন পর মরচে পড়া দরজা টোকা দিতেই প্রতীক্ষারত স্নেহময়ী মা তাঁকে অশ্রুসিক্ত চুমুতে ভরিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চাল ধুতে যায় বাড়ির পাশের কোনো পুকুরে এবং সেই সঙ্গে :

> লোকায়ত জীবনের নানা অভিজ্ঞানে ঋদ্ধ কবির শিল্পচেতনা লোকজীবনাভিজ্ঞতার পটভূমিতেই সামাজিক বাস্তবতার ছবি আঁকে। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩০৮)

যার বাস্তবসম্মত উদাহরণ নিচের চরণগুলোতে চমৎকারিত্ব লাভ করে :

> পুকুরের জলে চাল ধুতে গেলেন; আমি ঘরের ভিতরে তাকালুম,
> দেখলুম, দু'ঘরের মাঝামাঝি যেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি ছিল
> যেখানে লেনিন, বাবার জমা-খরচের পাশে কার্ল মার্কস;
> আলমিরার একটি ভাঙা-কাচের অভাব পূরণ করছে
> ক্রুপস্কায়ার ছেঁড়া ছবি। (হুলিয়া, *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, নির্বাচিতা, পৃ. ২৯)

বহুদিন পর তাঁর নিজ গ্রামে ফিরে আসাকে যেন চারপাশের গাছপালা থেকে শুরু করে, মাছ-সাপ সবকিছুই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সময়ের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনের আলেখ্যে কবি রাজনৈতিক বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন। বিরূপ সময়কে তিনি দেখিয়েছেন উড়ন্ত এরোপ্লেনের উড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে :

> পুকুরের জলে শব্দ উঠলো মাছের, আবার জিভ দেখালো সাপ,
> শান্ত-স্থির-বোকা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে
> একটি এরোপ্লেন তখন উড়ে গেলো পশ্চিমে....।
> আমি বাড়ির পেছন থেকে শব্দ করে দরোজায় টোকা দিয়ে
> ডাকলুম, 'মা'। (হুলিয়া, *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, নির্বাচিতা, পৃ. ২৮)

নির্মলেন্দু গুণ শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে, তাই এই কৃষিপ্রধান কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। কবি *চাষা ভুষার কাব্য* গ্রন্থের 'প্রলেতারিয়েত' কবিতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আবহে অবহিত হয়ে শিল্পরূপ দান করেছেন :

> হৃদয় সংরাগ ও রাজনৈতিক চেতনায় জারিত কবির শিল্পবোধে কৃষিভিত্তিক শ্রমজীবী মানুষ উজ্জ্বলতর মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। (মুহাম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩০৯)

এখানে কবির সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিটিও পরিস্ফুট :

> যতক্ষণ তুমি কৃষিকের পাশে আছো/যতক্ষণ তুমি শ্রমিকের পাশে আছো
> আমি আছি তোমার পাশেই। (প্রলেতারিয়েত, *চাষা ভুষার কাব্য*, নির্বাচিতা, পৃ. ১৫৯)

মানবতাবাদী কবির কাছে এই চাষাভুষা, কৃষক, দিনমজুর, রাখালশিশু এরাই খাঁটি মানুষ, এদের জীবন সংগ্রামই প্রকৃত সংগ্রাম। এই শ্রমজীবী মানুষগুলোর জীবন বাস্তবতার আলেখ্যে কবি কবিতার মধ্য দিয়ে বাস্তব চিত্রকল্প অত্যন্ত দক্ষ শিল্পীর মতো এঁকেছেন যা শিল্প সম্মত :

এই যে কৃষক বৃষ্টি জলে ভিজে করেছে রচনা/সবুজ-শস্যের এক শিল্পময় মাঠ,
এই যে কৃষক বধূ তার নিপুণ আঙুলে/ক্ষিপ্র দ্রুততায় ভেজা পাট থেকে পৃথক করেছে আঁশ:
এই যে রাখাল শিশু খর রৌদ্রে আলে বসে/সাজাচ্ছে তামাক আর বারবার নিভে যাচ্ছে
তার খড়ে বোণা বেণীর আগুন/তুমি সেই জীবনশিল্পের কথা লেখো।

(প্রলেতারিয়েত, *চাষাভুষার কাব্য*, নির্বাচিতা, পৃ. ১৫৯)

ক্ষেত খামারে খেটে খাওয়া মানুষ যাদের চাওয়া খুবই সীমিত। সামান্য মাটির পাত্র ও একটু মরিচ ও রসুনের তরকারী আর স্ত্রির হাতের তৈরি করা বেনুন বাস এইটুকুই একজন কৃষকের কাছে অমৃত, যেন রাজ ভোজ। ভূমিহীন এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর এই দুরবস্থাতার জন্য শোষক শ্রেণী দায়ি। বেআইনীভাবে গরিবের জমি আজ দখলদারদের অধীনে আর সেই জমি খালাসের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে যার বাস্তব উদাহরণ অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে লোকায়ত জীবনের ভেতর দিয়ে কবি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছন :

বলদে ঘোরায় গাড়ির চাক্কা,/নারীর চাক্কা স্বামী-;
আইনের চাকা আমারে দেখাও/সে চাকা ঘুরামু আমি।

(খেত মজুরের কাব্য, *পৃথিবী জোড়া গান*, নির্বাচিতা, পৃ. ১৮৭-১৮৮)

অর্থাৎ, কবি তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ের গভীরতায় অনুভব করেছেন এই খেত মুজুর, চাষাভুষা, কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ কষ্ট। তিনি নিজ হৃদয়ের পেলবতা দিয়ে তাদের দুঃখকে নিজের করে নিতে পেরেছেন বলেই এমন সুন্দরভাবে গ্রামের হত দরিদ্র কঠিন পরিশ্রমী মানুষের জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। শুধু তাই নয় শোষকের হাত হতে ভূমিহীনদের জমি যেন উদ্ধারে তিনি সদা সচেষ্ট, তেমনি অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে কৃষকদের ফসল রক্ষার তাগিদ কবিকে স্থিরতা দেয়নি। বন্যাকবলিত খরা বিনষ্ট ফসল যেন বিধ্বংসী করেছে কৃষকের স্বপ্ন কিন্তু হাজার বিপর্যয়েও বাংলার কৃষক পরাভূত নয়, তাদের জন্ম সৃষ্টির নেশায় তাই তারা বিজয়ী শিল্পী তাদের স্বপ্ন তাদের বেঁচে থাকার হাতিয়ার, সংগ্রামই জীবন। নির্মলেন্দু গুণের কাছে এই অপরাজিত শস্য শিল্পীই যেন এক একজন সংগ্রামের প্রতীক :

শতাব্দীর অদেখা খরায় পুড়ে গেছে/যে মাঠের বিভা, তার শেষ প্রসাধনে ব্যস্ত
কৃষকেরা দু'হাতে মাঠের মুখে মাখে স্বপ্ন,/সবুজ সফেদা; মাটি তার আপন শরীর,
-এই খরা কবলিত শস্য তার প্রাণ। (খরা ও কৃষক, *তার আগে চাই সমাজতন্ত্র*, কাব্যসমগ্র-১ পৃ. ২৮৪)

মানব দরদী কবি নির্মলেন্দু গুণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় পর্যবসিত। তিনি ধর্ম বর্ণ জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে জয়গান গেয়েছেন সাম্যের। সবাই তাঁর কাছে সমান এখানে কবি মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি নতুন-পুরাতন সবকিছুরই জায়গা করতে চেয়েছেন। গ্রামীণ ও শহরের মিশেলে তৈরি করতে চেয়েছেন এমন এক কৃষিনির্ভর সমাজ যা থেকে আমাদের হারানো ঐতিহ্য 'লাঙ্গল-কোদাল' যেন টিকে থাকে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার পাশাপাশি। শুধু তাই নয় গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর সঙ্গে শহুরে নরনারী মিলেমিশে একাত্ম হয়ে কাজে যেন এগিয়ে আসে সেই সুন্দর সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর কবি *বাংলার মাটি বাংলার জল* কাব্যগ্রন্থের 'আলগুলো ভেঙ্গে ফেলবো' কবিতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। গ্রামবাংলার চিরায়ত লোক-উৎসব, আচার অনুষ্ঠান, নৃত্যকলা প্রভৃতি নানা ঐতিহ্যনির্ভর পথ ধরে তিনি কবিতায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। কবি বারবার সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছেন আমাদের এই বাংলাদেশের জমিন যেন একটাই হয়। আর সেটি হলো মানবতার, সেই সঙ্গে পুরো পৃথিবীকে তিনি এক হয়ে একটি মাত্র বিন্দুতে মিলিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন :

১. একদিন নিশ্চয়ই আমাদের পৃথিবী আর এরকম থাকবেনা,
একদিন নিশ্চয়ই বহু মানুষের স্বপ্ন এসে একটি বিন্দুতে মিলবে।

(তার আগে চাই সমাজতন্ত্র, *তার আগে চাই সমাজতন্ত্র*, পৃ. ১৫২)

২. একটি মাত্র শস্যক্ষেত থাকবে, বাংলাদেশ।
আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আমরা চাষ করবো ট্রাক্টরে-লাঙলে
কোদালে, 'উলটপালট করবো কালো মাটি'
সাড়ে সাত কোটি হাত নতুন শস্যের বীজ বুনবে।

৩. মখমলের মতো নরম পায়ে মাখবে কালো কাদার আলতা,
খোঁপায় গুঁজবে নতুন ধানের শীষ। আমরা সবাই মিলে
ফসল তোলার উৎসব করবো, গান গাইবো, নৃত্য করবো।

(আলগুলো ভেঙে ফেলবো, *বাংলার মাটি বাংলার জল*, কাব্যসমগ্র- ১, পৃ. ২৬৭-২৬৮)

আশাবাদী কবি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুস্থ সুন্দর বসবাসের উপযোগী একটি আবাসন কল্পনা করেন, লোকঐতিহ্য নির্ভর গ্রামকে স্মরণ করেই যেখানে ফুলে ফলে, হলুদে সবুজে মিলেমিশে এক প্রশান্তি বিরাজ করবে। সেখানে পাখির ডাকের মুখরতায় ভোর হবে। নিজস্ব ঐতিহ্য গ্রামীণ সজিবতাকে রক্ষা করেই মঙ্গলময় পথের সন্ধানই হবে বিশ্ব শান্তির। কবির ভাষায় :

আজ চাই বিশ্বজুড়ে অব্যাহত শান্তির মিছিল।
শত-শত, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি শান্তির মিছিল
কবি, শিল্পীর, বৈজ্ঞানিকের, বৃদ্ধিজীবীর,
কৃষক-শ্রমিকের; প্রয়োজনবোধে পাখিও ফুলের।

কেননা, এই সুন্দর পৃথিবী তো আমাদের,
আমরা ভালোবাসি এই আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবীকে।

(শান্তির ডিক্রি, *শান্তির ডিক্রি*, নির্বাচিতা, পৃ. ২২৯)

লোকায়ত জীবনের হাতছানি কবিকে টানে বারবার। কবির মনের কুঠরিতে প্রতিদিন কড়া নেড়ে জানান দেয় তাঁর গ্রামীণ জীবনের নিত্যদিনের চলাফেরা ওঠা-বসা। কবি 'সাতই আষাঢ়' কবিতার ভেতর দিয়ে মনের সব আকুতি নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করেছেন পাতায় পাতায়। গ্রাম, গ্রামের কাদামাটি, কাশবন, আঁতুর ঘর, ঘুরে ফিরে আসে তার চেতনায়। কবির মন ও মননে মিশে আছে তাঁর আদরের গ্রাম গ্রামীণ জীবন ও লোকাচার, সেই গভীর টানকে তিনি অনুভব করেন তাঁর অস্তিত্বের অতলে :

সাতই আষাঢ় আমাকে দু'হাত ধরে
টেনে নিয়ে গেলো মফস্বলের ঐ কাদাভরা পথে,
কাশবনের ছিন্নকুটিরে, যেখানে আমার জন্ম,
আমার আঁতুড়ঘরের ভেজা মাটি।
অচেনা পাখির বিচিত্র সঙ্গীতে মুখরিত
প্রদোষবেলায় প্রথম চিৎকার এখনো সেখানে
ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে,
খুঁজে বেড়ায় সাতই আষাঢ়ের এ কবিকে।

(সাতই আষাঢ়, *দূর হ দুঃশাসন*, নির্বাচিতা, পৃ. ২০৫)

জীবিকায় প্রয়োজনে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাসরত নির্মলেন্দু গুণের অন্তরের ভেতর সাজানো লোকঐতিহ্যের নানা দিকগুলো। লোকায়ত জীবনের রসে বেড়ে ওঠা কবি কখনোই গ্রামকে ভুলে থাকতে পারেন না যার প্রমাণ পাওয়া যায় কবিতার ভেতর তাঁর মানস প্রবণতায়। মানবতাবাদী কবি জীবন বাস্তবের টানাপোড়েনকে মেনে নিয়ে রাজনীতি, রোমান্টিকতা ও লোকাচারের মিশেলে শিল্পসম্মতরূপে তাঁর কাব্যকে উপস্থাপনায় প্রয়াস পেয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবুল হাসান

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) ষাটের দশকের মধ্যলগ্নে বাংলা কাব্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বকীয় কাব্যভুবন। আবুল হাসানের জীবন পরিসর যেমন ছোট তেমনি তাঁর কবিজীবন পরিসরও। তাঁর কাব্যগুলোর নাম হলো : *রাজা যায় রাজা আসে* (১৯৭২), *যে তুমি হরণ করো* (১৯৭৪), *পৃথক পালঙ্ক* (১৯৭৫), *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (১৯৮৫)। মধ্যষাটে শুরু এবং মধ্য-সত্তরের অকাল অন্তিম-যাত্রা পর্যন্ত। অর্থাৎ, বছর দশেকের কবিজীবন তাঁর। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় আবুল হাসানের কবিতা একটি অনন্য সংযোজন। আমিত্ব, আত্মতা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিহিত ছিল তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পীসত্তার মৌল পরিচয়। আত্মগত ভাবনার শিল্পপ্রতিমা নির্মাণই ছিল তাঁর মৌল-অন্বিষ্ট। আবুল হাসান শান্ত, ধীর প্রকৃতির এবং হতাশায় বিবর্ণ :

> সংক্ষুব্ধ যুগচৈতন্য এবং বৈনাশিক সমাজ-মর্মমূলে শিকড় সঞ্চার করে নির্মিত হয়েছিল আবুল হাসানের শিল্পীসত্তা। মানবিক সম্ভাবনার নান্দীপাঠে এবং সদর্থক জীবনবোধের ঔজ্জ্বল্যে তাঁর রচনা-সম্ভার বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় সংযোজন করেছে প্রাতিস্বিক মাত্রা। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, *আবুল হাসান*, পৃ. ১২৭)

ষাটের দশকের অন্যতম প্রতিভাবান স্বল্পায়ু কবি আবুল হাসান। ষাটের দশকের ক্রান্তিকালে যখন অন্যান্য কবি মোটামুটি পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত; রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে নিজেদের দোলাচল অবস্থান; ঠিক সেই সময়ে আবুল হাসান একদম নিজের ভেতর ডুব দিয়ে নিমগ্ন থেকে বাস্তবতার গ্রাসে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গ্রামীণ ও লোকজজীবনের প্রতি স্বপ্নময়তায় ভেসেছেন। তিনি প্রচণ্ড আবেগতাড়িত কবি। এই দশকের কবিতাগুলো যখন অবক্ষয়ের চরম অবস্থায় উত্তরণ ঘটে, তখন আবুল হাসানের কবিতা স্বস্তির আহ্বান আনে মনে। স্বপ্নচারী কবি স্বপ্নতে বুঁদ থেকে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে আশ্রয় নেন স্মৃতিরোমন্থন ও আকাঙ্ক্ষার গ্রাম এবং মানুষের সহজ সরল জীবনের প্রতি। তাঁর কবিতার মূল বিষয় হয়ে ওঠে প্রত্যাবর্তন বা ফিরে যাওয়া মাটির কাছে। যে শৈশব এ তাঁর ফেলে আসা গ্রাম, গ্রামের মাটির ঘরবাড়ি, মানুষ ও গাছপালার অপার মেলবন্ধন সেখানে তাঁর কবি মানস লুকায়িত, তিনি শহরের এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত কবির হৃদয় তবু বাস্তব সত্য জীবন জীবিকার তাড়নায় তাঁর আর ফেরা হয় না। কিন্তু মনকে তো আর বোঝানো যায় না, কি করে ভুলে যাবেন সেই সোনা গলানো রৌদ্রের ছটার খুব সহজ-সরল দুর্লভ দিনগুলো। নিস্তব্ধ একাকিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে কবির মনে পড়ে যায় কঠিন বাস্তবতা। ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্গত রক্তক্ষরণ তাঁর কবিতায় অপরূপ ভাষ্যে উন্মোচিত হয়েছে।

একাকিত্বের বেদনায় নীলকণ্ঠ হয়ে তিরিশ দশকের শক্তিমান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো তিনি লেখেন :

অবশেষে জেনেছি মানুষ একা!
জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!
দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে কোনোদিন!

(পাখি হয়ে যায় প্রাণ, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ১৯)

কবিতা যে শুধু জীবনবাস্তবতার পিণ্ড নয়, অথচ সেই পিণ্ড থেকেই যে কবিতায় শিল্পের দ্যুতি ছড়ানো সম্ভব হয়, আবুল হাসানের কবিতায় তার প্রমাণ বহমান।

আবুল হাসান নাগরিক কবি হলেও তাঁর কবিতায় গ্রামীণ সৌন্দর্যবোধ ও সম্পর্ক মূল্যায়িত হয়েছে গভীর সমবেদনায়। জীবন বাস্তবতায় নাগরিক হলেও আবুল হাসান গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবলভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ। গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মরমিয়া টান তিনি অনুভব করেন। অন্তঃসারশূন্য নগর সভ্যতা কবিকে কিছুই দেয়নি। বৈশ্যবৃত্তির কারণে শহর নগর বন্দর সম্প্রসারিত হলেও আবুল হাসান তাঁর চেতনার দ্বন্দ্বটিকে প্রকট করে তুলেছেন কবিতায়। তাঁর অপার দুঃখবোধের সঙ্গে গ্রাম-বিচ্ছিন্নতাও সক্রিয়। গ্রামীণ স্মৃতিময় অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় একান্ত ব্যক্তিকতায় নির্মিত হয় :

মনে পড়ে সরজু দিদির কপালের লক্ষ্মী চাঁদ তারা
নরম যুঁইয়ের গন্ধ মেলার মতো চোখের মাথুর ভাষা আর
হরিকীর্তনের নদীভূত বোল! (পাখি হয়ে যায় এই প্রাণ, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ২০)

আবুল হাসানের কবিতায় ডাইনির মতো বাঁকা চাঁদ গ্রামীণ রূপকথার জগতের অশুভ ও ভৌতিক আবহকে স্মরণ করায় :

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
নইলে ডাইনীর মতোন কেন কোমর বাঁকানো
একটি চাঁদ উঠবে জ্যোৎস্নায়
উলুকঝুলুক গাছ, (একটা কিছু মারাত্মক, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ৪৪)

ষাটের দশকের কবিদের কবিতায় পল্লিজীবনের চিত্র ব্যবহৃত হলেও তা প্রায়শ তাঁদের নগরচেতনার সঙ্গে অকৃত্রিমতা হারিয়েছে। নগর থেকে গ্রামে ফেরার আকুতি কারো কারো কবিতায় ব্যাপক হলেও সৃষ্টি হয়েছে ভগ্নরেখ। কারণ, শহুরে জীবনের অভ্যস্ততায়, পূর্বেকার গ্রামীণ জীবনস্পন্দনের সম্পর্কে চিড় ধরে গেছে। যে অবস্থানে কবিরা একদিন গ্রামকে ছেড়ে গিয়েছিল, সেখানে রয়েছে দীর্ঘ বিচ্ছেদ। আবুল হাসানের কবিতায় শহুরে জীবনের অভিযোজন-ব্যর্থ, হতাশা ও অপ্রাপ্তির অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ কবিসত্তা তাই গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে চান :

আমি আবার ফিরে এলাম,

স্নিগ্ধ কাক, আলাপচারী তালচড়াই

আমাকে আজ গ্রহণ করো। (প্রত্যাবর্তনের সময়, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ৩৭)

শহরের নিরেট কাঠিন্য, নগরসভ্যতা কবিকে শুধুই দিয়েছে নিখিল নাস্তি। সুবিধাবাদী মানুষের ভিড়ে অধিকাংশ মানুষ অসহায়। তাই কবি অকৃত্রিম গ্রাম-ভূমির নিসর্গে ফিরে আসেন। গ্রামীণ সুশীতল জীবন অতিবাহিত করে হঠাৎই ছন্দপতন ঘটায় কবির জীবনের শহুরে কঠিন বাস্তবতা। কবির মনোজগতে চলতে থাকে এক অস্থির উন্মাদনা– ফেলে আসার, ছেড়ে আসার বেদনা, তাঁর কবিতায় বিশিষ্টতায় রূপ পরিগ্রহ করে। কবি-সমালোচকের উক্তি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য :

> আবুল হাসানের বিশিষ্টতার অন্য একটি কারণ হলো তাঁর কবিতার তীব্র আবেগ-আশ্লেষ এবং স্বপ্নচারিতার অনিঃশেষ উৎসারণ। একটি জন্মান্ধ এবং দিব্যদৃষ্টিরহিত সময়ে তাঁর কবিতার উন্মোচন। যখন কবিতা যৌনতা, অনিকেতনচেতনা ও আত্মধ্বংসী স্বমেহনের আময়কে গিলে গিলে ফেপে উঠছিল, তখন তিনি তাঁর অন্তহীন স্বপ্নচারিতা নিয়ে আসেন। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ১০০)

ইট কাঠের দেয়ালের মতো শহুরে মানুষগুলোর মধ্যে স্বার্থপরতা আর কঠিন বাস্তবতা কবি হৃদয়ে আঘাত হানত। কবির মানস গঠনে গ্রামীণ ও লোকজ সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি মেনে নিতে পারেন নি এই কংক্রিটের শহর ও মানুষগুলোকে। সেই কারণেই কবির অন্তর জুড়ে রয়েছে তাঁর স্বপ্নের গ্রাম, ভুবন ভাঙ্গার গ্রাম, সেখানে ফিরে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছে প্রসঙ্গে :

> ঐ সব পিছে রেখে ডানে এগুলেই একটি গ্রামের ভিতর/দেখতে পাবে খড় এনে আজো ঘর বাঁধছে ঘরামী!
> তিনটি রমণী তার কাঁখে নিয়ে ত্রিকালের জলের কলস/হেসে হেসে বাড়ী ফিরছে, বাড়ী ফিরছে, বাড়ী...
> (ভুবন, ডাঙ্গায় যাবো, *যে তুমি হরণ কর*, পৃ. ৭৮)

লোকজীবনের প্রতি অত্যন্ত আবেগঘন ছিল কবির মানসপ্রকৃতি। তাঁর কাছে শহুরে জীবন মানে প্রাণহীন নির্জীব, নিস্তব্ধতা। প্রাণহীন শহর, মানে শবসম শহর যা কবিকে কখনো টানেনি। মনের মধ্যে ঢুকতে পারে নাই। তাঁর স্বপ্নায়ু চোখে রোমান্টিকতায় বারবার ফিরে আসে প্রিয় লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ আবহ, যেখানে খুব সহজ-সরল মানুষের বিশ্বাস, লোক বিশ্বাস যা লোকসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে আবুল হাসানের কবিতায় :

আমার বোনটি যেই বারান্দায় দাঁড় কাক ডাকলেই/বলে ওঠে, ভাই-

গুণে গুণে সাতটি চাল ফেলে দে তো কাকটার মুখে?/চালের গন্ধ পেয়ে দেখিস কাকটি উড়ে যাবে,

আমাদের বিপদ আসবে না;/আমি সেই অশুভ কাকের মুখে গুণে গুণে

সাতটি চাল ফেলে দেই,/আমি ফের সকল বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করি!

(একমাত্র কুসংস্কার, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ৪০)

অশুভ থেকে মুক্তির লাভে সাতটি চাল ফেলে যেমন লোক ভাই তার বোনের কথা শোনে তেমনি আবার পেঁচার ডাকে লক্ষ্মীর আগমন বার্তা ও বিড়ালের হাই তোলার সাথে অতিথির আগাম আগমনের ইঙ্গিত বহন করে :

এখনো পেঁচার ডাকে কেউ কেউ লক্ষ্মীর আগমন টের পায়!
বিড়ালের হাই তোলা হাত দেখে
গৃহিণীরা আজো অনেকেই অতিথির ভাত তুলে রাখে! (একমাত্র কুসংস্কার, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ৪০)

এই সব লোকাচার বা লোকবিশ্বাস অনেকের মতে কুসংস্কার কিন্তু কবি সেই তর্কে না গিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত হৃদয় বাঁধা পড়ে লোকবিশ্বাসের অটুট বন্ধনে :

কে সেই অতিথি? কে সেই বিড়াল হাত আঁচায়, অন্ধকারে
কে সেই সুন্দর পেঁচা যার ডাকে লক্ষ্মী চলে আসে?
এসব প্রশ্ন থাক, তার চেয়ে এই যেন হয়? (একমাত্র কুসংস্কার, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ৪০)

এ পর্যায়ে দেখা যায় তাঁর কবিতার মধ্যে লোক উপাদানগুলো অনেক আদরণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর অস্তিত্বের কাছে মননের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এই গ্রামবাংলার নিত্যদিনকার ব্যবহার্য্য জিনিস পত্রাদির মধ্যে তাঁর মুক্তির আস্বাদ। তিনি তাঁর ভালোবাসার সবটুকু দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন তাঁরই অতি পরিচিত-বস্তুগত দ্রব্যাদির প্রতি। কবির মনস্তত্ত্বে বারবার উচ্চারিত হয়েছে :

তাইতো আমি ফিরে এলাম, আমাকে নাও/আমাকে আজ গ্রহণ করো,
মাছের আঁশটে, হলুদ রৌদ্রে ভাড়ার ঘরের নুন মরিচ আর/মশলা পাতা গেরুয়া ছাই, শালিধানের গন্ধ তুমি,
ভেজা মাটির বৃষ্টি তুমি গ্রহণ করো আমাকে নাও, আমাকে নাও!

(প্রত্যাবর্তনের সময়, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ৩৮)

শুধু তাই নয় তাঁর কবিতায় আরো আপন করে উঠে এসেছে :

কবিতায় ব্যবহৃত কাঠের বউনি, মানকচু, ভাতের ঢাকুন, নুন, নোনামাখা চাল, সকলই লোক-সংসারের উপকরণ। এ-সব সাংস্কৃতিক সম্পদের ব্যবহার এমনই নিত্য যে, জীবন থেকে এদের আলাদা করা যায় না। (মাহবুব হাসান, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান*, পৃ. ১৬৮)

ফেলে আসা শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার স্বপ্নভাবাপন্ন রোমান্টিক হৃদয়ের ভেতর তিনি তাঁর মূল, শহুরে মাটিতে বিশেষ করে কংক্রিটের পাথরে স্থাপনে অপারগ। তার মর্মমূলে প্রতিনিয়ত চলে ফিরে যাওয়ার দুঃখময় কিন্তু স্বপ্নীল প্রস্তুতি :

কেবল দিব্যতা দুষ্ট শোণিতের ভারা ভারা স্বপ্ন বোঝাই মাঠে দেখি,
সেখানেও বসে আছে বৃক্ষের মতোন একা একজন লোক,
যাকে ঘিরে বিশজন দেবদূত গাইছে কেবলি
শত জীবনের শত কুহেলী ও কুয়াশার গান!
পাখি হয়ে যায় এ প্রাণ ঐ কুহেলী মাঠের প্রান্তরে হে দেবদূত!

(পাখি হয়ে যায় প্রাণ, *রাজা যায়, রাজা আসে*, পৃ. ২১)

গ্রামের মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে নিজের মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব সত্য উপস্থাপনে বিন্দু পরিমাণ সংশয় রাখেন নাই কবি আবুল হাসান। সহজ-সরল মানুষগুলো যত উচ্চপদস্থ পদে অধিষ্ঠ হন না কেন সেই মানুষগুলো কিছুতেই প্রভাব প্রতিপত্তি ঘটাতে পারেন না তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন কবি। সেই সাথে সম্পর্কের স্বাভাবিক গতি ঠিক রাখতে কবির বাবা ধূলো মোছার মত সম্পর্ক থেকে সব আবরণ মুছে দিতেন যা সম্ভব ঐ পল্লি গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষের উদার মানসিকতায় যা শহুরে জীবনে অনুপস্থিত :

১. আসলে আমার বাবা ছিলেন নিম্নমানের মানুষ
নইলে সরকারী লোক, পুলিশ বিভাগে চাকরী কোরেও
পুলিশী মেজাজ কেন ছিল না ওনার বলুন চলায় ও বলায়?

২. থানার যত পেশাধারী, পুলিশ সেপাই অধীনস্থ কনস্টেবল
সবার তিনি একবয়সী এমনভাবে তাস দাবাতেন সারা বিকেল।

(চামেলীর হাতে নিম্নমানের মানুষ, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ২১)

আবুল হাসানের মন ও মননে মিশে ছিল লোকসংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে শহরের চারপাশটা কেমন খাপছাড়া বিচ্ছিন্নতা প্রায়সই লক্ষ্য করেন যা কিনা অশুভ ইংগিত বহন করে। আর সেই অশুভ ইঙ্গিত কবি পান 'নইলে নয়টি অমল হাঁস থেঁতলে যায় ট্রাকের চাকায়' এর ভেতর দিয়ে যা তার নিঃসন্দেহে লোকবিশ্বাসের মানসিকতা বহন করে :

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
নইলে কিশোর চেনেনা কেন ঘাসফুল? ঘাস কেন সবুজের বদলে হলুদ?
একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
নইলে নয়টি অমল হাঁস
থেঁতলে যায় ট্রাকের চাকায়? (একটা কিছু মারাত্মক, *রাজা যায় রাজা আসে*, পৃ. ৪৪)

আবুল হাসান শহুরে কবি হলেও তাঁর মনের একান্ত চাওয়া প্রিয় গ্রাম ভুবন ডাঙ্গায় প্রত্যাবর্তন :

গ্রামজীবন, তার রূপশালি ধান, শীতল পাটির স্নেহ, সরল নদীর গ্রাম, গাছপালা, মাছ, বেদে, মাঝির বহর, যন্ত্রণাদগ্ধ কবির চোখে অনিঃশেষ শান্তির সম্ভাবনা হয়ে ওঠে। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ১১১)

শুধু তাই নয় শহুরে জীবনের মুখোশ পরা মমতা ও নিঃসঙ্গ জীবনের একাকীত্ব তাঁর অনুভূতি প্রবণ মনকে পীড়া দেয়। সেই জন্য দেখা যায় শহুরে মানুষগুলো যখন নিজেদের স্বার্থ নিয়ে একে অপরের বিনাশে উন্নীত তখন আবুল হাসানের নির্ভরতার জায়গা গ্রাম ও গ্রামের সরল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহ। ভালোবাসায় ভরপুর ভাই-বোনের স্নেহের মতো আগলে রাখা গ্রাম কবিকে গ্রামীণ জীবনের হাতছানি দেয় বারবার।

১. বহুদূরে ট্রেনের হুইসেল, যায় দিন যায়!/বোনের মতোন এক লাজুক পাড়া গাঁ তার
ডাক শুনে থাকে অপেক্ষায়/তবু ভাই ফেরে না, ফেরে না!
২. লাজুক পাড়া গাঁ তার নিসর্গের বারান্দায় তবু বসে থাকে অপেক্ষায়

(সে আর ফেরে না, *যে তুমি হরণ করো*, পৃ. ৭৫)

আসলে ফেরার আকুতি আছে কিন্তু ফেরা হয় না। আর অপেক্ষারও শেষ হয় না। এভাবে দিন ফুরিয়ে বছর, বছর ঘুরে যুগ পার হয়ে যায় কিন্তু অপেক্ষার প্রহর অনন্তকাল। এই না ফেরার বেদনা কবিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। এই দুঃখবোধে আক্রান্ত কবি আবুল হাসান। তিনি গ্রামকে একাগ্রচিত্তে না আঁকতে পারলেও তাঁর কবিতায় রয়েছে মাটির টান ও শিকড়ের দিকে ফিরে চাওয়া :

> হাসান তাঁর কবিতায় গ্রাম জীবনের চিত্র নিষ্ঠার সাথে আঁকেননি। শুধু চকিত অবলোকনের মতো, যেন নগর-সন্ত্রাসের সম্ভাব্য নিদান হিসাবে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ভুলে যাওয়া শৈশবের মতো এক করুণ-আর্দ্র পল্লীর মুখ। (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ১১২)

তথাপি এই চকিত অবলোকনই মূল অবলম্বন হয়ে তাঁর কবিতার বিশেষ বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আবুল হাসান এই মানসিকতার কাছে আশ্রয় নেন বারবার। কবি আবুল হাসানের এই আশ্রয় কেন্দ্রিক মানসিককতার প্রভাবেই তিনি মুক্তি পান শহুরে পঙ্কিলতাময় জীবন থেকে। শান্তির ও স্বস্তির জায়গা খুঁজে পান অতীত স্মৃতিময় গ্রামবাংলার বুকে। গ্রামের প্রতিদিনকার ছোট ছোট ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে সেই গ্রামীণ আবহ আচার, রীতিনীতি, প্রশান্তিময়তা বারবার অনুরণিত হয় তার কবিতার আত্মায় :

দেখি কাঁথায় সেলাই দিয়ে বলছে ওরা-'ও বড় বউ,
তোমার শুভ বিবাহে বড় শোভন গাভী পেয়েছিলাম
কাঁসার গেলাস, চন্দনের বাক্স, শাদা এই সমস্ত, ফিরে তাকাই
ফেলে আসা সকল সীমার মধ্যে আবার ফিরে তাকানো।

(আবার আমার ফিরে তাকানো, *অগ্রন্থিত কবিতা*, পৃ. ১৬৪)

আবুল হাসান অত্যন্ত দক্ষ শিল্পীর মতো চিত্রকল্প এঁকেছেন কৃষিনির্ভর জীবনকেন্দ্রিক মানুষগুলোর জীবন্ত শিল্পরূপ। এই রূপকল্পের মধ্য দিয়ে উঠে আসে পরিশ্রমের ফসল শস্যকেন্দ্রিক জীবনপ্রবাহ। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর আন্তরিকতার মিশেলে বীজ থেকে শস্য ফলান শস্যকেন্দ্রিক মানুষগুলো, যেখানে কোনো ফাঁকির জায়গা নেই। অপর দিকে নাগরিক জীবনযাত্রা শুধু মুখোশে লুকানো, সেখানে নেই কোনো স্বাস্থ্যকর হাওয়া। আবুল হাসান এই শহরকেন্দ্রিক শিল্প ভাবনাকে উপেক্ষা করে শস্যে মুগ্ধ হয়ে স্বাগত জানিয়েছেন শস্য মানুষদের :

প্রজ্বলন্ত সেই কদাকার হা কুচ্ছিৎ সমস্ত সব ভন্ডামি আর উলটপালট
লোভলালসা, লুব্ধজটিল সমস্ত সব চৌচুরমার হত কুচ্ছিৎ তাকাই ফিরে

লিখতে লিখতে তাকাই ফিরে মাটির দিকে, মাটি মাটি মাড়াই মাটি
সাধ্যমতোন যেমন পারি মাটিতে যাই শস্যপর্ব, শস্যমুগ্ধ শস্য মানুষ।

(শস্যপর্ব, *যে তুমি হরণ করো*, পৃ. ৯০)

শস্যমুগ্ধ কবি আবুল হাসানের মাটিনির্ভর শস্যকেন্দ্রিক জীবনভাবনার বিষয়ে সমালোচকের বক্তব্য উল্লেখ করা যায় :

> শাহরিক বিরুদ্ধতা আর আত্মজৈবনিকতাজনিত দীর্ঘ যন্ত্রণা আবুল হাসানের আবেগ ও সংবেদনাকে পরিণত শিল্প স্তরে নিয়ে যায়, আর কবির এই পরিণত শিল্পত্ব সঞ্চারিত হয় প্রধান ভাবে লোকসংস্কৃতিরই গভীর প্রভাব ও আকর্ষণে। (অনু হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*, পৃ. ২০১)

শহুরে বাস্তবতার করাল গ্রাসে পতিত কবি আত্মবিশ্বাসের জোরে নিজের অস্তিত্বের ভেতর ডুব দিয়ে খুঁজে নেন তাঁর অতি পরিচিত গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ যা তাঁর কবিতার শিল্প সত্তার মূল কাঠামো হয়ে ওঠে, সেই সাথে হাজার বছরের গৌরবান্বিত গ্রাম ও গ্রামের মানুষ, আচার, রীতিনীতি সর্বোমোট সারল্য জীবন ও সতেজতা কবি তুলে ধরেন তার কবিতার ভেতর দিয়ে। যেখানে অনুভূত হয় যন্ত্রণায় পেলব আত্মার শান্তিময় অনুভূতি ও কবিতায় যোগ হয় নতুন মাত্রা।

আবুল হাসানের কবিতায় গভীর ছায়া ফেলেছে দুঃখবোধের পাশাপাশি মৃত্যুচেতনা। তাঁর কবিতার মধ্যে মৃত্যুর পটে উঠে এসেছে মৃত্যুবিজয়ী জীবনের গান। অসুস্থতার কারণে তিনি অকালে চলে গেলেন। বস্তুত, মৃত্যুচিন্তাই তাঁর কাব্যদর্শনের কেন্দ্রীয় শক্তি। তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে স্পেনের ফেদরিকো গারথিয়া লোরকার আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ষাটের দশকের কবি আবুল হাসান লোরকা দ্বারা বিশেষভাবে প্রাণিত হয়েছেন। কবিতায় শব্দ-ব্যবহার এবং অলংকার-সৃজনে আবুল হাসান ছিলেন পরম শুদ্ধতার অভিসারী। সতত নিরীক্ষায় তিনি সাজিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতার নির্মেদ শরীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুহম্মদ নূরুল হুদা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯) বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবীজকে উপলব্ধি করে তিনি ষাটের দশকের কবিতায় নান্দনিক ধারার সূচনা করেন। মেধাবী ও স্বপ্নের সুদক্ষ কারিগর তিনি। মুহম্মদ নূরুল হুদা বাংলা কবিতার জগতে বৈচিত্র্যের মাধুর্য বিবেচনায় এক অনন্য দ্যুতির নাম। অর্ধশতাব্দীর চেয়েও অধিক সময় তিনি বাংলা কবিতায় বৈচিত্র্যের সম্ভার সন্ধান করেছেন। তাঁর কবিতার বৈচিত্র্য যেমন নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণে, তেমনি কবিতার উপস্থাপনশৈলীতে। গ্রাম থেকে নগর, কংক্রিটের রাজপথ থেকে দরিয়ানগর প্রসঙ্গও বাদ পড়েনা তাঁর কবিতা থেকে। জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতা তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। ভূমিজচেতনা, নৃতাত্ত্বিক গভীরতা, লোকধর্মিতা তাঁর কবিতায় জায়গা করে নেয়। তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় বাংলার প্রকৃতি আর দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত। তাঁর কবিতায় যেমন আছে জল ও সমুদ্রবন্দনা, তেমনি আছে পুষ্প ও শস্যের সম্ভার। মুহম্মদ নূরুল হুদা *ষাট বছরের কবিতা* (২০০৯) গ্রন্থে বলেছেন :

> এই বাংলা, এই বাংলাদেশ, এই বাঙালি জাতিই আমার মাটি ও আকাশ, আমার ঘর ও চরাচর, আমার চির নবায়নযোগ্য ঠিকানা। এই আমার গর্ব। এই নিয়েই আমার চিরকালের 'আত্মপক্ষ'। (মুহম্মদ নূরুল হুদা, *ষাট বছরের কবিতা*, ভূমিকাংশ)

তাঁর কাব্যপ্রয়াসের কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তিমানুষ, জাতিমানুষ এবং বিশ্বমানুষের প্রতি সমীকৃত প্রতীতি। মুহম্মদ নূরুল হুদা তাঁর কবিতায় বাংলার লোকজ গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম-রাজনীতি কোনো অনুষঙ্গই বাদ রাখেননি। বিশেষ করে জাতিসত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে :

> পেছনে ফিরে নিজের ইতিহাস ও মিথে প্রত্যাবর্তন করে জাত্যাভিমান ও আত্মগৌরবের চর্চা করেন মুহম্মদ নূরুল হুদা। (সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের কবিতা, *হালখাতা*, পৃ. ১৪৮-১৪৯)

সমকালীন বাংলা কবিতার অন্যতম কণ্ঠস্বর তিনি। তিনি 'জাতিসত্তার কবি' হিসেবে পরিচিতি পান। মুহম্মদ নূরুল হুদার কাব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *শোণিতে সমুদ্রপাত* (১৯৭২), *আমার সশস্ত্র শব্দবাহিনী* (১৯৭৫), *শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি* (১৯৭৫), *অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী* (১৯৮০), *আমরা তামাটে জাতি* (১৯৮১), *শুক্লা শকুন্তলা* (১৯৮৩), *যিসাস মুজিব* (১৯৮৪), *হনলুলু ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৭), *কুসুমের ফণা* (১৯৮৮), *বার বছরের গল্প* (১৯৮৮), *এক জনমে লক্ষ জন্ম* (১৯৮৮), *গালিবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক* (১৯৮৯), *আমি যদি জলদাস তুমি জলদাসী* (১৯৯০), *জাতিসত্তার কবিতা* (১৯৯২), *প্রিয়াঙ্কার জন্য পঙক্তিমালা* (১৯৯২), *অরক্ষিত সময়* (১৯৯৩), *দিগন্তের খোসা ভেঙে* (১৯৯৪), *আমার কপালেও সময়ের ভাইফোঁটা* (১৯৯৫), *মুজিববাড়ি* (১৯৯৬), *দেখা হলে*

একা হয়ে যাই (১৯৯৮), *স্মৃতিপুত্র* (১৯৯৯), *দরিয়ানগর কাব্য* (২০০১), *পদ্মাপারের ঢেউসোয়ার* (২০০৪), *পুণ্যবাংলা* (২০০৫), *সুরসমুদ্র* (২০০৫), *সময় মাড়ানোর গল্প* (২০০৬), *আমি একটি খাস প্রজাপত্র চাই* (২০০৭), *সুনীতির জন্য কবিতা* (২০০৮), *আমার সাহস নেই টোকা মেরে সুন্দরকে উড়িয়ে দেবার* (২০০৯), *বেহুলার শাড়ি* (২০১২) প্রভৃতি।

জাতিসত্তার স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে মুহম্মদ নূরুল হুদা বৃহত্তর লোকসমাজের যাপিতজীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অন্বেষার অতলান্তিক মানস সহযাত্রী। পুরাণ ও ইতিহাসকে নতুন করে ব্যবহার করেছেন মুহম্মদ নূরুল হুদা :

> পুরাণ ব্যবহার করেছেন মুহম্মদ নূরুল হুদা রাজনৈতিক পালাবদলের স্মারখ হিসেবে। নিটোল অনুভূতিচর্চা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দায়বদ্ধ চেতনা প্রবাহিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। চোরাবালির মৃগতৃষ্ণিকা নিবারণের জন্যে যেন তাঁর আহ্বান। তাঁর কবিতায় কবির যে যন্ত্রণা, তা কোনো অংশেই অনুর্বর নয়, শ্রীহীন কিংবা পাণ্ডুর নয়। সময়ের ত্রিভুজত্ব ও পরিচয়ের অভিনবত্বে তাঁর কবিতা বর্তমানেও আরদ্ধ ভবিষ্যতের টীকাভাষ্য। (গাউসুর রহমান, *জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা*, পৃ. ১৩-১৪)

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে অবগাহন করে ইতিহাস লোকপুরাণ ও পুরাণাশ্রিত হয়ে তিনি দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় তুলে ধরেছেন। জাতিসত্তার স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি প্রাসঙ্গিক পৌরাণিক বাস্তবতাকে কবিতার উপাদান করেছেন। তাঁর অনেক কবিতায় দ্রাবিড় জাতির কুলগৌরব ধ্বনিত হয়েছে :

> আমি কার বংশধর সঠিক জানি না
> কালান্তরে পিতা কি প্রপিতা
> ছেড়ে গেছে নিজস্ব নিবাস–
> আমি যাবো সেই পথে, পশ্চাতে জ্বলবে শুধু উত্তরাধিকার।
>
> (গৃহমুখী, *শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি*, পৃ. ১০২)

এখানে পিতৃসন্ধানী, শেকড়সন্ধানী, জাতিসন্ধানী কবির করুণ আর্তি লক্ষ করা যায়। মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবি, শিক্ষক, আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচক ও গবেষক বায়তুল্লাহ্ কাদেরী লেখেন :

> প্রেম ও স্বাদেশিক ভাবনার সঙ্গে তাঁর কবিতায় আছে শঙ্করজাতির টানাপোড়েন, বিস্মৃতিপ্রবণতা ও দোলাচলবৃত্তির অস্থিরতা। কিন্তু সুস্পষ্ট মীমাংসায় হুদা পৌঁছেছেন শেষাবধি। এক্ষেত্রে ষাটের না-বোধকতায় হুদা হাঁ-সূচক কবি। অবক্ষয়, ক্লেদাক্ত জীবনের প্রবল চাপ তাঁর কবিতায় না থাকলেও আছে আত্মস্বীকারোক্তি, বর্ণনারীতির প্রবহমানতা। (বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, পৃ. ৫১)

প্রেমবিষয়ক কবিতায় নূরুল হুদা অতি রোমান্টিক, বিদ্রোহের কবিতায় অতিমাত্রায় বিপ্লবী। প্রেমিকার দেহে নদীর ঢেউ যেমন তিনি কল্পনা করেন, তেমনি তিনি সাম্যবাদীর মতো উচ্চারণ করেন :

> আমি বিশ্বাস করি, অজস্র তামাটে মানুষের উত্থানে একদিন খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে বাধসাধকারী তৃতীয় পক্ষ। আমি বিশ্বাস করি, একদিন বিভেদ থাকবে না মানুষে- মানুষে, ব্যবধান থাকবে না শ্রেণীতে শ্রেণীতে। আমি বিশ্বাস করি, মানবতা একদিন সম-স্বার্থে সমুত্থিত হবেই। (আত্মপক্ষ, *ষাট বছরের কবিতা*, পৃ. ৩)

একরাশ বিরহে মুহ্যমান কবি তাঁর প্রেয়সীর উদ্দেশে কথামালা বিরহে রূপ পায়। হৃদয় উজার করে ভালোবেসেছেন তিনি। কিন্তু কবিপ্রিয়া উদাস। এখানে মুহম্মদ নূরুল হুদার চিরন্তন প্রেমিক সত্তাটি জাগ্রত। না পাওয়ার বেদনা তাঁকে নিয়ে চলেছে গভীর বিষাদে :

> তোমাকে ভালোবেসে বলো তো কি পেলাম
> নেমেছে কালো রাত আমার এ হৃদয়ে
> স্মৃতি জোছনারা খেলে না কানামাছি
> তারারা জাগে শুধু দূর ওই আকাশে।
> (তোমাকে ভালোবেসে, *এক জনমে লক্ষ জন্ম*, ষাট বছরের কবিতা, পৃ. ৩৪১)

মুহম্মদ নূরুল হুদা রোমান্টিক ও প্রতীকতার চূড়া-স্পর্শী কবি। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি-ব্যক্তিত্বের মতো তাঁর কবিতায় প্রভূত ইতিহাসচেতনা, পুরাণ ও ঐতিহ্যচেতনার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বলা যায়, তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে ইতিহাস, পুরাণ, ঐতিহ্য, প্রেম ও অস্তিত্বচেতনা। এগুলোকে তিনি আবেগ ও আবেগের মননশীল পরিশোধনের মাধ্যমে শব্দ ও ছন্দের নিপুণ পরিচ্ছন্ন কারুকাজে কবিতায় রূপান্তর করেন।

ইতিহাস সচেতন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা নিজ জন্মের রহস্য খুঁজে বের করতে সদা সচেতন। তিনি জানেন যে, এই অনার্য জাতি, এই চাষা-ভূষা নামে খ্যাত জাতি তাঁর আপন সত্তা। এই জাতি বাঙালি জাতি যার সাথে রয়েছে কবির জন্মান্তরের বন্ধন। প্রকৃতির অনুষঙ্গ তাঁর অনুভবে আত্মীয়রূপে ধরা দেয়। 'শিকড়গুলো' কবিতার মধ্যে কবি জন্মের নিবিড় বন্ধনের সমন্বয়ে বাংলার মাটি ও লাঙলের সম্পর্কের ঘনিষ্টতা বুঝিয়েছেন :

> জন্মজমি জন্মজাতি/ জলতরঙ্গ পললভূমি
> স্তরে স্তরে বর্শালাঙল/শিকড়-কথা চারিয়ে দিলাম
> তামাটে এক দ্রাবিড় গ্রিয়ট/গল্পগুলো চারিয়ে দিলাম।
>
> (শিকড়গুলো, *আমরা তামাটে জাতি*, ষাট বছরের কবিতা, পৃ. ১৭৮-১৭৯)

একই ধারাবাহিকতা চোখে পড়ে তাঁর 'বাঙালির জন্মতিথি' কবিতার মধ্যে। এখানেও তিনি খুবই মনোযোগী পূর্বপুরুষের ইতিহাস-অন্বেষায়। কবির অস্তিত্বের ভেতর পূর্বপুরুষের হাড়ের ইতিহাস

সুরেলা ঝংকারে বেজে ওঠে। তাঁর কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে সোনালি অতীত যা প্রাণবন্ত সবুজ। যেখানে একতারা হাতে বাউলের সুর ভেসে উঠতো সেখানে মুক্তিকামী বাঙালি অস্ত্র হাতে ছিনিয়ে এনেছিল বাংলার স্বাধীনতা। সেই সৈনিকের হাড়গুলোই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজো বাঙালি জাতির হৃৎপিণ্ডে চলমান :

তোমাদের হাড়গুলো/জোসনারাতে উড়ে যাওয়া
শাদা কবুতর,/সুদূর ঝর্ণার জলে স্বপ্ন-ছাওয়া ঘাসের সবুজ;
তোমাদের হাড়গুলো অন্তহীন স্রোতস্বিনী, সুরের নির্ঝর/একতারা হাতে এক বাউলের মনোজ গম্বুজ;
তোমাদের হাড়গুলো বাঙলার সীমানা-ডিঙ্গানো/ক্রমশ বর্ধিষ্ণু এক হরিৎ বাগান
কারাবাইন তাক-করা বেপরোয়া সৈনিকের গান;

(বাঙালির জন্মতিথি, *আমরা তামাটে জাতি*, ষাট বছরের কবিতা, পৃ. ১৭৯)

ষাটের দশকের অধিকাংশ কবি ছিলেন নগরবাসী, ফলে এ দশকের কবিতায় গ্রামীণ সৌন্দার্যানুভূতি বা গ্রামীণ জীবনের লোকজ চিত্রকল্প কম। তবে কবিদের উপাদান সংকীর্ণ নগরের পরিবর্তে বৃহত্তর জাতীয় চেতনায় স্বদেশ প্রাধান্য পায়। নগর তখন আত্মতার বিপরীতে সামষ্টিকতার যোগান দেয় কাব্যে। মুহম্মদ নূরুল হুদা তেমনি একজন কবি যাঁর শরীর পড়ে থাকে নগরের রাজপথে, কিন্তু মন ও মনন সমগ্র দেশের চিন্তায় মূহ্যমান। ষাটের দশকের অস্তিত্ববিরোধী কোলাহল, অমঙ্গলের বার্তা, অমানবিকতা তাই মুহম্মদ নূরুল হুদাকে পীড়িত ও ক্লান্ত করে। ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ের কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা গ্রামীণ ও লোকজ জীবনচিত্র নির্মাণে প্রাতিস্বিকতার পরিচয় দেন।

গ্রাম-অধ্যুষিত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করতেন প্রান্তিক জনসাধারণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে জেগে ওঠা চরাঞ্চলে ফসলকে ঘিরে মূলত জনবসতি গড়ে ওঠে। এদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির মূলভিত্তি হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা করে নগর বলতে যা বোঝায় এদেশে তা প্রায়ই অনুপস্থিত। বাংলাদেশের নগরগুলো তেমনটা উন্নত নয় এবং নাগরিক জীবনও গ্রামীণ জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। কাজেই বাংলার নাগরিক এবং গ্রামীণ জীবনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও গোটা গ্রামীণ জীবনব্যবস্থাই কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এ ভিন্নতা কোথাও সম্পূর্ণরূপে, আবার কোথাও মাত্রাগত।

মোগল আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক এলাকাকে মৌজা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আর ব্রিটিশরা মৌজাকে গ্রাম হিসেবে নামকরণ করেছিল। বাস্তবে শহর থেকে দূরে অবস্থিত কৃষি প্রধান এলাকায় বসবাসরত এক একটি জনপদ গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পায়। নিজের গ্রামের প্রতি মমত্ববোধ ব্যক্তিকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করে। এজন্য গ্রামীণ সমাজে

বসবাসরত মানুষের মধ্যে গ্রাম ত্যাগের সংখ্যা কম। শিক্ষা এবং জীবিকার সন্ধানে যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় তাদের মধ্যেও নিজ গ্রামের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। আবার এও সত্য যে, দিনমজুর এবং শ্রমজীবী শ্রেণি– গ্রামের ভূস্বামী, জোতদার, মাস্তান দ্বারা শোষিত হয়ে শহরমুখি হয়। বাংলাদেশে শহরায়ন গড়ে ওঠে মূলত ইংরেজ আমলে। জীবন-জীবিকার তাগিদে মানুষ ছোটে শহরে। শিক্ষিত সমাজ চাকরির সন্ধানে নগর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজ রাজত্বের প্রায় শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ তিরিশের দশকে বাংলার গ্রামগুলো ছিল প্রায় পূর্বের দশকগুলোর মতোই। গ্রামে ছিল নিবিড় প্রশান্তি। তেমন খাদ্যাভাব ছিল না। জনসংখ্যার আধিক্যও ছিল না। একদিকে কলকাতা ও ঢাকার সঙ্গে নদীপথ এবং রেলপথ বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ ঘটায়, অন্যদিকে শিক্ষিত বেকার যুবসমাজ চাকরির সন্ধানে শহরে ভিড় করতে শুরু করে। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষও কাজের সন্ধানে শহরে বন্দরে ছোটে। এই দশকে মানুষ আয় রোজগার করে পরিবার পরিজনের সুখ শান্তির জন্য মাসান্তে স্বল্প সময়ের জন্য পরিবার পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ভরণপোষণের দায়ভারের জন্য গ্রামে ফিরে যেত। বলা যায়, পুরো ষাটের দশক পর্যন্ত যৌথ পরিবার প্রাধান্য পেয়েছে জন্মস্থান গ্রামকে ঘিরে।

ধনতন্ত্রের ছোবলে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে চল্লিশের দশকে এসে ধীরে ধীরে নগর সভ্যতা বেড়ে ওঠে। এই দশকের প্রথম দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও দশকের মধ্যপর্যায়ে দেশবিভাগ গ্রাম-শহরের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ ছোবল সব শ্রেণির এবং ধর্মের মানুষের ওপর প্রভাব পড়ে। মানুষ ছোটে তখন বাঁচার জন্য। এই সময়েই গ্রামের মানুষ শহরে বা শহরের মানুষ গ্রামে আশ্রয় খুঁজে নেয়। নিরাশ্রয় মানুষ, নিরালম্ব মানুষ, অনিকেত মানুষ মূলত এ সময়েই পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধানে দেশান্তরী হন।

পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশক জুড়ে পাকিস্তানি শাসন শোষণের করালগ্রাসে বাংলাদেশের জনগণ পিষ্ট হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য বাঙালিরা বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ষাটের দশকেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা প্রকৃত অর্থে আধা নগর আধা গ্রাম হিসেবেই পরিচিতি পায়। নগরায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল ঢাকার অবস্থান। ষাটের দশকে ঢাকাকে ঘিরে সবেমাত্র গ্রাম থেকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বসতি গড়তে শুরু করে। নদীভাঙন কবলিত মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, বিভিন্ন পেশার কর্মজীবী মানুষ চাকরির উদ্দেশে শিক্ষিত যুবক, খেটে খাওয়া মানুষ ঢাকার পথে পা বাড়ায়। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষই বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণি বা ছাত্রসমাজ মূলত ঢাকায় এসে গ্রামকে ভুলতে পারেনা। তারা পল্লিমাকে ভুলতে না পেরে কলম ধরে। মনের কোণে লুকিয়ে থাকা কথা কলমের ডগায় প্রকাশ করতে শুরু করে। এভাবেই লেখকসমাজ, কবিসম্প্রদায়

গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে কবিসমাজের যে বলয় গড়ে ওঠে তা ধীরে ধীরে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়। নস্টালজিক প্রভাবে কবিরা শহরে বসবাস করেও গ্রামীণবোধে জাড়িত হয়ে ষাটের দশকের অধিকাংশ কবি লোকজভাবনায় উজ্জীবিত হন। মোটকথা, কবিরা জন্মেছেন গ্রামবাংলায়। তাই শৈশব কৈশোরের দেখা গ্রামীণ চালচিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হন তাঁদের কবিতার ভুবনে। পাশাপাশি ষাটের দশকের কবিদের কবিতায় যে নগরচেতনা দৃশ্যমান হয়, তা মূলত পাশ্চাত্য শহরগুলোতে অন্যতম কবিদের প্রভাব প্রতিচ্ছায়া বিদ্যমান।

ষাটের দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের ইতিহাসে অনন্য। ষাটের দশকেই স্বাধিকার আন্দোলনের মাত্রা তীব্র হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি সমাজ জেগে ওঠে। এই দশকের কবিসমাজ কলমের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের শোষণ নিপীড়ন থেকে বাঁচার দাবিতে একাট্টা হন। ষাটের কবিদের সংখ্যা অনেক। প্রায় প্রত্যেক কবিই নিজেকে স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত করতে পেরেছেন। আন্দোলনে, সংগ্রামে, প্রেমে, দ্রোহে ষাটের কবিদের মধ্যে তিরিশের কবিদের ছায়াপথ স্পষ্ট হয়। তিরিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের কবিদের চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠেন ষাটের দশকের কবিসমাজ। আবার এ কথাও সত্য যে, ভাব ভাষা গঠনরীতি এবং প্রকাশভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নতুন কবিতার জগৎ নির্মাণে সফল ষাটের দশকের কবিগণ। তাই তাঁদের কবিতার রূপ বদল ঘটে অবলীলায়। ষাটের দশক বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি ও কবিতায় উজ্জ্বল মহিমায় দেদীপ্যমান : 'পাপবোধ, পঙ্কিলতার গ্লানি, অবক্ষয়িত অন্তরাত্মার প্রতীতিতে একগুচ্ছ রোমশ অন্ধকারে বিচ্ছুরিত দ্যুতির মতো ছিটকে পড়েছেন ষাটের কবিরা। বিরুদ্ধ সময়, অনিকেত নিরলম্ব অবস্থান, অগ্রজে অবিশ্বাস, ক্রমান্বয়ে তাঁদের করেছে সংঘবিচ্ছিন্ন, আত্মমৈথুনে লিপ্ত, প্রথাবিরোধী, আত্মভুক চেতনায় উজ্জীবিত।' (বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *কবিতার শব্দ-সাঁকো*, পৃ. ১৪৯) ষাটের দশকের কবিতা মূলত আত্মদ্বন্দ্বের বৃত্তে স্থানান্তরিত হলো। কবি নিজে হয়ে ওঠেন কবিতার বিষয়-কেন্দ্র। ফলে সমাজ ও শিল্পীর দ্বন্দ্বময় সম্পর্কই মূলত কবিতায় ঠাঁই করে নেয়। হাজার বছরের বাংলা কবিতার ভাব, বক্তব্য দর্শনজাত মানস ভাবনার রূপান্তর ঘটতেই থাকে ষাটের দশকের কবিতায়।

গ্রন্থ-সহায়িকা :

১. অনিন্দিতা ইসলাম, অন্য স্বর অন্য আলো : মোহাম্মদ রফিকের কবিতা, (সম্পাদিত : আবুল হাসনাত, *কালি ও কলম*, চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৭

২. অনু হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

৩. অসীম সাহা, 'ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন'-আন্দোলন', *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, (সম্পাদনায় : সাজ্‌জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

৪. আবুল হাসান রচনাসমগ্র (ভূমিকা : শামসুর রাহমান), ষষ্ঠ প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

৬. আসাদ চৌধুরী : *কোন অলকার ফুল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
: *কবিতাসমগ্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১
: প্রিয় রফিক আজাদ, *পূর্বপশ্চিম*, (সম্পাদক : আশরাফ জুয়েল ও অমিত গোস্বামী, বর্ষ চতুর্থ : পঞ্চম সংখ্যা), ২০১৭

৭. আহমদ রফিক, *কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

৮. খালেদ হোসাইন, *বাংলা ছন্দের মানচিত্র*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

৯. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

১০. গাউসুর রহমান, *জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮

১১. নির্মলেন্দু গুণ, *নির্বাচিতা*, অষ্টম সংস্করণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

১২. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯
: *কবিতার শব্দ-সাঁকো*, নিই এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮

১৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *আবুল হাসান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

১৪. মহীবুল আজিজ, 'ষাটের কবিতা', *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, (সম্পাদনায় : সাজ্‌জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

১৫. মাহবুব হাসান, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫

১৬. মিনার মনসুর, ক্রান্তিকালের কবিতা : কবিতার ক্রান্তিকাল, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, (সম্পাদনায় : সাজ্‌জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

১৭. মুহম্মদ নূরুল হুদা, *ষাট বছরের কবিতা*, লেখালেখি, ঢাকা, ২০০৯

১৮. মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

১৯. মোহাম্মদ রফিক, *কবিতাসমগ্র* ১ ও ২, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

২০. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

২১. রফিক আজাদ, *রফিক আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫

২২. শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, রোদেলা, ঢাকা, ২০১৩

২৩. সরদার আবদুস সাত্তার, *লেখক পরিচিতি*, *কবিতাসমগ্র* : *আসাদ চৌধুরী*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

২৪. সালাম সালেহ উদদীন, *পূর্বপশ্চিম*, (সম্পাদক : আশরাফ জুয়েল ও অমিত গোস্বামী, বর্ষ চতুর্থ : পঞ্চম সংখ্যা), ২০১৭

২৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের কবিতা, *হালখাতা* (সম্পাদক : শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত), ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ২০১১

২৬. রফিকউল্লাহ খান, কবিতার সংগ্রাম, সংগ্রামের কবিতা, *কাশবন*, (সম্পাদক : মিন্টু হক), বর্ষ ১ : সংখ্যা ৩, ২০১৫

পঞ্চম অধ্যায়

সত্তরের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

সাহিত্যের যে কোনো শাখাকে দশকভিত্তিক বিভাজন খুবই জটিল কর্ম। তবে একগুচ্ছ কবি-সাহিত্যিককে একটি দশকের বৃত্তে এনে বিচার-বিশ্লেষণ করলে সেই সময়ে সংগঠিত সামাজিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পরিলক্ষিত হয়। নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের কবিতার জগতে সত্তরের দশক (১৯৭০-'৭৯) । এ কথা সত্য যে, কবিদের মূল্যায়ন কোনো কালেই দশক বিচারে হয় না। তবে যে দশকে কবির লেখা শুরু হয়, সেই দশক থেকেই কবির যাত্রা নিরূপণ করা হয়।

ষাটের দশক জুড়ে ছিল জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলন। এরপরই শুরু হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং এগার দফা আন্দোলন। তারপর পাকিস্তানিদের নতিস্বীকারের ফসল সত্তর-এর নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) নেতৃত্বে বাঙালি জাতি জয়লাভ করলেও ফলভোগ করতে দেওয়া হয়নি। তারই প্রেক্ষাপটে সারা বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু হয়। ২৫ মার্চ'৭১ কালরাতে পাক-হানাদার বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালায়। প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠনের পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ ও সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ গণযুদ্ধে রূপ নেয়। দখলদার বাহিনীর সহযোগিতায় এগিয়ে আসে শান্তি কমিটি, আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনী। পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর বিচার ও বিশ্বপ্রতিক্রিয়া শুরু হয়। প্রবাসী বাঙালি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয় হয়। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ইতিহাসখ্যাত। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, সংবিধান প্রণয়ন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালীন সময়ে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও আদর্শিক পটপরিবর্তন সত্তরের কবিতায় বিশাল জায়গা করে নেয়।

বাংলাদেশের কবিতায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দশকগুলোর বিষয়ভাবনা ও নন্দনভাবনার বিচ্ছুরণ সত্তর দশকের কবিতায় দৃশ্যমান। যুদ্ধ করে দেশ জয় করার মধ্যে যে আবেগ সঞ্চরণশীল হয় তার মধ্যে দিয়ে মূলত কবিদের আবির্ভাই বেশি। ফলত সত্তরের দশকের কবিসম্প্রদায় কবিতা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। সত্তরের দশকে পত্রপত্রিকা-সাময়িকী মূলত ছিল হাতে গোনা– 'সমকাল',

'পূর্বমেঘ' ও 'পরিক্রম'। এই দশকের কবিরা নিজেদের সৃষ্টিকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যপাতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সত্তরের দশকের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : মাহবুব সাদিক (জ. ১৯৪৭), অসীম সাহা (জ. ১৯৪৯), আবিদ আনোয়ার (জ. ১৯৫০), ময়ুখ চৌধুরী (জ. ১৯৫০), দাউদ হায়দার (জ. ১৯৫২), শিহাব সরকার (জ. ১৯৫২), আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫), নাসির আহমেদ (জ. ১৯৫২), জাহিদ হায়দার (জ. ১৯৫৬), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-'৯১) প্রমুখ। মুক্ত স্বদেশ ও সমাজপ্রক্রিয়ার বিচারে সত্তরের দশকে অনেক কবির আগমণ বিষয়ে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> সংগ্রামী জীবন-আকাঙ্ক্ষা এঁদের অধিকাংশেরই কবিতার মৌলিক লক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যায়ে এঁদের মধ্যে লক্ষ করবো সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার টানাপড়েন, আত্মকেন্দ্রিকতার পরকীয়া উল্লাস, ব্যক্তিত্ববর্জিত আত্মরতি ও আত্মকুণ্ডলায়ন। তবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই বোধগুলো যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাঁদের কবিতায় গৌণ হয়ে পড়ে। এ সময় তাঁদের যে স্বভাবধর্ম সুস্পষ্ট হতে থাকে, তাহলো সজ্ঞচেতনা ও সংগ্রামের প্রশ্নে সমষ্টিলগ্ন মানসিকতা, নাগরিক অনুভব প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত এবং প্রায়শই স্মৃতি, নস্টালজিয়া, নিসর্গ ও গ্রামীণজীবনের প্রতি আকর্ষণ। এ সময়ের কবিতাকে বিশেষ চারিত্র্যে চিহ্নিত করা এ কারণেই দুরূহ হয়ে পড়ে। (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পৃ. ১৮৯-১৯০)

সত্তরের দশকের কবিদের মধ্যে উপর্যুক্ত প্রবণতা ছিল স্পষ্ট। তাঁরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেমন মুক্ত দেশ সৃষ্টির নেশায় বিভোর ছিলেন, তেমনি সত্তরের দশকের মধ্যভাগে অর্জিত স্বাধীনতাকে নিয়ে কুচক্রী মহলের ছিনিমিনি খেলার দৃশ্য অবলোকন করেছেন। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে অনেকেই সত্তরের দশকে নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে তৎকালীন সময়কে তাঁরা তাঁদের কবিতায় তুলে ধরতে সক্ষম হলেন। এ সময়ের কবিরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির আবহকে গতিশীল করলেন– ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কবিসমাজের বাড়তি সুবিধা ছিল :

> পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ক্রমশই আস্থা হারিয়ে ফেলছিল এই এলাকার জনগণ এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার তুখোড় ট্রিগারে চাপ দিয়েই আবহ সৃষ্টি হয়ে গেল বাঙালির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার। এই চেতনাই বাংলা কবিতাকে দান করলো নতুন প্রাণ এবং কবিতা তখন শুধুই কবিতা নয়, কবিতা স্বাধিকার, স্বাধীনতা আদায়ের তুখোড় অস্ত্রও বটে। রচিত হয়ে গেল 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র মতো কবিতা এবং গান, 'আসাদের সার্ট', 'সফেদ পাঞ্জাবী' এবং 'স্বাধীনতা তুমি'। (মুনীর সিরাজ, সত্তর দশকের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ২৯৭)

সত্তরের দশকের শুরুই হয়েছে মূলত স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মলাভের পরপর। সত্তরের কবিরা এই সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত পরবর্তী জাতিসত্তার স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কবিতার ভাষাকে মনের গহীনে ঠাঁই দেন। এই সময়ের কবিদের শব্দমালায় নতুন জাতির ত্যাগের বেদনা, ধ্বংসযজ্ঞের তীব্র চিৎকার এবং

স্বপ্নপূরণের ইচ্ছা প্রবলভাবে জেগে ওঠে। এরই মাঝে সত্তরের দশকের বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত কবিগণ ইতিহাসের চিরায়ত নিয়মে প্রতিবিম্বিত হতে পেরেছিলেন। ইতিহাসের গতি এবং বাস্তবতাই সত্তরের কবিদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল :

> সত্তর দশকের কবিতার শরীরে তাই লেপ্টে আছে কাদামাটি, মাটির গন্ধ, মাটিলগ্ন মানুষের এবং কল-কারখানার পরিশ্রমী মানুষের শরীরের ঘাম, মেদহীন পেশীময় দেহ এবং তাদের কর্কশ ও উচ্চকণ্ঠস্বর। সত্তর দশকের কবিতার এটাই প্রধান পরিচয়। (মুনীর সিরাজ, সত্তর দশকের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ২৯৮)

সত্তরের দশকের কবিদের এগিয়ে চলার পেছনে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কবিতার নির্মাণশৈলি ও ইতিহাসসংলগ্নতা বিষয়ে খুব বেশি আলোচিত হয়নি।

বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে সত্তরের দশক এক অনন্য সময়। স্বল্পসময়ে বিষয় ও প্রকরণের বৈচিত্র্য, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের প্রতিচ্ছবি নির্মাণে সত্তরের দশকের কবিরা ছিলেন আন্তরিক। এই দশকে বাংলা কবিতায় যুক্ত হয়েছে অসংখ্য নতুন, শক্তিশালী, প্রাণবান, শিল্পনিষ্ঠ ও আন্তরিক কণ্ঠস্বর। বাংলাদেশের সাহিত্যে সত্তরের দশকের কবিতার নানাবিধ বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়। সত্তরের দশক আরম্ভ হয়েছিল বাঙালি জাতিসত্তার অধিকারের সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে। সত্তরের নির্বাচন বাঙালি জাতিকে নাড়া দেয়। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবময় অধ্যায়। তবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কালে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে গেলে গণমানুষের মোহভঙ্গ ঘটে:

> অসম্ভব দ্রুত বদলাতে থাকে দৃশ্যপট : এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা- যাদের বীর গাথায় এ দেশের ইতিহাস ভরে উঠবার কথা ছিল– তারা নির্মমভাবে নিহত হন রাজপথে-স্বগৃহে, কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে। বুটের তলায় পিষ্ট হয় সকল অধিকার। যে চেতনা এই জাতিকে দীর্ঘ সংগ্রামের পথরেখা দেখিয়েছিলো তা অপহৃত হয়, যাদেরকে পরাজিত করে যে রাজনীতি মানুষের আশ্রয়স্থল ছিলো তা হয়ে ওঠে স্বার্থসিদ্ধির উপায়, কোথায় যেনো বেজে ওঠে ভাঙনের গান। আশ্চর্য বৈপরীত্যের অভাবনীয় সমাহারে সত্তর দশক পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই বৈপরীত্য এ জাতির সৃষ্টিশীল তরুণদের কবিতার কাছে নিয়ে আসে। যেখানে সে আশা ও আশাভঙ্গকে, কুসুম ও ইস্পাতকে, আগুন আর ফুলকে এক সঙ্গে ধরতে চেয়েছে। জীবনের বহিরঙ্গ নয়–ওপর থেকে দেখা জীবনের ভেতরে যে জীবন তাকে বাঙ্ময় করে তোলার জন্যে কবিরা সাজিয়ে তোলেন শব্দের পর শব্দ, পংক্তির পর পংক্তি, স্তবকের পর স্তবক। সময়ের এই দোলাচল, এই দ্বৈততা, কবিতার মধ্যে জায়গা করে দেয় হিংসা ও ভালোবাসাকে, প্রেম ও পরাজয়কে। (আলী রিয়াজ, ভূমিকা : সত্তর দশকের কবিদের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৩০৬)

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে অসাধারণ সময়। শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন মানবিক চেতনায় ভরপুর অসাম্প্রদায়িক সমাজ রাষ্ট্রগঠনের যে আকাঙ্ক্ষা হাজার বছর ধরে বাঙালি চেতনায় অন্তর্নিহিত ছিল, তার বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। জাতি

হিসেবে রাষ্ট্রীয় পরিচিতি লাভ, যুদ্ধজয় এবং ঐতিহাসিক চেতনায় সত্তরের দশকের কবিতা উদ্দীপিত। তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধপ্রসঙ্গ বাংলাদেশের কবিতার নির্বিশেষ বিষয়ে পরিণত হয়। আমাদের কবিতায় বস্তুবিশ্বচেতনা ও সত্তাদর্শনের চেয়ে জাতিগত ঘটনার প্রতিক্রিয়া অধিক গুরুত্ব পায়। ইতিহাসচেতনায় এই সময়ে কাব্যপ্রকাশ হয়ে ওঠে বাঙ্ময় ও উচ্ছ্বসিত। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতার ধারা কালের কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিভাত হয়। বেগম আকতার কামালের মন্তব্য অনুভববেদ্য :

> ৭০-এর কবিতার মূল সঞ্জীবনী শক্তিরূপে কবিতাকে প্রদান করেছে ঘটনাকাল–সম্পৃক্তি, কাব্যপ্রকাশকে করেছে ক্ষমতাবান, শব্দ ও স্তবকসজ্জাকে করেছে আবেগস্পন্দিত। নতুন পুরানো সকল কবি এ প্রসঙ্গ নিয়ে উৎকণ্ঠ ও উচ্চকণ্ঠ, পুরানোদের দিকবদল ঘটে জনপদজীবনের দিকে, নতুনেরা হন দেশপ্রকৃতির জীবন নিয়ে বীর্যবন্ত। (বেগম আকতার কামাল, *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, পৃ. ১৬)

দেশবিভাগ, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ– একের পর এক আছড়ে পড়েছে সত্তরের দশকের কবিদের চেতনা-উপকূলে। আবার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কবিরা মূলত দেশের মাটিকে আকড়ে ধরেই কবি হয়েছেন:

> সত্তরের কবিরা দেশ-মৃত্তিকামূল ও গণমানুষের পক্ষে প্রায় সকলেই অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন, সেহেতু তাঁদের কবিতার প্রধান অবলম্বন হয়ে থাকল স্বাধীন বাংলাদেশের লোকায়ত সম্পদ, এর ভূ-নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি। মূলত প্রকৃতির সাবলীল, সহজ ও নিরাভরণ চিত্র তাঁদের কবিতায় নতুন উজ্জীবন হয়ে এল। এ-প্রকৃতি স্বদেশপ্রেমের অনির্বাণ পথ ধরেই এক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে কবিদের কাছে ধরা দিয়েছে। ষাটের কবিদের উত্তুঙ্গ নগর-মনস্কতা ও নৈঃসঙ্গ্যানুভূতির আত্ম-নিমজ্জিত কবিতার পর সত্তরে কবিদের নিসর্গ-বিচরণ দিয়েছে আত্মার অনাবিল আরাম। সুতরাং নিছক নিসর্গ বর্ণনার বুনন হিসেবেই নয় বরং নৈসর্গিক সম্পদের আকর হিসেবে বাংলাদেশকে উপস্থাপন এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিকতার সংমিশ্রণে সত্তরের কবিতা নতুন মাত্রা পায়। (বায়তুল্লাহ কাদেরী, *কবিতায় শব্দ-সাঁকো*, পৃ. ১৭৭)

সত্তর দশকের কবিগণ নগরজীবনে বসবাসে অভ্যস্ত থেকেও তাঁরা শেকড়-সন্ধানী ছিলেন। মৃত্তিকামূলে তাঁদের শেকড় প্রোথিত ছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা ডুব-সাঁতার দিয়েছেন গ্রামীণচেতনায় লালিত পল্লির কাদাজলে। অন্যদিকে তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণায় ছিলেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাছাড়া সত্তরের দশকের কবিগণ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পথ ধরে জাতিসত্তার অন্বেষায় কবিতায় শিল্পবুনুনি দিতে সচেষ্ট ছিলেন। স্বদেশচেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের কবিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার সোচ্চার দাবিতে :

> এ পর্বের কবিতা তার বৈশিষ্ট্যধর্মী প্রবণতা নিয়ে ভাষিক মাতৃভূমিকে প্রিয়া ও জননীর সমান্তরালবর্তিতায় প্রেম ও ভালোবাসার ধারায় সিক্ত করে তোলে। বাংলার নিসর্গ ও রণাঙ্গনের রোদে-আগুনে-বারুদে পোড়া পরিবেশ এর সহায়ক হয়ে ওঠে। নানা প্রতীকে ও অনুষঙ্গে এর প্রকাশ ঘটে। প্রকাশ ঘটে স্বদেশভূমিতে অবরুদ্ধ শহর বা সামরিক ছাউনিতে পরিণত গ্রামগঞ্জ থেকে বিদেশী মাটিতে শরণার্থী শিবিরের করুণ জীবন

> যন্ত্রণার হাহাকারে। বাস্তুভূমির কোনো বিকল্প নেই, যেমন নেই মাতৃভাষার, জবানি ভাষার। মাটি, মানুষ ও ভাষা এক আশ্চর্য জাদুকরী ত্রিভুজ তৈরি করে। তৈরি করে কবিতার জন্য আকর্ষণীয় কেন্দ্রবিন্দু। (আহমদ রফিক, *কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, পৃ. ২০১)

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির ফসল হয়ে ওঠে সত্তরের দশকের কবিতা। ষাটের দশকের নেতিবাচক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন সত্তরের দশকের অধিকাংশ কবিগণ। সত্তরের দশকের প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের মধ্যে মাহবুব সাদিক (জ. ১৯৪৭), অসীম সাহা (জ. ১৯৪৯), আবিদ আনোয়ার (জ. ১৯৫০), আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-'৯১) প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরা জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোকে ষাটের দশকের কবিদের মতো সজ্ঞানে পরিহার করতে চাননি। বরং জীবনের নেতিবাচক চিন্তা-চেতনার অব্যাহত আত্মপ্রকাশ তাঁদের সৃষ্টিশীলতাকে বেগবান করেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাহবুব সাদিক

মাহবুব সাদিক (জ. ১৯৪৭) সত্তরের দশকের গোড়া থেকেই কবি হিসেবে বিখ্যাত। কবিতার সঙ্গে নিরলসভাবে লিখেছেন উপন্যাস, ছোটগল্প এবং আধুনিক সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ। একাত্তরে, যুদ্ধের শুরুতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েই তিনি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। মাহবুব সাদিকের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম : *সন্ধ্যার স্বভাব* (১৯৭৬), *স্বপ্নচৈতন্যের ডালপালা* (১৯৮৩), *সুন্দর তোমার নির্জনে* (১৯৮৫), *যায় কল্পান্তের কাল* (১৯৮৬), *আদিগন্ত রোদের তিমিরে* (১৯৯৫), *অনন্ত নক্ষত্র চোখ* (১৯৯৯), *অতৃপ্ত ঈশ্বর* (২০০০), *নিরালোকে জলঝর্নার ধ্বনি* (২০০৬), *এখন অপর বেলা* (২০০৮), *বেতাল গান্ধার* (২০১০), *যুদ্ধভাসান* (২০১২), *যে আগুন অমিতাভ* (২০১২), *যে ছিল আমার* (২০১২), *অনিরুদ্ধের বাঁশি* (২০১৫), *নিমগ্নমানব এক* (২০১৮) প্রভৃতি। তাঁর কবিতায় বিম্বিত হয়েছে তাঁরই অবলোকিত বিশ্ব, তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র জগৎ; শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী মানুষের অতীত আবেগ, ঐশ্বর্যের রূপবিভা, ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্প্রতির মিলন এবং বাঙালির শাশ্বত ও বর্তমান জীবনধারা। তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলে নিসর্গ ও নগর, শ্যামলপ্রদেশ ও যন্ত্রবিশ্বের জটিলতা এবং অস্থির আন্তর্জাতিক পৃথিবী। সমরশাসকের প্রেত ও আর্থরাজনীতির চাপে নিষ্পিষ্ট মানুষের উন্মুলসত্তা এবং তুচ্ছবোধ অনুভূত হয় তাঁর কবিতায়। মাহবুব সাদিক অবিস্মরণীয় চিত্রকল্পের সমাবেশে তাঁর আবেগ প্রকাশ করেন এবং সংহত ও কল্পনার মিশ্রণে উপমা-প্রতীক-রূপকে কাব্যভাণ্ডার গড়ে তোলেন। তাঁর কবিতায় ধ্বনিসাম্যের ব্যঞ্জনার সুরমূর্ছনা মিথষ্ক্রিয়ায় ভরে ওঠে। মাহবুব সাদিক স্বল্পপ্রজ কিন্তু শিল্পসচেতন। কবিতার বিষয় ও শৈলীতে তিনি খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কবিতায় সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্মাণে তাঁর পর্যবেক্ষণ প্রবণতা ছিল প্রবল। তিনি ছন্দ-সচেতন কবি। অভিনব চিত্রকল্প রচনায় তাঁর অভিনিবেশি মনোযোগ :

> তাঁর কবিতার শিল্পপ্রয়াস আধুনিক, কবিতার শিল্পকে যথোচিত রেখে জীবনে রাজনৈতিক সত্যকে গুরুত্ব দেওয়া। (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ২১৫)

মাহবুব সাদিকের শিল্পপ্রয়াসের বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। মাহবুব সাদিক মূলত রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতায় বস্তুর প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অবশ্য বস্তুসর্বস্বতার মধ্যেও তিনি আচ্ছন্ন থাকেন না। মাহবুব সাদিকের কবিতায় উচ্চ কোলাহল নেই। তাঁর কবিতা শালীন, শান্ত এবং পরিশীলিত। তাঁর কবিতার প্রবহমানতা শীতল জলের মতো হলেও বক্তব্যে দৃঢ়, জীবনধর্মী এবং সমাজসচেতন।

বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী মাহবুব সাদিক মূলত কবি। কারণ, তাঁর কবিতার অস্থিতে আছে বাংলার ঐতিহ্যচেতনা এবং পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, গ্রামবাংলা-মানবতা-নিসর্গ-চেতনা তাঁর কবিতায় এসেছে সমানভাবে। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় স্বদেশ মা মাটি মানুষ। প্রেম প্রকৃতি নারী অগ্রসরমান করেছে তাঁর কবিতাকে। নাগরিক জীবনকে নির্মাণ করেছেন তিনি গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির মধ্য দিয়েই। জীবনবাদী কবি মাহবুব সাদিক। বিস্ময়কর এক অনুভবপুঞ্জে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ। তাঁর লেখার অস্ত্র প্রকৃতির বিচিত্র উপকরণ :

> অনেক বড় কবির মতো মাহবুব সাদিকও প্রবেশলগ্নে ছিলেন অন্তর্মুখিনতা ও আত্মজৈবনিকতায় নিবিষ্ট। শিল্পের নানা অনুষঙ্গ, ব্যক্তিক আনন্দ-বেদনা, প্রেম ও নান্দনিকতা ছিলো প্রবেশলগ্নে তাঁর কবিতার আরাধ্য বিষয়বস্তু। ক্রমে ক্রমে তাঁর মানসলোকে হানা দেয় কালস্পৃষ্ট মানুষের হাহাকার, তিনি আলিঙ্গন করেন সমাজচেতনা ও জনজীবনলগ্নতাকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পূর্বাপর অনুষঙ্গ প্রাণ পেয়েছে তাঁর শিল্পিত উচ্চারণে, সমকালীন অন্য যেকোনো কবির চেয়ে বেশি মাত্রায়। সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান তাঁর কবিতাকে দান করেছে স্বতন্ত্র মহিমা। (আবিদ আনোয়ার, মাহবুব সাদিক-এর কবিতা বিরোধাভাস ও বিপ্রতীপের রসায়ন, *যমুনা*, পৃ. ২০-২১)

চলমান জীবনের রূপ মাহবুব সাদিকের কবিতায় উঠে এসেছে নতুন মাত্রায়। নিজস্ব মেধায় ও মনীষায় তিনি সহজবোধ্যতায় কথ্যজীবনের সারাৎসার নির্মাণ করেন নান্দনিক ভাবনায় :

> বারো জন মুনিষ কাজ করছিলো মাঠে
> কৃষি-সভ্যতার পীত-কালো রঙে, সুলতানের তুলিতে তৈরি
> তাদের বুকে জ্বলছিলো শক্তির অগ্নিমাধুরী, কোদালের কোপে
> চোখের ভেতর থেকে লাফিয়ে নামছিলো আগামী ফসলের
> সবুজ স্বপ্ন, বল্লমের মতো গড়নপেটন
> তাদের শরীরের পেশি বেয়ে নামছিলো ঘাম,
> অই বিশদ ঘামের জলে সভ্যতার জাহাজ ভেসে আছে,
>
> (মুনিষ, *স্বপ্নচৈতন্যের ডালপালা*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৫৭)

বাংলার কৃষিনির্ভর আদি সভ্যতা মুনিষ শ্রেণির অন্ত্যজ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বারবার মাহবুব সাদিকের কবিতায় জায়গা করে নেয়। মৃত্তিকা কর্ষণের সময় কোদালের কোপে কৃষকের দেহ থেকে অবিরাম ঘাম বেয়ে নামার দৃশ্য আবহমান বাংলার শ্রমজীবী মানুষের। আগামী দিনের সবুজ ফসলের প্রত্যাশায় বাঁচে তারা। তাঁর চেতনার সংরাগ কবিতায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় মানব সন্ততির বেড়ে ওঠা নিয়ে। প্রান্তিক জনজীবনের প্রতি তাঁর এই অবলোকন হয়েছে বৃহত্তর জীবনের ভেতরে প্রবেশ করে। ফসলের মাঠে কৃষাণের কর্মপ্রবাহ, তাদের হাড়ভাঙা শ্রম ও ঘাম ঝরতে দেখেছেন তিনি। কর্মনিষ্ঠ মানব সন্ততিকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে এরা চিত্রকর এস এম সুলতানের তুলিতে আঁকা

কর্মিষ্ঠ মানব। মাহবুব সাদিক বিশ্বাস করেন, একমাত্র কৃষি সভ্যতার পীতকালো রঙের তুলিতে শুধু আঁকা সম্ভব সভ্যতার ছবি। কৃষকের লাঙলের ফলায়, তাদের অগ্নিমাধুরি কোদালের কোপে, বিশদ ঘামের জলেই ভাসিয়ে রাখা সম্ভব সভ্যতার জাহাজ। তিনি গ্রামীণ কৃষক চাষির মর্মমূল সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট, শোষণ-বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছেন– তাদেরই দুই নির্যাতিত প্রতিনিধি আসিরুদ্দি ও করম আলীর জীবন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। আসিরুদ্দির দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন :

> তার সংগ্রামের আবর্তে বহু স্বপ্ন ডুবে যায়,/তার আধাপাকা ধানক্ষেতে কচুরিপানার মতো
> রাক্ষুসে হানা দেয় শক্তিমানের হাত,/তার ছনের বাতায় অমাবস্যার মতো কারো কপিশ হৃদয়
> গুঁজে রাখে অন্যদের সোনা/তার ঘরনীর ইজ্জতের মুখে কালি মাখে গ্রাম্য টাউট
> তার বুকের গহনে অজস্র বেদনার আনাগোনা,/রাত্রিব্যাপী নদীর নির্জন বাঁকে
> সে কেবল ভুল স্বপ্নের নাও বায়–/তার ঘুমহীন চোখে বিলি কাটে
> দারিদ্রের কঠিন চাবুক; (আজ জাগার সময়, *সুন্দর, তোমার নির্জনে*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৭৮)

চলমান জীবন, জড় জগৎ এবং যান্ত্রিক বিশ্ব মাহবুব সাদিককে নাড়া দিয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহ তাঁর মানসলোকে বাসা বেঁধেছে স্বজনের মতো। অর্থাৎ, মাহবুব সাদিক প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবনে পরাবাস্তব চৈতন্যের মিশেলে গড়ে তুলেছেন তাঁর কবিতার জগৎ :

> লালনীয় পরম্পরা-প্রতীতি আর রবি ঠাকুরের লোকধ্যানী পারম্পর্য মাহবুব সাদিকের কাব্যিক চেতনার ফসল বা উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবহার আধুনিক টেকনিক-সর্বস্ব হলেও নতুনত্বকেই আবাহন করেছেন তিনি। তাঁর প্রেমের, প্রকৃতিবাদী কিংবা রাজনৈতিক কবিতায় যেমন লোকপ্রতীতি গভীর অনুধ্যানে নিহিত তেমনি মুক্তিযুদ্ধের কবিতায়ও ব্যবহার করেছেন ঐতিহ্যিক পাটাতন। (মাহবুব হাসান, এ-জীবন মানুষের সৃষ্টির বেদনায় গাথা, *যমুনা*, পৃ. ২১৩)

মাহবুব সাদিকের নিবিড় কবিতাপাঠে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি, যা তাঁর স্বভাবজাত। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী অস্থিরতা ক্লান্তি হতাশা তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

মাহবুব সাদিকের কবিতায় লোকসঞ্জাত ভাবনা অনুরণিত হয় নিজ গ্রাম, গ্রামে বসবাসরত মানুষ, সর্বোপরি নিজের জননীকে ঘিরে। মা, মাতৃভূমি ও মানুষ স্বদেশ চেতনায় তাঁর মননে অবগাহন করে। তিনি মায়ের মুখ আঁকতে গিয়ে সমগ্র বাঙালি মায়ের মুখ এঁকেছেন। মায়ের কাঁথায় যে জীবন ও সংগ্রাম আঁকা হয়েছে তা সামাজিক জীবনের চিত্র হলেও তা ছাপিয়ে উঠেছে সর্বজনীন মায়ের ও দেশের ছবি :

> তাঁর কাঁথার কাপড়ে বোনা বাংলার ঘাসবনে নেচে গেছে বেনেবউ;
> কাঁথার বাইরে দোলা কপিশ আঁধার থেকে মানুষেরই পাথরহৃদয়

উঁচুমুখ কিষানের অনাবৃত বুকে গেঁথে গিয়েছে বল্লম–

এই সব আঁকা আছে মায়ের কাঁথায়; (বাঙালি মায়ের মুখ, *অনন্ত নক্ষত্র চোখ*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২০৯)

মাহবুব সাদিকের কবিতায় প্রকৃতি নিমগ্নতা ও সৌন্দর্যচেতনা এসেছে গ্রামবাংলাকে ঘিরে। আবার প্রকৃতির ধূসরতা ও সৌন্দর্যের অবক্ষয়ও সমানভাবে এসেছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত দেখে :

ভালো হয় ধ্বংস থেকে উঠে এসে জীবন বদলে নিলে

মানুষের সাথে প্রজাপতি অথবা পাখির,

নৈঃসঙ্গ্যের সাথে সমুদ্রকল্লোল কিংবা

মেধার বদলে এক নীল জ্যোৎস্নারাত– (দূরস্মৃতি, *সুন্দর, তোমার নির্জনে*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৮৩)

মেহনতি মানুষের প্রতি, স্বদেশের প্রতি মাহবুব সাদিকের মমতা ও দায়বদ্ধতা সৎ ও আন্তরিক। তাঁর কবিতায় এই মমতা ও দায়ভার অনায়াসে প্রতিভাত হয়। মাহবুব সাদিকের কবিতায় ছায়া ফেলেছে নিসর্গ-নগর, শ্যামল প্রান্তর, যন্ত্রবিশ্বের জটিলতা ও অস্থির আন্তর্জাতিক পৃথিবী এবং আর্থ-রাজনৈতিক চাপে নিষ্পিষ্ট মানুষের উন্মুল সত্তা ও তুচ্ছতাবোধ। চঞ্চল, চলিষ্ণু সংগ্রামশীল মানুষের জীবন থেকে তাঁর কবিতার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। তারাকান্দির কদবানু, রংপুরের শহরালি, অজানা জনপদের হারু জলদাস, ঢাকার শুক্কুরালি, জমিলা-জয়গুন, ফুলচাঁন মুচি, ফুটপাথের জোবেদালি– এমনি অনেক সুবিধাবঞ্চিত, ভাগ্যাহত মানুষের কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তিনি পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনের করুণ চিত্র কাব্যময় করেছেন। বস্তুত, মাহবুব সাদিকের বামপন্থী আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপ্নভঙ্গ হলেও তাঁর হৃদয় থেকে স্বদেশ ও মেহনতি মানুষের সংগ্রামশীল জীবন মুছে যায় নি। এক সাক্ষাৎকারে মাহবুব সাদিক বলেছেন :

> বিশেষ অভিনিবেশ নিয়ে শুনেছি বাংলার জনগণের মুখের কথা। তাদের মুখের বুলিতে কত যে চমৎকার শব্দ রয়েছে কান দিয়ে শুনে প্রাণ দিয়ে অনুভব না করলে কখনো তা বোঝা যেতো না। আমার কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে সেইসব লোকশব্দ। (উদ্ধৃত : শফিক ইমতিয়াজ, সাক্ষাৎকার, *যমুনা*, পৃ. ৫৭৭)

এই সাক্ষাতের অন্যত্র তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অন্তেবাসি, প্রান্তিক বাঙালি জাতির জীবনরূপান্তর বিষয়ে বলেছেন :

> সেইকালে জীবনের রূপান্তর ঘটেছে– তবে ধনিকের-বণিকের-উচ্চবিত্তের নয়। তারা ছিলেন ধন বাঁচিয়ে জীবনের টানে পলায়নপর। অন্যদিকে জেগে উঠেছিলো পুরো বাংলাদেশ, বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী– মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রজনতা। আমি সেইকালে অন্তরঙ্গ চোখে লক্ষ করেছি আমাদের কৃষক-শ্রমিক এবং গাঁয়ের সাধারণ মানুষ কী গভীর দেশপ্রেমে বুকের রক্ত ঢেলে বাংলার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তবে গভীর দুঃখের কথা এই যে সেইসব সাধারণ যোদ্ধার কথা আমরা বিজয়ের পরেই ভুলে গেছি– করেছি অবহেলা। (উদ্ধৃত : শফিক ইমতিয়াজ, *যমুনা*, পৃ. ৫৮০)

দেশ, মাটি, স্বদেশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি এসময় মুক্তিকামী মানুষেরা। অভিন্ন মুক্তির আবেগে ধারণ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা বাংলাদেশের মুক্তির কামনায়। মাহবুব সাদিকের 'বঙ্গদেশ' কবিতাটি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় :

> স্বস্তির দেয়ালে আজ উল্কি আঁকে উদ্বেগের তুলি
> এ কথা কি করে ভুলি বাংলাদেশ শত্রুঘেরা, আর
> রক্ততৃষায় শুকিয়েছে এদেশের মাটি! বুলেটের গ্যাস
> যেমন জীবন্ত রাখে স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র– তারই মতো
> নিয়ত সক্রিয় থাকি শত্রুহননের দারুণ উৎসবে; (বঙ্গদেশ, *সন্ধ্যার স্বভাব*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২০)

গ্রামীণ জনপদের এবং শহুরে মানুষের আনন্দ বেদনা, উল্লাস-উৎকণ্ঠা, হিংস্রতা ভালোবাসা এবং তাদের অশ্রুর মুহূর্তগুলো নিয়ে মাহবুব সাদিক শব্দের মালা গাঁথেন। রূঢ় ও বাস্তব জীবনের মিথষ্ক্রিয়া তিনি নিবিড়ভাবে নির্মাণ করেন। একাকিত্বের গাঢ় অনুভব ও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হন তিনি। কল্লোলিত জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি কালস্পৃষ্ট মানুষের ছবি আঁকেন। ব্যক্তিমনের কেন্দ্রমূলস্পর্শী অনুভবের ব্যাকুলতাকে তিনি বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেন। ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রত্যক্ষ উৎসারণই তাঁর কবিতার মূল শক্তি। বাংলার মোহময় প্রকৃতি তাঁকে অভিভূত করে। নারী-নিসর্গ, শিল্প-সমকালীনতা ও ইতিহাসচেতনা এই গুণগুলোর মিশেলে তাঁর চেতনাকে পৌঁছে দেয় এক অচিহ্নিত উপত্যকায়। তাঁর কবিতাকে তা করে তোলে মহার্ঘ। চাষার হৃদয়, প্রিয় ঋতু, হেমন্তের শীত, চিল-প্যাঁচা, বাংলার কুয়াশা-কুহক, হলুদ বাদামি খড়, নক্ষত্রের তলে নদী প্রভৃতি অজস্র শব্দচিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার নিসর্গ প্রকৃতিকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির লক্ষে মাহবুব সাদিক আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর কবিতায় গ্রামীণ জীবনের ছবি থাকলেও নাগরিকতার মননীয় নির্যাসটিও প্রোজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে অবলীলায় :

> একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতোই পরবর্তীকালে মানুষের জীবনযুদ্ধও তাঁর কবিতায় শিল্পিতভাবে চিত্রিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর ঢাকা নগরীর জীবনচিত্র নিজেও বিপ্রতীপতায় ভরা। (আবিদ আনোয়ার, ষাটের দশকের কবিতার আধার ও আধেয়, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ২৩৭)

মাহবুব সাদিক চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় সমসাময়িক গ্রামীণ বাস্তবানুগ জীবনের সংস্কৃতি পরম মমতায় ও স্নিগ্ধতায় এঁকে যাচ্ছেন।

মাহবুব সাদিক একজন সমাজসচেতন স্বদেশচেতনা সঞ্চারী কবি। পৃথিবীর পথে পথে গড়ে ওঠা সভ্যতার বাঁক ও নানা সৌন্দর্য তিনি অবলোকন করেছেন। যন্ত্রনির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তাঁর হৃদয় পড়ে থাকে পূর্ব পৃথিবীর শ্যামল বাংলার কোণে। মির্জাপুরের দুপুর, বিকেলের মিষ্টি রোদে অলস ভাবনা বা চিলেকোঠার পূর্ণিমা মাহবুব সাদিকের প্রিয় বিষয়। স্বদেশের প্রকৃতি এবং

লোকায়ত জীবন তাঁকে আকর্ষণ করে। রাজনীতিসচেতন এবং সৌন্দর্যপ্রেমী কবিসত্তা মাহবুব সাদিকের মধ্যে সমান্তরাল বেগে ধাবমান। তাঁর কবিতার পরতে পরতে নির্মিত হয়েছে অন্ত্যজ জীবনের করুণ ও রাঙা ছবি, যা আবহমান বাংলা কবিতার অঙ্গে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। তিনি জীবনকে চিত্রিত করেছেন অন্তর্মুখী ভাষায়। তিনি মনোজগতের রহস্যধারার চিত্রকল্পই কেবল নির্মাণ করেননি। তাঁর প্রধান বিষয় কালপৃষ্ট মানুষ এবং প্রধান কাজ তাদের অস্তিত্ববোধের চিত্রকল্প রচনা। তিনি নিজেই বলেছেন, 'কালপৃষ্ট মানুষের জীবনকে আমি সংহত চিত্রকল্পের মধ্যদিয়ে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি।' (উদ্ধৃত : মইনুল আহসান সাবের, সাক্ষাৎকার, *যমুনা*, পৃ. ৫৭৩) নিপুণ প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ শক্তি থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর লোকসঞ্জাত জীবনের চিত্র ও চিত্রকল্প ভাবনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসীম সাহা

অসীম সাহা (জ. ১৯৪৯)র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়* (১৯৮২), *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৩), *কালো পালকের নিচে* (১৯৮৬), *পুনরুদ্ধার* (১৯৯২), *উদ্বাস্তু* (১৯৯৪), *মধ্যরাতের প্রতিধ্বনি* (২০০১), *অন্ধকারে মৃত্যুর উৎসব* (২০০৬), *মুহূর্তের কবিতা* (২০০৬), *ম-বর্ণের শোভিত মুকুট* (২০১৫) প্রভৃতি।

অসীম সাহা রোমান্টিক কবি। তিনি কবিতা লেখেন মূলত রোমান্টিকতার মায়া-অঞ্জন চোখে মেখে। স্বদেশ চেতনায়, ব্যক্তি প্রেমে ও দেশপ্রেমে আচ্ছন্ন তিনি। 'উপমা-চিত্রকল্পের সমাহার সত্ত্বেও সরল একটা ভাষাভঙ্গি তাঁর কবিতাকে বিবৃতি-প্রধান করে তোলে। তবে তাঁর কাব্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য একটা সহজ প্রবাহ, বক্তব্যের স্পষ্টতা ও অনুভূতির গাঢ়তা।' (খালেদ হোসাইন, *বাংলা ছন্দের মানচিত্র*, পৃ. ৪৫২) অসীম বেদনাবোধের মধ্যে অসীম সাহা সাঁতার কেটে নিরন্তর রূপকাশ্রয়ে কবিতার ভুবন রচনা করেন। পাশাপাশি তিনি কথাশিল্পী হওয়ায় তাঁর কবিতায় যে নিবেদন, কথাশিল্পের বিষয়ই তাতে প্রাধান্য পায়। তিনি সাফল্যের সঙ্গে বস্তুভাবনার সঙ্গে শিল্পভাবনার সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ ও সাহসী কণ্ঠের ধারালো উচ্চারণে বাংলাদেশ এবং প্রায় সমগ্র বিশ্ব এক অসাধারণ ব্যাপ্তি নিয়ে তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। অসীম সাহা কবিতার বিষয়ে যেমন অভিনব, তেমনি প্রেমের আকুতিলীন অনুরাগের ছোঁয়ায়ও মর্মভেদী। কবি অসীম সাহা কবিতায় পরিমিতিবোধে বিশ্বাসী। তাঁর জবানিতে বলা যায় :

> কবিতা যেহেতু অলৌকিক অস্তিত্বের ধারক নয়, সেহেতু জীবনের মধ্যেই তার উদ্ধার, বিস্তৃত জীবনেই তার ক্রম-অভিসার। কুমার যেমন করে মাটির প্রতিমা গড়ে, কাঠামো আর মাটির কৌশলে সৌন্দর্য আরোপ করে, তেমনি করে কবিকেও চেতনার গহনে একটি একটি করে ভরে দিতে হয় সৌন্দর্যের সুন্দরতম ফুল। (অসীম সাহা, *প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা*, পৃ. ৫৭)

অসীম সাহা নিরন্তর তাঁর কাব্যভাবনায় পরিমিতিবোধের অনুসরণ করে চলছেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে কবিতায় অসীম সাহার পদচারণা হলেও সত্তরের দশকের প্রথম দিক থেকে তিনি কবিকর্মে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। বাংলা কবিতার ভুবনে এক নতুন নিশানা ও আবর্তের পথিক হয়ে ওঠেন। অসীম সাহা সত্তরের দশকের কবিদের মধ্যে অন্যতম। ষাটের শেষ পর্যায় ও সত্তর দশকের কাব্য-আন্দোলনের সব শর্ত পূরণ করেই তাঁর কবিতা অগ্রগামী হয়েছে :

> বিচিত্র বিষয়মুখী হলেও তাঁর স্বদেশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সমকালীন জীবনকে তিনি চিত্রিত করেন তাঁর কবিতায় অত্যন্ত শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে। ছন্দ-সচেতন বলে তাঁর যৎসামান্য গদ্যরীতিতে রচিত কবিতায়ও থাকে

> চমৎকার এক দোলা। 'বিরহকাতর এক দগ্ধ বাউলিনী' শিরোনামের কবিতা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি তাঁর স্বদেশকে দেখেছেন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নির্বিকার বসে-থাকা এক দগ্ধ বাউলিনীর রূপকে। দেশি-বিদেশি কুচক্রীরা এই বাউলিনীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। নিয়ত যাতনায় পিষ্ট হলেও সে কেবল এক নীরব দর্শক। কবির দেশমাতৃকা এমন একটি রূপকে চিত্রিত হওয়ার ফলে সমগ্র কবিতাটিকেই সুবিশাল একটিমাত্র চিত্রকল্প বলে মনে হয়। ...অসীম সাহা রচনার প্রাচুর্যে নয়, উৎকর্ষে বিশ্বাসী। (আবিদ আনোয়ার, ষাটের দশকের কবিতার আধার ও আধেয়, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ২৪২-২৪৩)

কবিতার উৎকর্ষে পরম বিশ্বাসী অসীম সাহার কাব্যের বিশেষ উজ্জ্বল অনুষঙ্গ হলো 'অন্ধকার'। অন্ধকার মানুষের মনের গভীরে সব ধরনের নেতিবাচকতা, বিশৃঙ্খলা, অস্তিত্বহীনতা, যা ক্রমশই টেনে নিয়ে যায় অস্তিত্বময় জগতের বাইরে এক অন্য ধরনের নির্জনতায়। জীবনের এই অমানবিকতা অসীম সাহাকে বাধ্য করে অন্ধকারের নতুন ভাষ্য দিতে। নিকষ অন্ধকারের ভেতরও সীমাহীন প্রোজ্জ্বল অসীম সাহার চিন্তা-চেতনায় স্বদেশভাবনায় বাংলার চিত্র বাস্তবানুগ হয়ে প্রভাস্বর হয়েছে :

> ধুলোবালি মাখা, রুক্ষ, এলোমেলো কয়েকগুচ্ছ চুল
> ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সে বসে আছে বিরহকাতর এই পূর্ব-উপকূলে।
> তাকে দেখে মনে হয়, স্বপ্নপ্রাসাদ থেকে
> ভিখারিনি বেশে মীরা এসেছে এখানে।
>
> (বিরহকাতর এক দগ্ধ বাউলিনী, *পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়*, পৃ. ৯)

বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় শোষণের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে উপর্যুক্ত কবিতায়। স্বদেশ তাঁর কাছে মনে হয়েছে কখনো দগ্ধ বাউলিনী, কখনো কসাইখানা :

> বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'সেই বিরহিণী দগ্ধ বাউলিনী' হয়তো মুক্তির একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বারই উদঘাটন করেছিল, কিন্তু পচাঁত্তর পরবর্তী নৃশংসতায় ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশে সেই সম্ভাবনা তো তিরোহিত করে দিয়েছিল ঘাতকচক্র। সঙ্গত কারণেই কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো অনির্বাণ শাশ্বত সত্য হয়ে আছে আজো। বাংলাদেশ এক অন্তহীন প্রতীক্ষায় আজো পথ চেয়ে আছে মুক্তির। এখানেই কবিতাটির অনিবার্যতা। (নাসির আহমেদ, দ্বান্দ্বিক দক্ষতায় উত্তরণের কবি অসীম সাহা, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১১)

অসীম সাহা তাঁর কবিতার রক্তধারায় নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন বারবার। বাঙালি যে সংকর জাতি তা তিনি অনুভব করেছেন মনে মননে ও কবিতার ভাষায়। ষাটের দশকের কবি রফিক আজাদ এবং মুহম্মদ নূরুল হুদার মতো অসীম সাহাও 'বংশের রক্তপরম্পরা' অনুসন্ধিস্যু দৃষ্টিতে অন্বেষণ করেছেন তাঁর কবিতার বস্তুসম্ভারে। এই দেশ মাটি মানুষের প্রতি অসীম সাহার টান অফুরান। মাটির মায়ায় মেঠো পথের ডাকে কবি চৈত্রের রোদ্দুরে কান পেতে ঝর্ণার কলতান শুনতে পান :

> মেঠো পথে যেতে-যেতে/দু'পাশের আলুথালু খর্খরে জমি ইশারায় ডাকে,
> আমি আইলের মাঝখানে উপুড় হয়ে বসে/যে-মাটির শুকনো ঢেলা তুলে আনি/চৈত্রের রোদ্দুরে চৌচির–
> তার ভেতরে ঝর্ণার কলতান শুনতে পাই,/তার ভেতর শুনি শ্রাবণ-মেঘের মন্দ্র কণ্ঠস্বর।

(টান, *পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়*, পৃ. ৫২)

বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও স্বদেশ ভাবনায় তাড়িত ছিলেন অসীম সাহা। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে অসীম সাহা কোলকাতা শহরের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে ঘুরে ঘুরে শরণার্থীদের করুণদশা অবলোকন করেন। তাই নিরস্ত্র বাঙালি এই সব শরণার্থীদের চিত্র ফুটে উঠেছে অসীম সাহার 'শরণার্থী' কবিতায় :

কারা যায় ক্ষুধিত হৃদয় নিয়ে তীব্রতম অন্ধকারে আজ?/দু'পায়ে শৃঙ্খল বেঁধে
কারা যায় নিজস্ব সংসার থেকে/স্বজনের চিতা ফেলে
ভোরের সূর্য ফেলে— (শরণার্থী, *অসীম সাহার সেরা কবিতা*, পৃ. ১১৫)

পলল সৃজিত কবি অসীম সাহা চিরকাল কবিতাশিল্পে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রেখেছেন। নিজের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে এই বাংলার অতীত ইতিহাস উদ্ধারে তাঁর মনোযোগ আত্যন্তিক। বাঙালির পূর্বপুরুষের জন্মভিটা নিয়ে উৎসুক প্রশ্ন অসীম সাহার। আমরা কী অস্ট্রিক নাকি দ্রাবিড়? আমাদের নিকট-আত্মীয় কারা? পূর্বপুরুষের অতীত ঐতিহ্য উদ্ধারে নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল তাঁর। তাই 'পুনরুদ্ধার' কবিতায় এ সব বিষয়ের রেখাপাত করেছেন অসীম সাহা :

তোমরা কোথায় ছিলে, কোন দেশে ঘর, বলো, কোন জ্ঞাতি
তোমাদের নিকট-আত্মীয়, ব্যাপক হৃদয় জুড়ে কোন
ধ্বনি বেজে ওঠে আজো? তোমাদের পিতা-পিতামহদের
রক্তে ব্রহ্মদেশ কথা কয়, উত্তর-চীনের নদী ভেসে
আসে হৃদয়ের তলদেশে বেয়ে– বুঝি না অস্ট্রিক নাকি
দ্রাবিড়ীয়– অথবা থেকেছো বুঝি পাশাপাশি বহুদিন?
তা হলে ভেঙেছো কেন, ঝরে গেছো কেন প্রিয় মালা, বলো,

(পুনরুদ্ধার, *পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়*, পৃ. ১৬)

আদিম সমাজব্যবস্থা থেকে ইতিহাসের ভঙ্গুর পথ বেয়ে বেয়ে আমাদের অবস্থান আজ এই বাংলায়। এই ভরা শস্যের শ্যামল বাংলায় যারা আজ বসতি গড়েছেন, সুখে দুঃখে কৃষিকর্মের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যারা আজ পলল-বিধৌত বাংলায় স্থিত হয়েছেন, তাদের নিয়ে অসীম সাহা কবিতার পঙক্তি রচনা করেছেন 'নবজন্ম' কবিতায় :

নিবিড় তমসা-ভেদি আকাঙ্ক্ষার বীজ থেকে উঠেছিলো
ধুলোমাটিঘেরা এক সভ্যতা, মগ্ননিবিড় বালুচর।
মনোলতা বেয়ে-বেয়ে এমনি করেই তার উঠে আসা,
এমনি করেই তার কৃষিকাজ, ঢেলামাটি ভেঙে-ভেঙে
ফসল ফলানো, বিষধর সাপেদের সাথে ঠোকাঠুকি।

(নবজন্ম, *পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়*, পৃ. ২১)

অসীম সাহা উপর্যুক্ত কবিতায় ব্যক্ত করেছেন, আজ আমরা আর্য না অনার্য তা আর নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই। কারণ, বাঙালি জাতি এখন পূর্ণতায় সমাসীন। 'প্রতিদিন উঠে আসি লাঙলের ফালে বিঁধে জানকীর হাতে' প্রাচীন মিথের শক্তিতে বাঙালিকে প্রভাস্বর করেন তিনি। কৃষিজ, বীজবোনা, সুচে-সুতোয় কারুকাজ, জলসেচ গ্রামবাংলার ঐতিহ্যলালিত পূর্বপুরুষের অধিকার থেকেই বাঙালির নবজন্ম ঘটে। অসীম সাহা বারবার ফিরে গেছেন অতীতের স্মৃতিঘেরা মনোভূমিতে। বাংলাদেশের চিরায়ত সংস্কৃতিতে দোলাচলচিত্ততা, দেশভাগের করুণ যন্ত্রণা, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, লক্ষ লক্ষ বাঙালির উদ্বাস্তু হওয়া, অস্তিত্বের সংকট, স্বদেশের জন্য উত্তাপ– এ সবই নিজের সঞ্চিত অভিজ্ঞানের আলোকে তাঁর কবিতায় বাঙ্ময় করেছেন :

> সীতাও তো একবার নির্বাসন শেষ করে ফিরে গেছে ঘরে।
> পঁচিশ বছর আগে এইখানে আমাকেও রেখে চলে গেছো;
> পিতৃমাতৃহীন, প্রিয়পরিজনহীন কেটে গেলো পঁচিশ বছর।
> আমি কি সীতার চেয়ে বেশি অপরাধী?
> তা না হলে এ রকম নির্বাসন -দণ্ড দিলে কেন?
> মাতৃভূমিহীন এই অচেনা স্বদেশে
> পঁচিশ বছর ধরে আমি শুধু খুঁজে ফিরি আমার স্বদেশ। (উদ্বাস্তু-৫, *উদ্বাস্তু*, পৃ. ৩০)

উদ্বাস্তুবিষয়ক কবিতায় অসীম সাহা অস্তিত্বের সংকট অনুভব করেই শিল্পভাষ্য সৃষ্টি করেন। আশ্রয়ের করুণ আর্তি থাকে পৃথিবীর সব মানুষের। নিজের মাতৃভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে মানুষ যে দেশেই যাক, তা কখনোই তার নিজের হয়ে ওঠে না। এই চরম সত্যটিকে কবি অসীম সাহা তুলে ধরেছেন ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে এবং ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। স্বদেশের নরম কাদামাটি, জল, তৃণলতা, দিঘি তাঁকে নস্টালজিক করে তোলে। শৈশব কৈশোরের গ্রাম, গ্রামের পুকুরপাড়ে বকুল কুড়ানো, ঠাকুরবাড়ির মাঠে কানামাছি খেলা, দরগাখোলায় ছুটে যাওয়ার স্মৃতিরোমন্থন তাঁকে ভাবায়, কাঁদায়। এখানে কবি বারবার সীতার বনবাসের সঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের নির্বাসনের প্রসঙ্গ টেনে প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক মিথে সন্তরণ করেছেন। সীতা, অশোকবন, পবনপুত্র হনুমান, কারবালার অনুষঙ্গ কবিতায় সংযোজন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। প্রবল স্রোতের মতো ফেলে আসা স্মৃতি কবির মাথায় ঘূর্ণির রেখা তৈরি করে। এক সাক্ষাৎকারে অসীম সাহা বলেন :

> কোনো বৈষয়িক কারণে আমি কবিতা লিখি না। কিংবা কোনো কলাকৈবল্যবাদী চিন্তা থেকেও আমার কবিতা উৎসারিত হয় না। মানুষ আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বিশেষ করে গ্রামসমাজের তৃণমূল মানুষ। তাদের জীবন, তাদের দারিদ্র্য, তাদের হাহাকার, আর্তি এবং যন্ত্রণা আমার হৃদয়কে আন্দোলিত করে। শিল্পের চেয়েও তারা আমার কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আমি যদি কবিতা নাও লিখতাম তাহলেও কোনো

না কোনোভাবে এই সব মানুষের জন্য কাজ করতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। তাছাড়া অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমার স্বদেশ, আমার এই মাতৃভূমি, এই জলবায়ু, এর প্রতিটি ঘাসের ডগা আমাকে কবিতা লিখতে প্ররোচিত করে। (উদ্ধৃত : আমিনুর রহমান সুলতান, কবি অসীম সাহার সঙ্গে কথোপকথন, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ৮২)

দেশভাগ অসীম সাহার মনে মননে এবং তাঁর কবিতায় স্থায়ী ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন অসহায় মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশের বাইরে মানবেতর জীবনে কষ্টের মধ্যে বসবাসের সাক্ষী। এক সাক্ষাৎকারে অসীম সাহা উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণার কথা বলেন এভাবে :

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় যখন বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর লুট হতে থাকে, নারীরা সম্ভ্রম হারায় এবং অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা দেশত্যাগ করে চলে যায়, তখন আমি অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছি। আমার বাবা যখন দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় আমার বড় বোনকে এক অসম্ভব অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রায় অনাত্মীয় পরিবেশে কলকাতার এক হোস্টেলে ভর্তি করে দিয়ে আসেন এবং বাবা-মা তাদের চোখের জলে ভিজতে থাকেন তখন আমি টের পাই পরগামী হবার যন্ত্রণা কোথায়? মাঝে মাঝে আমার বড়দির চিঠিতে যে আর্ত-হাহাকার ফুটে ওঠে তা আমাকে অশ্রুসজল করে তোলে। তখন থেকেই আমি ভাবতে থাকি সারা পৃথিবীর যেখানেই সংখ্যালঘু মানুষেরা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে কিংবা ভয় ও সন্ত্রাসের ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় তাদের মতো অসহায় পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেউ নেই, সেটাই আমার ভিতরে উদ্বাস্তু সিরিজের কবিতা লিখতে প্ররোচিত করে। (উদ্ধৃত : আমিনুর রহমান সুলতান, কবি অসীম সাহার সঙ্গে কথোপকথন, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ৮৪)

কথাশিল্পের ভঙ্গি এবং নাট্যিক আঙ্গিকে কবি অসীম সাহা রচনা করেন 'উদ্বাস্তু-৮' সংখ্যক কবিতা। এই কবিতায় আমাদের পূর্বপুরুষ আর উত্তর পুরুষের সংলাপ চলে অবিরল। এখানে তিনি পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি শান্তশ্রী 'ঘুরি' নামক গ্রাম খুঁজতে এসে দেখে যমুনার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব। হারিয়ে যাওয়া গ্রাম খুঁজে না পেয়ে 'খোকনের বুকে বাজে যমুনার উতরোল ঢেউ' :

কৌতূহলী গ্রামের কৃষক এসে ভিড় করে;
ছেলে, বুড়ো অবাক তাকিয়ে থাকে অতিথির দিকে।
'সাতচল্লিশে এখানেই ঘুরি নামে গ্রাম ছিলো–
আমার স্বামীর ভিটে, দেখতে এসেছি ভাই;
চুয়াল্লিশ বছর পর দুই চোখ ভরে আমি
দেখে যাবো স্বামীর স্বদেশ। (উদ্বাস্তু-৮, *উদ্বাস্তু*, পৃ. ৩৫)

দেশভাগের স্মৃতি ভুক্তভোগীদের মর্মন্তুদ যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নদীর ভাঙন আর দেশভাগ কবির মনোবীণায় সমান ও সমান্তরাল। যমুনার থাবায় আদিনিবাস ঠিকানাবিহীন হয়ে পড়ে। আত্মজকে ভেতরের হাহাকার বোঝানোর জন্য অপরূপ শব্দের শরীরে অজস্র স্মৃতি আর বেদনার জলে মথিত হয়। অবসন্ন ক্লান্ত দেহে অবশেষে নদীর পাড়ের নরম মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘরে ফেরে।

স্বদেশপ্রীতির অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য হয়ে দাঁড়ায় মূর্তমান কবিতা। উদ্বাস্তু জীবনের করুণ আর্তি ও যন্ত্রণাবিদ্ধ হাহাকারের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি মূলত সারা পৃথিবীর উদ্বাস্তু মানুষের রক্তক্ষরণের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এ কারণেই অসীম সাহা উদ্বাস্তু কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন–'পৃথিবীর সকল উদ্বাস্তুকে'।

অসীম সাহা লোকপ্রিয়তার কবি। মাটির পৃথিবীতে তৃষ্ণাকাতর ভূমির কথা ব্যক্ত করেছেন। আষাঢ় গগনে মুষলধারার অপেক্ষায় মাটিতে শয্যা পেতেছেন কবি। তাঁর উচ্চারণে ধ্বনিত হয়– কালীগঙ্গার বিষাদপাড়ের মাঝি-মাল্লা-চাষিদের জীবন, শকুনি দিঘির পাড়ে ভাঙা ঘরে জ্বলে ওঠা রানুদির সন্ধ্যাপ্রদীপ কিংবা ঠাকুরবাড়ির মাঠে হারিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তু। এরা সকলেই হয়ে ওঠে অসীম সাহার আত্মার সারথি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোনো এক চেনা রেলস্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়েও কবির মানসিক বোধ বিবর্ণ হয় বহুকৌণিক বেদনায় :

রাবারের খাপে সজ্জিত এক অক্ষম ও ন্যুব্জ ভিখিরি
আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে–
আমি বিরক্ত, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ধম্‌কে উঠি, 'ছাড়ো, ছাড়ো।'
তখন সেই ন্যুব্জ ভিখিরির আহত কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ শুনে
বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই– 'আমারে চিনলা না দাদাভাই,
'আমি তো মদন।'
শব্দহীন আমিও তাকিয়ে থাকি, ট্রেন চলে যায়...
মদনের দুই চোখ মিশে যায় মেঘনার জলে! (উদ্বাস্তু-১, উদ্বাস্তু, পৃ. ২৪)

বাংলার লোকায়ত জীবনদর্শন অসীম সাহাকে তাড়িত করে। তাঁর কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে ছড়িয়ে আছে গ্রামবাংলার প্রাত্যহিক ধুলি-মলিন দুঃখ সুখ। অসীম সাহা খুবই সহজ সরল দৃষ্টিতে এই বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন এবং কাব্যময় ব্যঞ্জনার দ্যুতিতে তাঁর কবিতা নবতর রূপ পরিগ্রহ করেছে :

অক্ষম ভিখিরি নই– উদাসী বাউল
জীর্ণ বেহালা হাতে ঘুরিফিরি, একান্ত কিছু কিছু ভুলে
নিজের ঝুলিতে বেঁধে কেঁদে-কেঁদে মানুষের দোরে
পৌঁছে দিই জাগরণ-সংগীত কাক-ডাকা ভোরে। (উদাসী বাউল, *কালো পালকের নিচে*, পৃ. ৫৭)

আউল-বাউলের বাংলার মাটিতে বাঙালির অস্তিত্বের শেকড় প্রোথিত আছে দীর্ঘকাল জুড়ে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই কাউকে বাতাসের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে বা তাড়াতে পারে না। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সন্তানের গভীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যেমন কঠিন কাজ, তেমনি এই পললবিধৌত মৃত্তিকা থেকে

শেকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। মাটির গভীরে শেকড় ছড়ানো আর টবে শেকড় ছড়ানো এক নয়। অসীম সাহার কবিতায় শেকড়-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাই স্পষ্ট।

অসীম সাহা কবিতায় বারবার বাংলার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বিভেদের রেখায় এই বাংলায় অতর্কিত হামলা হয়েছে। দেশভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রিয় মাতৃভূমিকে পেছনে ফেলে শরণার্থী হয়ে কাটাতে হয়েছে বিদেশের মাটিতে। সেই করুণ স্মৃতি কবিকে তাড়া করে। আত্মবিশ্বাসী কবি জানেন তিনি আবার ফিরে আসবেন এই বাংলার মাঠ মাটি ও মানুষের পরম ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় :

> আমি জানি না, সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর গ্রামটি
> আগের মতোই আছে কি না,
> আমি জানি না, সেই তরঙ্গিত জীবন,
> সভ্যতার আক্রমণ থেকে সুদূর সেই শাদামাটা
> স্বাভাবিক মানুষগুলোর জীবন এখনো তেমনি আছে কি না!
>
> (স্মৃতি-ভারাতুর রাত, *কালো পালকের নিচে*, পৃ. ৩২)

রোমান্টিক কবি অসীম সাহা বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য ও লোকায়ত জীবনকে বস্তুপুঞ্জ করে কবিতার ঘর নির্মাণ করেছেন। তাঁর কাব্যভাবনায় সবসময় এই বাংলার আদি অকৃত্রিম কৃষক-চাষা, মাঝি-মল্লা উপাদান যুগিয়েছে। কবি মাঝে মধ্যে মনুষ্য-সৃষ্ট অনাচারে কষ্ট পেয়ে জন্মভূমি ছেড়ে সাময়িক চলে গেলেও গ্রামবাংলার মাটির টানে ফিরে আসেন। ঘুরে ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শয্যা রচনা করেন স্নিগ্ধ সবুজ বাংলার আলপথ ধরে। ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সমকাল যেমন অসীম সাহার কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি পুরাণপ্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে দেশজ সংস্কৃতির আবহে :

> অসীম সাহা তাঁর কবিতায় বক্তব্যের সঙ্গে শৈলীবৈচিত্র্যের অপরূপ মেলবন্ধন তৈরিতে পারঙ্গম; এই দিক থেকে তাকে খুব সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। এছাড়াও তাঁর কবিতার আঙ্গিকবৈচিত্রের ভেতর রয়েছে বাংলা কবিতার ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণাশ্রয়ী জগৎ। (মাসুদুল হক, অসীম সাহার কবিতায় পুরাণ, প্রেম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৬)

সমকালীন রাজনৈতিক কূটচাল লোকাশ্রয়ী হয়ে তাঁর কবিতার সমগ্র শরীর জুড়ে পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে :

> সমস্ত ভুবন জুড়ে বেহুলার চির অভিসার।
> থামাও,
> থামাও ভেলার দুঃখ, লক্ষ্মীন্দর জাগো একবার।
> বেহুলার প্রার্থনায়
> কেঁপে ওঠে সমুদ্রের ঢেউ

লক্ষ্মীন্দর পড়ে থাকে কলার ভেলায়। (বেহুলার অভিসার, *কালো পালকের নিচে*, পৃ. ৬২)

প্রকৃতপক্ষে অসীম সাহা শৈশবের স্মৃতি, উদার প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাংলার সরস মাটি ও মানুষের নিত্য সুখ-দুঃখের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন মসৃণ কাব্যময়তায়। তিনি নিত্য তারুণ্যের হাত ধরে বাংলা কবিতার অঙ্গনে অবিরাম হাঁটছেন। তাঁর কাব্যের অধিকাংশ কবিতা গভীর দেশপ্রেমে জারিত। লোকায়ত বাংলার জীবনের সুখ-দুঃখ, আচার-অনাচার, নির্মমতা, ক্লেদ ও গ্লানি জারক রসে জারিত হয়ে তাঁর কবিতায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অসীম সাহার কবিতায় চিত্রিত সমকালীন প্রসঙ্গ কালোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবিদ আনোয়ার

আবিদ আনোয়ার (জ. ১৯৫০)এর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থসমূহ হলো : *প্রতিবিম্বের মমি* (১৯৮৫), *মরা জোছনায় মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯২), *স্বৈরিণীর ঘরসংসার* (১৯৯৭), *খড়বিচালির বৃক্ষজীবন* (২০০১), *আটকে আছি মধ্যনীলিমায়* (২০০৯) প্রভৃতি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের পরিচর্যা-প্রবণ কবিদের অন্যতম তিনি। সাদা চোখে দেখা নিষ্ঠুর পরিপার্শ্বকে তিনি শিল্পিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। পৌরাণিক অনুষঙ্গ, প্রতীক, লোকজ উপকরণের যথোচিত প্রয়োগ লক্ষ্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠে আবিদ আনোয়ারের কবিতায়। গ্রামীণ সমাজজীবনের অনুষঙ্গে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করে তিনি কবিতায় ভিন্ন স্বাদ সরবরাহ করেন। আবিদ আনোয়ারের কবিতাবিষয়ক কৃতিত্বের আলোচনায় কবি-সমালোচক হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য স্মতর্ব্য :

> আবিদ আনোয়ার কবিতার শুদ্ধতায় বিশ্বাসী, যেমন বিশ্বাসী প্রতীকী কবিরা... তাঁর কবিতার দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার জন্যে দরকার অভিনিবেশী পাঠক সম্প্রদায় যারা চিন্তার সূত্র অনুসরণে সক্ষম, চিত্রকল্পের শোভা ও ব্যঞ্জনা অনুধাবনে সমর্থ... ব্যাপক জীবন এসেছে কিছু কবিতার আধেয় হিসেবে; এগুলো যে রচিত হতে পেরেছে লোক-কবিতার বর্তমান কালে সেজন্যই উল্লেখযোগ্য। (উদ্ধৃত : আবিদ আনোয়ার : কাব্যসংসার, ভূমিকাংশ)

সূক্ষ অনুভূতিবোধসম্পন্ন গভীর চিন্তায় মনোনিবেশী হওয়ায় আবিদ আনোয়ারের কবিতায় উঠে এসেছে পরাবাস্তবতার মোহময় ও রূপময় চিত্রকল্প।

আবেগ ও মননের সমন্বিত পরিচর্যায় যিনি কবিতার শরীরকে পরিণত করেন ভাস্কর্যসুলভ নিপুণ তুলির আঁচড়ের শিল্পকর্মে, চিত্রকল্পের সমাহারে কবিতাকে উচ্চমানে সমাসীন করেন, তিনি হলেন কবি আবিদ আনোয়ার। তাঁর সমকালবিষয়ক ভাবনা ও সূক্ষ সচেতনতাবোধ জীবনের গভীর মূলস্পর্শী। আবিদ আনোয়ারের লোকজস্বরজাত কবিতাবিষয়ক আলোচনায় মাহবুব সাদিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> আবিদের কবি-চৈতন্যের শিকড় আবহমান বাঙলা ও বাঙালির কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও নতুন, নিজস্ব ও আধুনিক। ঐতিহ্যকে তিনি ব্যবহার করেছেন কেবল শিল্প-উপকরণের ভাণ্ডার হিসেবে...যে প্রক্রিয়ায় তাঁর কবিতাশিল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছেন তা তাঁর নিজস্ব। এই নিজস্বতা এসেছে তাঁর বাক-প্রতিমায় অসাধারণ উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্প নির্মাণের মৌলিকত্বে ও নিপুণতায়।... আমরা সবিস্ময়ে উপস্থিত হই এমন এক রহস্যময় চিত্রবিশ্বে যেখানে ভাস্কর্যের মতো সংহত হয়ে থাকে অপূর্ব সব চিত্রকল্প। (উদ্ধৃত : আবিদ আনোয়ার, *কাব্যসংসার*, ভূমিকাংশ)

আবিদ আনোয়ার ঐতিহ্য-লালিত গ্রামীণ প্রেক্ষাপট খুবই সুকৌশলে রূপকের ছলে কাব্যময় করে তোলেন। স্বপ্নের ভেতর রূপকথা-উপকথার ডাইনি বুড়ি কবির কাছে উপস্থিত হয়েছে খুবই ব্যঞ্জনাধর্মী রূপকাশ্রয়ে :

সন্ধ্যাদীপের ভৌতিক শিখা/অথবা রাতের নিরিবিলি মোম
তোমাকে যখন দেয়ালে গেঁথেছে/তুমিই তখন ভয়াল ডাইনী বুড়ি!
আমারও ভেতরে ডায়নোসোরাস/না হয় আমিও ছিটকে যেতাম
ভীষণ বিকট বুনো-চিৎকারে/''ছোঁবে না ছোঁবে না'' ব'লে।

(মরা জোছনায় স্বপ্নপুরাণ, *মরা জোছনায় মধুচন্দ্রিমা*, কাব্যসংসার, পৃ. ৫২)

রূপকাশ্রয়ে কবি যে ডাইনি বুড়ির সঙ্গে ডায়নোসোরাসের অদম্য শক্তির মুখোমুখি করেছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত বাঙালির জীবনসংগ্রামের অন্তর্গূঢ় ইতিহাসের চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ বাঙালির জীবনে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এর কারণে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। আবার সামরিকতন্ত্রের যাতাকলে পড়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন স্বৈরশাসনের শোষণে পিষ্ট হয়ে পিছিয়ে পড়ে। তা কবির দৃষ্টিতে ডাইনি-বুড়ির ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। শোষণের রূপ বদলায় নি, কেবল হাত বদল হয়েছে। শোষণের অভিন্ন রূপ প্রকাশে তিনি ডাইনি-বুড়ির চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহ্যপ্রীতি আবিদ আনোয়ারের কবিতায় প্রাণদায়িনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনধারার পরম্পরাগত ঐতিহ্য প্রাচীন। বাঙালির দেশজ ঐতিহ্যের নানাবিধ রূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি সারা পৃথিবী বিচরণ করে কবিতায় মুক্তা কুড়িয়ে এনে কবিতার শিল্পসৌধ গড়ে তুলেছেন। লোকসংস্কৃতির বিচিত্র বিভা ফুটিয়ে তুলে বাংলাদেশের কবিতার ভুবনকে নতুন মাত্রিকতায় দাঁড় করে দিয়েছেন। অজন্তা-ইলোরা থেকে যেমন ভাবনার শব্দপুঞ্জ সংগ্রহ করেছেন, তেমনি আবহমান প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরাকীর্তিও তাঁর কবিতায় জায়গা করে নেয় :

তোমাকে দেখেনি মধ্যযুগের নিপুণ পটুয়া,/অজন্তা কিবা ইলোরার ভাস্কর–
তাহলে দেখতে শত ক্যানভাসে,/ব্রোঞ্জে-পিতলে কষ্টিপাথরে,
টেরাকোটা-কাঠ-সোনার পুতুলে/তুমি সাজিয়েছো পুরাকীর্তির সবগুলো যাদুঘর।

(প্রত্নরমণী, *স্বৈরিণীর ঘরসংসার*, কাব্যসংসার, পৃ, ৭৯-৮০)

উপর্যুক্ত কবিতায় প্রিয়ার আসনে এই শ্বাশত বাংলাকে কবি আসন করে দেন। অজন্তা ইলোরার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি স্বদেশেরই মহিমময় কীর্তনে মুখর হয়েছেন। অত্যন্ত পরিশীলিত ও নান্দনিক কবি আবিদ আনোয়ার চিত্ররূপময় ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতাকে সাজিয়েছেন প্রত্নরমণীরূপে।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের কালরাতে গণহত্যার নিধন যজ্ঞের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি জল্লাদবাহিনী এদেশে সর্বশ্রেণির মানুষের পাশপাশি হত্যা করে বুদ্ধিজীবীদের। বাঙালির অবিসংবাদী মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে রাখা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর এবং শেষদিকে মিয়াওয়ালি কারাগারে। বাঙালি মা বোন রমণীদের ধরে নিয়ে পাঞ্জাবি বাহিনীর শিবিরে শিবিরে চালায় অকথ্য ও নির্মম নির্যাতন, ধর্ষণ। 'প্রতিরোধ : ১৯৭১' কবিতায় আবিদ আনোয়ার গ্রামবাংলা থেকে ছোট ছোট ছবি সংগ্রহ করে ভাষার দক্ষতা এবং নির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা সঞ্চার করেছেন :

ছায়াপথে দোলে প্রেয়সীর মুখ,
দিগন্তে ওড়ে রঞ্জিত তার শাড়ি,
পিষ্ট কাঁচুলি দানবের করতলে–
শত্রুকে তবু ফিরতে দেয়া কি চলে?
বিলের কিনারে কিরিচের ঢঙে ঠোঁট ঘষে কানিবগা;
গোখরোর মতো ফণা তুলে আসে মনসার মেয়ে
লকলকে লাউডগা! (প্রতিরোধ : ১৯৭১, *স্বৈরিণীর ঘরসংসার*, কাব্যসংসার, পৃ. ৯১)

নগরমনস্কতায় আবিদ আনোয়ার কবিতাকে প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে। উপর্যুক্ত কবিতায় গোখরোর সঙ্গে গ্রামবাংলার চিরচেনা লকলকে লাউয়ের ডগার উপমা সৃষ্টি করে গভীর তাৎপর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবি আবিদ আনোয়ার কবিতায় বাংলার হতদরিদ্র মানুষের কথা ভেবেছেন। জিয়নকাঠির জাদুর ছোঁয়ায় হতদরিদ্র জীবনে নতুন আলোর সঞ্চার ঘটাতে প্রয়াসী হন তিনি। গ্রামীণ ও শহুরে মানুষের জীবনে দুঃখ বিষণ্নতা জীবনবাস্তবতায় ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। আবিদ আনোয়ার রূপকথার জিয়নকাঠি আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে চান :

বিষণ্নতা ছুঁয়ে দিলো হলুদ বাড়িটাকে
ফাটল-ধরা তক্তপোষে ঝিমোয় বসে মালিক
কালের ধুলোবালির সাথে বিষাদ তাকে-তাকে
বাগানে মুখ থুবড়ে-পড়া একটি মরা শালিক (হলুদ বাড়ি, *প্রতিবিম্বের মমি*, কাব্যসংসার, পৃ. ২০)

নব্যশহরবাসীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটে লোকায়ত জীবন সম্পৃক্ততায়। কারণ, গ্রামকেন্দ্রিক আমাদের জীবনবাস্তবতা। শহরের অধিকাংশ মানুষ জীবন-জীবিকার তাড়নায় গ্রামবাংলা থেকে শহরে বসবাস করলেও নগরের মানুষের টান থাকে গ্রামে রেখে আসা প্রাত্যহিকতায়। লোকসংস্কৃতির বলয়েই বাঙালির বসবাস। বন্যায়, খরায়, জলোচ্ছ্বাসের করাল থাবায় বাংলার জনপদ বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে। আবার পরিশ্রমী বাঙালি জেগে উঠেছে। তাদের জীবনছন্দে মুখরিত হয় ব্যস্ত জনপদ :

জলমগ্ন বাঙলাদেশ : নাকি এক ল্যাগব্যাগে তরল ড্রাগন
হিমালয় থেকে নেমে গিলেছে শস্যের মাঠ, বন-উপবন;
নিঝুম দ্বীপের মতো ভাসমান শুধু কিছু ক্লিন্ন লোকালয়
তাকেও জুজুর মতো লেলিহান জিহ্বা নেড়ে সে দেখায় ভয়,
তবুও জীবনছন্দে মুখরিত ব্যস্ত জনপদ
উজিয়ে সকল বাধা, পায়ে-পায়ে সমূহ বিপদ
যে-যার কর্তব্যে যায়; অজানা আতঙ্কে কাঁপে দুরু দুরু জননীর প্রাণ
কোমরে ঘুঙুর বেঁধে ছেড়ে দিয়ে হাঁটি-হাঁটি কোলের সন্তান :

(ডুবে যেতে-যেতে, *স্বৈরিণীর ঘরসংসার*, কাব্যসংসার, পৃ. ৭৭)

উপর্যুক্ত কবিতাংশে সন্তান হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে সোনামনিদের কোমরে ঘুঙুর বেঁধে ছেড়ে দেওয়ার পরও জননীর বুক কাঁপার চমৎকার লোকসঞ্জাত চিত্রকল্পের মধ্যে সমাজসংলগ্নতা জড়িয়ে আছে। আবিদ আনোয়ার দৈশিক সামাজিক কঠিন কঠোর বিষয় সহজ সরল উপমায় উপস্থাপন করেন। গ্রামবাংলার চেনাজানা অনুষঙ্গ কবিত্বময় করে তিনি প্রয়োগ করেন। কবিতায় লোকজস্বর তিনি ফুটিয়ে তোলেন নিজস্ব রঙে ও রেখায় :

ঘুঘু চড়ছে ঘুঘু চড়ছে/রাখাল ছেলের নল-বাঁশিতে,
ভূঁইয়া বাড়ির ধানের গোলায়/ডাকছে ঘুঘু থেকে- থেকে
বাড়ছে শুধু ঘুঘুর লেদা/মূল্যবোধের মরা পাতায়,
খুব গোপনে একটি ঘুঘু/মনের ভেতর উঠছে ডেকে।

(ঘুঘু, *মরা জোছনায় মধুচন্দ্রিমা*, কাব্যসংসার, পৃ. ৫৭-৫৮)

আবিদ আনোয়ার সত্তরের দশকের শক্তিমান ও সাহসী কবি হিসেবে পরিচিতি পান। তিনি কবিতায় ছন্দের সৌকর্য এবং সুর সৃষ্টি করেন। অলংকারের বিভায়, প্রতীকের ঔজ্জ্বল্যে এবং চিত্রকল্পের সমাহার তাঁর কবিতাকে প্রোজ্জ্বল করেছে। অন্ত্যজ গ্রামীণ বাঙালি সমাজে বসবাসরত খেটে খাওয়া মানুষ আবিদ আনোয়ারের লেখার মূল কেন্দ্রবিন্দু। জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হরিপদ রূপালি ইলিশ বিক্রি করে ঘরে তুলবে তার স্বপ্নের মানসসুন্দরীকে। বলেও সে : 'ও জাইল্লার মেয়ে, আর ক'ডা দিন,/আগামী আশ্বিনে তোরে ঘরে তুলি নিমু...' স্নানরতা ধীবরকন্যাকে আর ঘরে তুলে নেওয়া হয় না তার। স্বপ্নফেরা হরিপদ নিয়তির ঘাটে ঘাটে ফুটো নৌকো, ছেঁড়া জাল নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে :

কলসতাড়িত জলে নিত্যদিন কেঁপে ওঠে বিমূর্ত মলিনা,
স্নানার্থিনী ধীবরকন্যার গাঢ় সোমত্ত যৌবনে
আগতর লেপ্টে-থাকা লালপেড়ে শাড়ি
কে যেন হৃদপিণ্ডে তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে
ব্যান্ডেজের মতো করে বেঁধে রেখে যায়...

(হরিপদ'র দিনরাত্রি, *প্রতিবিম্বের মমি*, কাব্যসংসার, পৃ. ১৮)

হরিপদ'র এই কষ্টকল্পনা বিমূর্ত মলিন চিরায়ত বাঙালি জীবনের নিত্য দিনের নিত্য নাটের খেলা। লালপেড়ে শাড়ি পরিহিত চির যৌবনা বাঙালি কন্যার হৃদপিণ্ড ব্যান্ডেজের মতো পেঁচিয়ে রাখতে হয়। সত্তর দশকের কবি আবিদ আনোয়ার তাঁর দেখা সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং সমাজে ঘটে যাওয়া অনাচার সূক্ষ অনুভূতি দিয়ে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। ময়াজ ফকিরের দরগায় শিন্নি বিতরণ, পুত্রের হাতে পিতার হুঁকো অর্পণ, জমিরের চোখে ইদের সময় বছরে দু'বার সুরমা ব্যবহার এবং জীবনের কাছে হেরে যাওয়া উদ্বাস্তু উন্মুল ফেলু মিয়ার জীবনচরিত অঙ্কনের মধ্য দিয়ে আবিদ আনোয়ার মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অব্যক্ত ভাষা তাঁর কাব্যসংসারে ছেঁকে শব্দপ্রতিমায় তুলে এনেছেন। মধ্যবিত্ত শুকুরালীর জীবন বর্ণনে ধরা পড়ে :

মধ্যবিত্ত শুকুরালী জননী পাখির মতো
কেমন আগলে রাখে প্রাণপ্রিয় ধানের জাবার,
খণ্ডিত দলিল-পরচা, অগ্রজের উত্তরাধিকার।
মলিন মাদুরে শুয়ে মাঝেমাঝে দেখে
মাচানে সাজিয়ে-রাখা বিবর্ণ তামাক পাতা,
যা থেকে বিম্বিত হয় তারই জীর্ণ জীবনের রঙ।

(ব্যক্তিমালিকানা ও সমাজতন্ত্র, *স্বৈরিণীর ঘরসংসার*, কাব্যসংসার, পৃ. ৯৭)

বাঙালির ভূমির প্রতি টান অনবদ্ধ। বাপ-দাদার ভিটে-মাটি টিকিয়ে রাখার প্রধান শক্তি হলো জমির দলিল-পরচা, যা দিয়ে উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়ে থাকে। সেই উত্তরাধিকারের দলিল বিবর্ণ তামাক পাতার মতো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গৃহের মাচানে তোলা থাকে। কবির দৃষ্টিতে তামাটে রংয়ের মতোই লোকসমাজে কাটিয়ে দেওয়া প্রান্তিক মানুষের জীর্ণ জীবন। সমকালীন ও শাশ্বত জীবন-বাস্তবতা তাঁর কবিতায় উজ্জ্বল রূপ পায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবিদ আজাদ

আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫) সত্তরের দশকের অসামান্য প্রতিভাবান কবি ছিলেন। সত্তরের কবি হিসেবে চিহ্নিত হলেও আবিদ আজাদ আবহমান বাংলা কবিতার ধারায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-বিষাদ– এসবের সমন্বয়ে তিনি সৃজন করেছেন কবিতার ঘর-সংসার। সমকালের সমাজ-রাজনীতি এবং প্রতিবেশ পৃথিবীর উত্তাল হাওয়া– আবিদ আজাদের মতো প্রতিভাবান সামাজিক সচেতন কবিদের দিয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে। তিনি ১৯৭০-এ লেখালেখি শুরু করলেও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ '*ঘাসের ঘটনা*' ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে : *ঘাসের ঘটনা* (১৯৭৬), *আমার মন কেমন করে* (১৯৮০), *বনতরুদের মর্ম* (১৯৮২), *শীতের রচনাবলী* (১৯৮৩), *আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি* (১৯৮৭), *ছন্দের বাড়ি ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৭), *তোমাদের উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?* (১৯৮৮), *আমার কবিতা* (১৯৮৯), *খুচরো কবিতা* (১৯৯০), *আরো বেশি গভীর কুয়াশার দিকে* (১৯৯৩), *কবিতার স্বপ্ন* (১৯৯৩), *কাটপ্রোজ বা চিলতে গদ্য সিরিজের কবিতা* (১৯৯৫), *আমার অক্ষমতার গল্প* (১৯৯৮), *খেলনা যুগ ও অন্য একুশটি কবিতা* (২০০০), *উসুমকুসুম ও বাড়ির নাম নিঃসঙ্গ* (২০০৩), *কে যেন ধানের কথা বলে* (২০০৪), *আমেরিকা আমি তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না* (২০০৫) প্রভৃতি। আবিদ আজাদের কবিতার জগৎ বিষয়ে সমালোচকের বক্তব্য :

> আবহমান বাংলা কবিতার ধারাকে আবিদ আজাদ পর্যায়ক্রমে সময়ের পরিবর্তন ও দেশকালের যে উত্থান-পতন, অবিশ্বাস শেকড়হীন রাজনৈতিক চিন্তন, প্রেম, শুশ্রূষা ও আধুনিক ব্যক্তিসত্তার অমুক্ত স্বাধীনতা, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে জটিল সূত্রের অর্থোদ্ধার এ সব কিছু তাঁর নিজের কবিতার ভেতরেও পরিলক্ষিত হয়। কাব্যভুবনে আবিদ আজাদ একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। তাঁর সময়ে অন্যান্য কবিদের চেয়ে তাঁর কাব্যভাবনা বর্ণিল ও চিত্রল এবং বহুবিচিত্র। (সুহিতা সুলতানা, প্রসঙ্গ : আবিদ আজাদের কবিতা, *কবি আবিদ আজাদ স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৩৪৩)

আবিদ আজাদ ছিলেন নির্জনতাপ্রিয় নিমগ্ন কবি। কবিতা নির্মিতির ক্ষেত্রে বিষয় নির্ধারণ, গভীর বিশ্বাস ও অন্তরাবেগ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। স্বপ্ন ও সত্যের সংমিশ্রণে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে বক্তব্য প্রধান। কবিখ্যাতির দিক থেকে আবিদ আজাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> আবিদ আজাদ মূলত–সর্বত কবি। রক্তে-রন্ধ্রে কবি। কবি হিসেবে এখন আর তাঁকে সত্তরের দশকের মধ্যে বন্দি করে রাখা যাবে না। দশক অতিক্রম করে গেছেন আবিদ আজাদ। বিস্ময় মেনেছি আবিদ আজাদের কবিতায়, তাঁর কল্পনার কুশলতায়, তাঁর বয়সের তুলনায় পরিণত মানসের পরিচয়ে, তাঁর দায়িত্বচিত্ততায়–

তাঁর স্মৃতিকাজের ভিতর দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এসেছি বাল্যে-কৈশোরে। খুশির উচ্চারণে বলব, ঝিঁঝির ক্রেংকারে ভরা এই কবিতার দেশে এক প্রকৃত গায়ক পাখির কণ্ঠ বেজে উঠেছে। (আবিদ আজাদ : *প্রেমের কবিতাসমগ্র*, ফ্ল্যাপ)

প্রায় চার দশক ধরে আবিদ আজাদ কাব্যসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সত্তরের দশকের কাব্যধারার অন্তরের ও বাইরের আত্মগত আন্দোলনের সূত্রপাত তিনি করেছিলেন। প্রকৃতার্থেই কবি আবিদ আজাদ সত্তরের দশকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আবিদ আজাদের অধিকাংশ কবিতার উৎসস্থল ফেলে আসা গ্রামীণ কৈশোরিক স্মৃতিময়তা। আটপৌরে ভাষায় নস্টালজিক প্রবাহে তাঁর কবিতা শহর ও গ্রামকে বৃত্তাবদ্ধ করেছে। স্মৃতিশক্তিকে অভিজ্ঞতায় রূপান্তরের দক্ষতা তাঁর ছিল। সত্তর দশকের অসামান্য প্রতিভাবান কবি স্বল্প সময়ের মধ্যেই অসম্ভব দ্রুততায় বাংলা কবিতার উর্বর ভূমিতে বুনে দিয়ে গেলেন তাঁর চর্চিত কবিতার বীজ।

দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ সমাজের কঠোর বাস্তবতা আবিদ আজাদের কবিতায় স্থান পায়। দারিদ্র্যের নির্মমতায় একজন অসহায় রমণীর চরম সংকট ফুটে ওঠে কেবল ধানের উপমায়। আগামী দিনের উত্তরসূরির মধ্যেও সে ধানের স্বপ্ন বোনে। কারণ, এক মুঠো ভাতের জন্যই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় গ্রামীণ নারীর চেতনামিশ্রিত স্বপ্ন। আবিদ আজাদ গ্রামবাংলার কষ্টে আক্ষেপে নিমজ্জিত এক ধানকন্যার জীবনসংলগ্নতার চিত্রপট পরম যত্নে চিত্রিত করেন :

১. ছফিনার মতো জ্বরে ভেসে যায় ধানের জমিন;
মরা গাছে গলায় রক্ত তুলে ডাকে পাখি, বউ কথা কও–

২. বাঁশের চাটিতে শুয়ে শুয়ে গোঙায় ছফিনা– কান পেতে শোনে–
পোয়াতি পেটের মধ্যে তার মাথা তুলছে রক্তভেজা বাংলার ধানের উপাখ্যান :
'মাজন কেডা যে খালি মাটি খামচায়– পেটে-ফাটাক্ষেতে
আল্লাগো, আমার পেডে জানি ধান হয়, ধান, খালি ধান, বেশুমার ধান।'

(এক ধানকন্যার উপাখ্যান, *আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি*, পৃ. ১৬৬)

ইতিবাচক জীবনের অন্বেষায় আবিদ আজাদ সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নিরলস সচেষ্ট ছিলেন। তিনি জীবনকে দেখেছেন সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর কবিতায় জীবনের মায়াময় রূপ প্রতিফলিত হয় অবলীলায়। আবিদ আজাদ ব্যক্তিগত জীবনে একজন সংসারমুখি কবি ছিলেন। তাঁর সৃজন প্রতিভায় কবিতার বুনুনিতে ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গও পেয়েছে বিশিষ্টতা। চেতন-অচেতন-অবচেতনের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি নিজের অস্তিত্ব ও ঠিকানা খুঁজে পান। আবিদ আজাদ নিজেই বলেন :

বাইরে যা কিছু দেখি, অবলোকন করি– ভেতরে বসে রঙবেরঙের টুকরো রঙিন নিজের কাঁচে ফেলে ছকে-ছকে মিলাই; মজে যাই ব্যবচ্ছেদে। স্মৃতি হয়ে ওঠে আমার প্রধান আহার্য। কবিতা তার মুঠোর অদৃশ্য গোল আয়না মেরে আমাকে পাগল করে ফেলতে থাকে। (আবিদ আজাদ, *আবিদ আজাদের কবিতা*, ভূমিকাংশ)

আবিদ আজাদ কবিজীবনের শুরুতেই মননঋদ্ধ স্বভাব নিয়ে যাত্রা করেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই *ঘাসের ঘটনা* (১৯৭৬) থেকেই লোকজীবনাশ্রিত অনুষঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। আবিদ আজাদ যখন নির্মিত কুহারে দেখেন যে তাঁর চারপাশে ছিলো কুঁড়েঘরগুলি, তখন বোঝা যায় তিনি মুক্তিযুদ্ধকালের অত্যাচারিত শোষিত বঞ্চিত মানুষের কথাই বলেছেন। কুঁড়েঘরগুলো তখন রূপকায়িত হয়ে বঞ্চিত মানুষের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় যে তিক্ত-স্বাদ অনুভূত হয়, তার পেছনে ক্রিয়াশীল সত্তরের দশকের অনিকেত জীবন প্রতিবেশ :

এই শাদা ফুলের ছায়ায় ফুটে আছে আমাদের কুঁড়েঘর
যে কুঁড়ে ঘরের চালগুলি বহুদিন শুনেছে যুদ্ধবিমানের গর্জন
যে কুঁড়েঘরগুলি বর্ষারাতে কান পেতে শুনেছে মর্টারের শব্দ
যে কুঁড়েঘরগুলি উঠোনে দাঁড়িয়ে খড়ের গাদার পাশে শুনেছে লাজুক কিষাণির আর্তনাদ।

(নির্মিত কুহারে যেন পাই আবক্ষ বাংলাদেশ, *কবিতাসমগ্র*, *পৃ.* ১০৮)

উপর্যুক্ত কবিতাংশে গ্রামীণ কুঁড়েঘর থেকে 'যুদ্ধবিমানের গর্জন', 'মর্টারের শব্দ' ব্যবহার করে আবিদ আজাদ মূলত তৎকালীন বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানিদের অন্যায় অত্যাচারে গ্রাম, নগর, বন্দর পুড়ে ছাই। গ্রামের কুঁড়েঘরগুলো সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুঁড়েঘরগুলো উঠোনে দাঁড়িয়ে শুনছে খড়ের গম্বুজের পাশে লাজুক কিষাণির করুণ আর্তনাদ। আবার গ্রামীণ চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে কবি যখন তাঁর জন্ম-সময়ের ইতিবৃত্ত কাব্যভাষায় রচনা করেন, তখন আমরা দেখতে পাই তাঁর দেখা গ্রামীণ পরিবেশের জিগা-গাছ, কচুপাতা, ঘাসের চাকচিক্য, শুকনো খড়, পিচ্ছিল আলজিভ প্রভৃতি লোকজাত উপকরণগুলো শিল্পভাষ্যে প্রতিভাত হয়েছে। জিগা-গাছের ডাল কবির চেতনার, বোধের, মননের অংশ হয়ে ওঠে। আর ঘাসের পিচ্ছিল আলজিভ, কচুপাতার কোষের রূপালি রং কবির জন্মকালের সংবাদ গ্রামীণ পটভূমিতে জেগে ওঠে :

স্বপ্নের ভিতর আমার জন্ম হয়েছিল
সেই প্রথম আমি যখন হাসি
পথের পাশে জিগা-গাছের ডালে তখন চড়চড় করে রোদ উঠছিল
কচুর পাতার কোষের মধ্যে খণ্ড খণ্ড রূপালি আগুন (জন্মস্বর, *ঘাসের ঘটনা*, পৃ. ১৩)

তৎকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, মধ্যবিত্তের চিন্তন ক্রিয়া, শ্রেণিহীন মানুষের ছবি, নিরন্ন-নিপীড়িত মানুষ, রাজপথ, স্বাধীনতা– বিশেষত অভ্যস্ত কাব্যপ্রকরণের আমেজে যখন নগরের ক্লেদ, নৈরাশ্য,

নৈঃসঙ্গ্যকে কবি প্রকরণবন্দী করেন, তখনো আবিদ আজাদের লেখনিতে গ্রামবাংলার লোকায়ত উপকরণ কবিতায় ঠাঁই করে নেয় :

আজ মনে পড়ছে হারিকেনের চিমনিতে চোখ রাখা নওল কিশোরী
গরুগাড়ি উঠানে নামিয়ে দিচ্ছে হলুদ খড়ের বোঝা আর সন্ধ্যাবেলার নীলিমা
তারার লটবহর ছড়ানো আকাশ। (*ঘাসের ঘটনা*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৯)

গ্রামীণ বালকের মতো আবিদ আজাদ কান পেতে শুনেছেন ফেলে আসা জীবনের গান। একাকিত্ব জীবনে নগর-ক্লেদের মধ্যে বসে নয়ানজুলি গ্রামের ছেলে আবিদ আজাদ অন্তর-চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন লোকজীবনের মেঠোপথ। রাজহাঁসের ডানা ঝাঁপটানোর উপমা ব্যবহার করে লোকজ-অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় শিল্পিত হয়েছে :

আষ্টেপৃষ্ঠে হাওয়া ছোটে। রোদের তক্তি ঝরে থাকা
নয়ানজুলির ছেলে সাঁকোর মতন নতমুখ
তারে আর ফেরাবে না? চাঁদের পিছন থেকে? রেললাইন থেকে?
তোমার অদৃশ্য ডানা ধরে আছি, ফেরাও অথবা ভেঙে ফেলো।

(ফেরাও অথবা ভেঙে ফেলো, *প্রেমের কবিতাসমগ্র*, পৃ. ১৫)

আবিদ আজাদের কৈশোরিক ভরপুর বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রমূর্ত হয় তাঁর কবিতায়। গ্রামীণ লোকজ উৎসব বা গ্রামীণমেলার নানাবিধ উপাদান কবির হারিয়ে যাওয়া বৈশাখের রংয়ে রঙিন হয়। ছেলেবেলার বৈশাখী লোকমেলায় আড়বাঁশির শব্দ, মাটির তৈরি পুতুল, সাদা দাড়ির থুত্থুরে বুড়ো প্রভৃতি লোকজ উপকরণ তাঁকে স্মৃতিগন্ধী ও উন্মনা করে তোলে এবং তাঁর লোকজীবনচেতনাকে সরস করেছে :

বৈশাখের কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে যায়
মেলাভর্তি আড়বাঁশি শব্দ, মাটির ষাঁড়ের আর সাদা দাড়ির এক
থুত্থুরে বুড়োর কথা (বৈশাখের স্মৃতি, *আরো বেশি গভীর কুয়াশার দিকে*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৩৩৫)

আবিদ আজাদের কবিতায় শিল্পসচেতনতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিকাসংলগ্ন কবি হিসেবে তিনি শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নবোনা ফসল আহরণ করেছেন :

> আবিদ আজাদের শিল্পচেতনার অন্তর্গত তাগিদে কবিতা-চারিত্র্যের নিমগ্ন নিভৃতিতে আবিষ্কার করেন গ্রামীণ বৈভবের বিচিত্রমাত্রিক অবয়ব। লোকায়ত উপাচারের নানা বর্ণে ও চারিত্র্যে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। তাঁর স্বপ্নাক্রান্ত কাব্যবোধের হৃদয়-সংবেদী উচ্চারণে তাই লোকায়ত বৈভবের চিত্ররূপময় উপস্থিতি লক্ষযোগ্য অভিনিবেশ দাবি করে। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩২৮)

শিল্পবোধে জাগ্রত জীবন ও যৌবনের কবি আবিদ আজাদ গ্রামীণ জীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতির সৌরভ তাঁর লেখনিতে অতুজ্জ্বল করে তোলেন। আবিদ আজাদের কবিতায় নিসর্গ ও প্রকৃতি একে অপরের

পরিপূরক। গ্রামীণ জীবনের ছোটোখাটো ফোক-মোটিফ তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। বলা যায়, তিনি কবিতায় প্রত্যক্ষ লোকাচার এবং লোকজীবনের স্মৃতি উপকরণ-উপাদান হিসেবে কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

মননশীল কবি আবিদ আজাদের তুলিতে উঠে আসে চিরায়ত বাংলার লোকায়ত জীবনের আলেখ্য। গ্রামীণ পটভূমি ও লোকজ উপকরণের ব্যবহার তাঁর কবিতায় যথেচ্ছ পরিমাণে পাওয়া যায়। আবহমান বাংলা কবিতার ধারাকে নান্দনিক সুষমায় পুনঃনির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন আবিদ আজাদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-'৯১) সত্তরের দশকের মননশীল কবিদের মধ্যে অন্যতম। একাত্তর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কবিতায় উল্লেখযোগ্য প্রতিভাবান কবি হলেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। দ্রোহ ও প্রেমের কাব্যভাষা নির্মাণে শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিদের পঙক্তিভুক্ত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। তাঁর সম্পর্কে একজন কবি-সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম-নেয়া এই অকালপ্রয়াত শিল্পস্রষ্টা দেশ ও জাতি, মাটি ও মানুষ, মানবিকতা ও নান্দনিকতার কালকুশলী সংশ্লেষে তার সৃষ্টিজীবনকে তাৎপর্যময় করেছে যুগসত্যের সংগ্রামমুখর দ্বন্দ্বাবর্তে। শিল্পসম্মত জীবনায়নের সমান্তরালে রুদ্র আমৃত্যু এক সুষম সমাজবিন্যাসেরও স্বপ্নদ্রষ্টা। নিরীক্ষাপ্রিয়, সেই সঙ্গে স্বঘোষিত এই 'শব্দ-শ্রমিক' নটরাজের অনুগ্রহপুষ্ট হয়েও সরস্বতীর বরপুত্র। জাতির শেকড়সন্ধানী এই কবি নিজেকে শনাক্ত করেছে অনার্যপুত্ররূপেও। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চারণ এই আপসহীন শিল্পযোদ্ধা। মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতির বিপক্ষশক্তি তার চোখে চিরঘৃণ্য 'পুরোনো শকুন। (মুহম্মদ নূরুল হুদা, *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী*, ভূমিকাংশ)

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের উত্তাল কালপর্বে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর আত্মপ্রকাশ। তারুণ্যশাসিত এই কবি একাধারে দ্রোহ ও প্রেম, স্বপ্ন ও সংগ্রামের নিবিষ্ট সাধক। মাটি, মানুষ ও ঐতিহ্যের প্রতি আমৃত্যু দায়বোধ তাঁর কাব্যকে দিয়েছে মৃত্তিকাসংলগ্ন ও শিকড়স্পর্শী চারিত্র্য। নিজেকে 'শব্দ-শ্রমিক' উল্লেখ করে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন সাম্যবাদী সমাজ-নির্মাণের নিষ্ঠা। তাই তাঁর কবিতায় অসাম্য, শোষণ, নিপীড়ন, স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও নব্য-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বারবার ঝলসে উঠেছে অগ্নিক্ষরা প্রতিবাদ। পাশাপাশি, প্রেমের কবিতায় আর্দ্রস্বরে তিনি মেলে ধরেছেন মগ্ন চৈতন্যের বর্ণিল ভুবন। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ নিজেকে কখনোই নিছক কবি বা শিল্পী মনে করতেন না। বরং শ্রমিকের সারিতে নিজেকে শামিল করেই অধিক তৃপ্তিবোধ করতেন :

> আমি কবি নই– শব্দ-শ্রমিক।
> শব্দের লাল হাতুড়ি পেটাই ভুল বোধে ভুল চেতনায়,
> হৃদয়ের কালো বেদনায়। (শব্দ-শ্রমিক, *উপদ্রুত উপকূল*, *কবিতাসমগ্র*, পৃ. ২৮)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র কাব্যগ্রন্থসমূহ : *উপদ্রুত উপকূল* (১৯৭৯), *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম* (১৯৮১), *মানুষের মানচিত্র* (১৯৮৪), *ছোবল* (১৯৮৬), *গল্প* (১৯৮৭), *দিয়েছিলে সকল আকাশ* (১৯৮৮), *মৌলিক মুখোশ* (১৯৯০), *এক গ্লাস অন্ধকার* (১৯৯২)। ঈর্ষণীয় সংখ্যক কবিতা ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য গান, গল্প এবং গদ্য। *বিষ বিরিক্ষির বীজ* (১৯৯২) নামক একটি কাব্যনাট্যও রচনা করেন তিনি। উদ্দীপনায় উন্মুখ হয়েও তাঁর কবিতা শৈল্পিক অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়নি। জীবন ও

শিল্পের অঙ্গীকার ধারণ করেই রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় প্রতিবাদীচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। 'তারুণ্যের দীপ্র প্রতীক' রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের তুলনায় তাঁর সৃষ্টিশীলতা পরিমাণে সুপ্রচুর।

'তারুণ্যের দীপ্র প্রতীক' রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ছিলেন সমাজমনস্ক কবি। সমাজ-আন্দোলনের সংগ্রামে তাঁর শরীরী উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। আত্মরতির স্বার্থপর বৃত্তাবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিমানস সঙ্ঘজীবনমুখী। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে তিনি সমষ্টির কাছে আশ্রয়প্রার্থী। প্রতিবাদী শব্দ, বাক্য, গান বা কবিতা তাঁর মননের গভীর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিসত্তাকে আন্দোলিত করেছে তাঁর পারিপার্শ্বিক বিশ্ব। মুক্তিযুদ্ধ, প্রেম, অধিকার ও প্রকৃতি তাঁর কবিতাকে উজ্জ্বল করেছে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। আবার দ্রোহ ও সংগ্রামের পাশাপাশি গ্রামীণ লোকজ বিষয় তাঁর কবিতায় এসেছে সমানভাবে। আধুনিক আঙ্গিকে লোকজাত বিষয় তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয়ে শিল্পিত প্রতিভাস সৃষ্টি করেছে। ফলে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বাংলাদেশের কবিতায় নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছেন। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় দু'টি প্রবহমান ধারা বহমান। একটি রাজনৈতিক চেতনা, অপরটি লোকজপ্রীতি ও মননশীলতা। লোকসঞ্জাত স্মৃতি তাঁর কবিতায় উজ্জ্বল, প্রভাস্বর। প্রখর বুদ্ধিশাসিত চেতনায় তিনি বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য-ইতিহাস-গ্রামীণ জনপদের ঠিকানা তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। ঐতিহ্যপ্রীতির কারণেই তিনি মূলত তাঁর শিল্পবোধকে লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির প্রবাহে অবগাহন করাতে পেরেছেন :

> মানুষের প্রেরণাদায়ক ঐতিহ্যের সন্ধানে তিনি আদিম কৃষিজীবী সমাজের সাম্যগীতির শিল্পরূপ সৃষ্টি করে শস্যমুখী জীবনের বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠেন। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩২৯)

বাঙালি জাতি আর্য নয়, ফিরিঙ্গি নয়, মোঘল-পাঠানও নয়; বাঙালির রক্তে অনার্য রক্তের ধারা প্রবহমান। এর সাক্ষ্য দেবে বাংলার জমিন, জল, নদী, সমতল ও জেগে ওঠা চরের ভূমির ফসল। কৃষি সভ্যতার আদি পতাকা উড়িয়ে বাঙালিই বাজিয়েছে স্নিগ্ধ জীবনের বাঁশি। সভ্যতার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এ জাতি আজ বিজয়ী। পাললিক মাটির গভীরে বাঙালির শেকড় প্রোথিত :

> পাললিক মাটি, জল, অরণ্য ও শস্যের সন্তান,/তাকাও সূর্যের দিকে, শিখে নাও বিপুল দহন।
> আত্মার ভিতরে ফিরে জ্ব'লে ওঠো রক্তের ভাষায়–/ভাসায় কে, মাটিতে শিকড় যার রয়েছে প্রোথিত!!
>
> (আমরা অনার্য, *এক গ্লাস অন্ধকার*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২৭১)

ঐতিহ্য-অনুসন্ধানী রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তাঁর জন্মসময়কে 'পোড়া তুষের গন্ধে'র সঙ্গে তুলনা করে লোকায়ত ভাবনায় দীক্ষা নেন। পৃথিবীর আলো জল ধুলোবালি কাদা রক্তেমাখা ধাত্রির শুভ্র বসন তাঁর জন্মের প্রথম চিৎকার বড়ই করুণ :

জন্মের গন্ধের কথা মনে হলে শরীরে তাকাই,
আজো এক ঘ্রান আছে– আজো এক অক্ষম বিক্ষোভ
শোনিতের অভ্যন্তরে, জন্মের প্রথম চিৎকারের মতো
অক্ষম হাত-পা ছুঁড়ে আজো সে তছনছ করে শুধু নিজের বাসনাগুলো,
ডেটলের শিশি– শাদাতুলো– পৃথিবীর রক্তমাখা করুন কাপড় ॥

(আজীবন জন্মের ঘ্রানে, *উপদ্রুত উপকূল*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২২)

জীবনবাদী কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ গ্রামবাংলার মাঠের পরিশ্রমী কৃষক-কৃষাণীর সারা বছরের খোরাকির ধান যে ঋণে তামাদি হয়ে যায়, তা অনুভব করেন। লোকায়ত জীবনে দরিদ্র্য জনপদ নিঃস্ব, দিশেহারা দেনার ভারে। জমিদারের ভাগ, মহাজনের ভাগ, দেনার অংশ সব পরিশোধ করে চাষিদের বিলাপ কবির মর্মমূলে অনুরণন সৃষ্টি করে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে জীবনের হাহাকারকে কাব্যময় করে রূপায়ণ করেন তাঁর কবিতায় :

এ-কথা বিশ্বাস কোরে এতোকাল বেঁচে আছে মাঠের চাষারা,
তামাদি হয়েছে সুখ, নোনা ধ'রে গেছে সারা জীবনের গায়,
মজ্জায় জমেছে শীত, আন্ধার বেঁধেছে জট বুকের খাঁচায়
ভাঙতে ভাঙতে কূল ঠেকে গেছে ভিতে, শুধু বাঁচার আশারা।

(৫ সংখ্যক কবিতা, *মানুষের মানচিত্র*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১১০)

মানুষের মানচিত্র কাব্যের ভূমিকায় গ্রামীণ জনপদে কৃষিজীবী লাবণ্যহীন দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ লেখেন :

> আমাদের কৃষকেরা শূন্য পাকস্থলি আর বুকে ক্ষয়কাশ নিয়ে মাঠে যায়। আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত। হাড্ডিসার। লাবন্যহীন। আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন। আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস-করুন। আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকালমৃত্যু আর দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে। পৃথিবীর যুদ্ধবাজ লোকদের জটিল পরিচালনায়, ষড়যন্ত্রে আর নির্মমতায় আমরা এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা আর চরম অসহায়ত্বের আবর্তে আটকা পড়েছি। কী বেদনাময় এই অনিশ্চয়তা! কী বীভৎস এই ভালোবাসাহীনতা!! কী নির্মম এই স্বপ্নহীনতা!!!
>
> (হিমেল বরকত সম্পাদিত, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ *রচনাবলী* ১, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বিশ্বাস করতেন শস্যমুখী লোকায়ত জীবনের নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্য। তাই দারিদ্র্য-প্রপীড়িত জীবন-যন্ত্রণার গান গেয়েছেন তিনি। তিনি সোনার বাংলায় শস্যভরা স্বর্ণগ্রাম ফিরে পেতে

চেয়েছেন। আগামী দিনের সন্তানের জন্য নিখিলের অনন্ত অঙ্গণে বাংলার 'মাটির কাগজে' দরদ দিয়ে গান রচনা করতে চেয়েছেন :

আমার সন্তান এসে যেই গান শোনাবে তোমায়
আমার রক্ত ঘাম বেদনা দিয়ে
আমি আজ সেই গান লিখে যাবো মাটির কাগজে।

(নিখিলের অনন্ত অঙ্গন, *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৮৬)

ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম কাব্যের ভূমিকায় আত্মানুসন্ধানী, জাতিসত্তার স্বরূপ অন্বেষণকারী রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ লেখেন :

স্বর্নগ্রাম কোনো গ্রাম নয়। স্বর্নগ্রাম হচ্ছে আমাদের ইতিহাস, জাতিসত্তা আর প্রেরনাময় ঐতিহ্যের প্রতীক। স্বর্নগ্রাম বাঙালির আত্মার নাম, রক্তের নাম। বৃক্ষের বিকাশের জন্যে যেমন মাটিতে শিকড় বিস্তার করা প্রয়োজন, একটি জাতির বিকাশের জন্যেও তেমনি প্রয়োজন তার-মাটিতে তার-ইতিহাসে সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, তার প্রেরনাময় ঐতিহ্যে শিকড় বিস্তার করা। আর সে কারনেই এই আত্মানুসন্ধান, এই স্বরূপ অন্বেষন। (হিমেল বরকত সম্পাদিত, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ *রচনাবলী* ১, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৮৬)

শস্য ও বৃক্ষের ঐশ্বর্য গ্রামীণ জনজীবনের বন্দনাগীত। গ্রামীণ নিসর্গের রূপচিত্র অংকন তাঁর মজ্জায় গেঁথে আছে। নিসর্গের প্রশান্তিময় ঐতিহ্যনির্ভর কবি রোমান্টিক আবেগ আবেশে উপমায় গ্রামীণ কন্যা, জায়া জননীর নানা রূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কবিতায় নারী মূর্তমান হয়েছে কিছুটা 'শস্যসুলভ' ও কিছুটা 'বৃক্ষ ছায়াময়' এবং খানিক 'প্রস্ফুটিত'রূপে। তাই নারীর কাছে প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাশা দুটোই তাঁর কাম্য :

প্রত্যাখ্যান দিয়েছো যখন
কিছুটা প্রত্যাশা রেখে যাও,
না হলে তোমার কৃষ্ণচূড়াহীন কেটে যাবে ফলন্ত ফাল্গুন ॥

(স্বাস্থ্যসম্মত প্রত্যাখ্যান, *দিয়েছিলে সকল আকাশ*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২১২)

লোকপুরাণসংশ্লিষ্ট ভাবনা রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর মেধা ও মননে ঋদ্ধ। বেহুলা-লখিন্দর-মনসা-চাঁদ সদাগর আমাদের সমাজভাবনায় জড়িয়ে আছে। লোহার বাসর রাত, কালসাপ, গাঙুরের জলে বেদনার ভেলা, বিষের ছোবল– এসবই কবিভাবনায় নতুনরূপে সমাদৃত হয়েছে। বাংলাকে তিনি দুঃখিতা বালিয়াড়ি নদীর সঙ্গে তুলনা করে কাব্যশ্রীমণ্ডিত করেছেন :

সুচাগ্র সুযোগে সাপ ঢুকে গেছে লোহার বাসরে,
বিষের ছোবলে নীল দেহে নামে শীতল আঁধার,
গাঙুরের জলে ভাসে কালো এক বেদনার ভেলা।
দুঃখিতা আমার, তুমি জেগে আছো বালিয়াড়ি-নদী।

(অনুতপ্ত অন্ধকার ১, *গল্প*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৮০)

কৈশোর থেকে যৌবনে অকাল মৃত্যু পর্যন্ত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কেটেছে নগরে। নগরের হালচাল তাঁর নখদর্পণে। মুক্তিযুদ্ধের করুণ ভয়াল দিনরাত তাঁর চেনাজানা। ঢাকা শহরে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধের সময় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিরীহ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে গিয়ে যে নারকীয় নির্যাতন করা হতো তার যথার্থ রূপ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন কীভাবে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে চোখ বেঁধে রাখা হয়। বুটের আঘাতে রক্তাক্ত করা মুখ, থ্যাতলে দেয়া হয় ঠোঁট জোড়া, ভেঙে দেয়া হয় দাঁত। জ্বলন্ত সিগারেট শরীরে স্পর্শ করা হয় ইত্যাদি আরো বহু প্রকারের নির্যাতন। কবির ভাষায় বলা যায় :

তার দুটো হাত—
মুষ্টিবদ্ধ যে-হাত মিছিলে পতাকার মতো উড়েছে সক্রোধে,
যে হাতে সে পোস্টার সেঁটেছে, বিলিয়েছে লিফলেট,
লোহার হাতুড়ি দিয়ে সেই হাত ভাঙা হলো। সেই জীবন্ত হাত, জীবন্ত মানুষের হাত।

(কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, *ছোবল*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৪৬)

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা আত্মাহুতি দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে চেতনার স্বপ্ন বুনে গেছেন আমাদের জন্যে। ফলে বধ্যভূমির নিসর্গ থেকেও তাদের হাত বাঁধা, চক্ষু বাঁধা, বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন লাশগুলো আমাদের ঘুমন্ত রক্তে জাগ্রত চেতনার ডাক দিয়ে যায়। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন :

মাটি কাঁপে
কবরের মাটি কুঁড়ে অশনাক্ত লাশের কোরাস
সহসা খামচে ধরে চাঁদের চিবুক—
আমাকে সনাক্ত করো হে যৌবন যুদ্ধের সন্তান,
আমাকে শনাক্ত করো স্বদেশের দগ্ধ কৃষ্ণচূড়া।

(লাশগুলো আবার দাঁড়াক, *ছোবল*, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৪৩)

মুক্তিকামী লোকায়ত জীবনের কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রূপকের আড়ালে শহর-যন্ত্রণার কথা এবং গ্রামে বসবাসরত মানুষের অসহায়ত্বের কথা ব্যঞ্জিত করেছেন। নগরে বসবাস করে নাগরিক সংকটের পাশাপাশি কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ আবহমান বাংলার করুণ দশা চিত্রময় ও রূপময় করে জীবনের জয়গান গেয়েছেন আসন্ন ভবিতব্যের কল্যাণ কামনায়।

সত্তরের দশকের কবিতায় লোকজ জীবন ও সংস্কৃতি গ্রামবাংলার জনপদকে ঘিরে রচিত হয়েছে। পাকিস্তানীদের দীর্ঘদিনের শোষণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হলে দ্রুত শহরায়ন গড়ে উঠতে থাকে। তখন গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শহরের পথে পা বাড়ায়। শিক্ষিত সমাজ কর্মের বন্ধনে

নগরে বসবাস করতে শুরু করে। ষাটের দশকের মতোই সত্তরের দশকের প্রায় সব কবিগণ গ্রাম থেকে কৈশোর পেরিয়ে শহরে অবস্থান নেন। ছেলেবেলার ফেলে আসা জীবনাচার, সংস্কৃতি, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সবকিছু খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে তাঁদের। সত্তরের দশকের অধিকাংশ কবি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের লেখায় তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তি, অর্জন ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অভাব, অনাচার, নির্যাতন চোখে পড়ে। চোখে পড়ে সদ্য স্বাধীন দেশে পঁচাত্তরের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড এবং এ দশকের শেষদিকে সামরিকতন্ত্রের অপকৌশল। এই দশকের কবিদের কবিতায় গ্রামবাংলার লোকজজীবন প্রবাহ চিত্রকল্পের চিত্রিত ছায়ায় রূপময় হয়ে প্রতিভাত হয়। সত্তরের দশকের কবিগণ নিজ নিজ সৃষ্টিকর্মের উৎকর্ষে ও নতুনত্বে নতুন পথ নির্মাণে সচেষ্ট হন। বাংলাদেশের সত্তরের দশকের কবিসম্প্রদায় বারবার স্মৃতিরোমন্থন করে ফিরে গেছেন গ্রামবাংলায়। ফেলে আসা গ্রামের লোকজীবন ও সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা। তাই সত্তর দশকের কবিদের কবিতার ভুবনে জীবনের রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থ-সহায়িকা :

১. অসীম সাহা : *নির্বাচিত কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮
: *সেরা কবিতা*, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮
: *উদ্বাস্তু*, সম্প্রীতি, ঢাকা, ১৯৯৪
: *ম-বর্ণের শোভিত মুকুট*, আগন্তুক, ঢাকা, ২০১৫
: *কালো পালকের নিচে*, নব সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭
: *প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা*, চিরদিন, ঢাকা, ২০১৮
: *পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়*, জলতরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *কবি আবিদ আজাদ স্মারকগ্রন্থ*, কবি আবিদ আজাদ স্মৃতি পরিষদ, ঢাকা, ২০০৬

৩. আবিদ আজাদ : *কবিতাসমগ্র*, তৃতীয় সংস্করণ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮
: *আবিদ আজাদের কবিতা*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১
: *প্রেমের কবিতাসমগ্র*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

৪. আবিদ আনোয়ার : *নির্বাচিত কবিতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫
: *চিত্রকল্প ও বিচিত্র গদ্য*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫
: *কাব্যসংসার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫
: *বাঙলা কবিতার আধুনিকায়ন*, তৃতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ২০১৮

৫. আবিদ আনোয়ার, মাহবুব সাদিক-এর কবিতা বিরোধাভাস ও বিপ্রতীপের রসায়ন, *যমুনা*, সবুজ মাহমুদ সম্পাদিত, *চতুর্মাসিক যমুনা* (১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-এপ্রিল), ঢাকা, ২০১৮-১৯

: ষাটের দশকের কবিতার আধার ও আধেয়, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা ৫, ঢাকা, ২০১৩

৬. আবুল হাসনাত [সম্পাদিত], *কালি ও কলম*, (চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা), ঢাকা, ২০০৭

৭. আমিনুর রহমান সুলতান, কবি অসীম সাহার সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, (ক্রোড়পত্র-কবি অসীম সাহা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২), লিটলম্যাগ প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ২০১০

৮. আলী রিয়াজ, ভূমিকা : সত্তর দশকের কবিদের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা ৫, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা ৫, ঢাকা, ২০১৩

৯. আহমদ রফিক, *কবিতা, আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

১০. নাসির আহমেদ, দ্বান্দ্বিক দক্ষতায় উত্তরণের কবি অসীম সাহা, আমিনুর রহমান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, সংখ্যা ১, বর্ষ ৫, ২০০৬

১১. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

: *কবিতার শব্দ-সাঁকো*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮

১২. বেগম আকতার কামাল, *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

১৩. মাসুদুল হক, অসীম সাহার কবিতায় পুরাণ, প্রেম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, সংখ্যা ২, বর্ষ ৯, ২০১০

১৪. মাহবুব সাদিক, *কবিতাসমগ্র*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

১৫. মাহবুব হাসান : এ-জীবন মানুষের সৃষ্টির বেদনায় গাথা, সবুজ মাহমুদ সম্পাদিত, *চতুর্মাসিক যমুনা* (১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-এপ্রিল), ঢাকা, ২০১৮-১৯

১৬. মুনীর সিরাজ, সত্তর দশকের কবিতা, সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পাদিত], *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, ঢাকা, ২০১৩

১৭. মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

১৮. হিমেল বরকত [সম্পাদিত], *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

: রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ *কবিতাসমগ্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

১৯. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২

২০. শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, রোদেলা, ঢাকা, ২০১৩

২১. শফিক ইমতিয়াজ, সাক্ষাৎকার, *যমুনা*, সবুজ মাহমুদ সম্পাদিত, *চতুর্মাসিক যমুনা* (১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-এপ্রিল), ঢাকা, ২০১৮-১৯

২২. সুহিতা সুলতানা, প্রসঙ্গ : আবিদ আজাদের কবিতা, *কবি আবিদ আজাদ স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা, ২০০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

আশির দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ দশ বছর আশির দশক নামে চিহ্নিত। এই সময় পরিধির মধ্যে রচিত কবিতাকে 'আশির দশকের কবিতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সত্তর দশকের সম্প্রসারিত রূপ হলো আশির দশক। সমাজের ইতিহাস বৃত্তাকারে ঘোরে না, সরল রেখাতেও চলে না, আঁকাবাঁকা তার পথ, এগিয়ে চলে। এই দশকের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত বলতে বোঝায়– সামরিক আইনের ঘেরাটোপে জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১) এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অপরাজনীতি। পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিকজান্তাদের শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে একাত্তরের স্বাধীনতা-বিরোধীদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয়া হয়। যার অনিবার্য ফল হিসেবে পরবর্তী এক যুগের অধিক সময়ে ধর্মান্ধ মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের নেতারা পুনর্বাসিত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে উপনীত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের চালচিত্র কবিতার উপকরণ হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেয়। আশির দশকের রাজনীতি ও কবিতা প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামাল 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের কবিতা : পরিপ্রেক্ষিত প্রবণতা ও প্রান্ত' প্রবন্ধে লেখেন :

> বাংলাদেশের প্রতিবেশে '৭১ পরবর্তীকাল বিবিধ কূটত্ব ও বৈপরীত্যের আন্তশ্চাপে বিসম্বাদী, বিশেষত কাব্যময়তার ক্ষেত্রে সবরকম থিসিস ভেঙ্গে একটি সঙ্করধর্মী অ্যান্টিথিসিসের বিনির্মাণে সচেষ্ট। আশির দশকের [দশকভিত্তিক ধারণার সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা স্বীকার করেও] পরিমণ্ডল রাজনৈতিক স্বেচ্ছাতন্ত্রে ও নীতিহীনতায় পঙ্কিল, সংস্কৃতিদ্বন্দ্বে পীড়িত। জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রসত্তার মধ্যে পুনরায় সৃষ্টি করা হয় বিভাজন ও বিতর্ক। একনায়কতন্ত্রের দীর্ঘছায়ায় বসবাসরত কবিরা হতে থাকেন প্রতিচ্ছায়াবৃত, বিরুদ্ধ পরিবেশের দিকে পৃষ্ঠদেশ ফিরিয়ে এঁরা দেখেন বিশৃঙ্খল বাস্তবের অপচ্ছায়া। সত্তরের কাব্যাদর্শে জাতিসত্তার পরম মুখচ্ছবি অঙ্কনের যে রোমান্টিকতা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকবিকে করেছিল উল্লসিত ও বিস্তারপ্রবণ, এ সময়ের কবি সেই অবস্থানে আর নেই। তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তিতার ছকে জাতির স্বরূপ ও জনমানুষের প্রতিচ্ছবি ও আবেগ ধারণে উন্মুখ হতে চাইলেন, ফলত সত্তরের উচ্ছ্বাসপ্রবল কাব্যময়তার প্রতি দেখা দেয় নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও অনীহা। শিল্পসৃজনের ক্ষমতায় দাঁড়ানোর অভীপ্সা ও সে সঙ্গে বাংলা কবিতার মৌলরূপ চর্চার ঘোষিত সংকল্প দ্বারাও আশির কবিতা উচ্চাভিলাষী। (সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, পৃ. ২১)

ষাটের দশকের কবিতায় দেখা গেছে কবিরা ছিলেন অন্তর্বিপ্লবী এবং আত্মপরিসরের বৃত্তে নিমজ্জিত। পাকিস্তান শাসনামলে ষাটের দশকের কবি সম্প্রদায় নিজেদেরকে বন্দিদশা মনে করতেন। সত্তর পেরিয়ে আশির দশকের কবিদের অবস্থাও ষাটের দশকের মতো ছিল। আশির দশকের কবিরাও নিজেদেরকে বন্দিদশা মনে করতেন। তৎকালীন রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার কবিদের আহত ও পীড়িত

করতো। আশির দশকের কবিতার বিচরণ ভূমির একটি প্রান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বুর্জোয়ার অবস্থানের নানামুখি চাপকে বহন করতো। আরেক প্রান্তে কবিতা হয়ে ওঠে শ্রেণিচেতনার সমাজবাদী ধারার প্রতি অমনোযোগী।

বাংলাদেশে আশির দশক জুড়ে ছিল সামরিকতন্ত্র এবং এর ছত্রছায়ায় রাজনীতির নানামাত্রিক মেরুকরণ। এই দশকের প্রথম দিকে রাজনীতির মাঠ ছিল নিস্তব্ধ। সামরিক ফরমানের কাছে সবাই ছিল অসহায়। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলনে নামতে পারেনি। তবে তৎকালীন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের অপকৌশলী রাজনীতির প্রতিবাদ হয়েছে সাহিত্যের প্রায় সব শাখায়। জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার ঘোষণা, সমাজতন্ত্র, মানবতা এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে কবিসম্প্রদায় কলম ধরেন। জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হবার পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে দ্বিতীয় দফায় সামরিক শাসন জারি করা হয়। জেনারেল এরশাদ জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরীরূপে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, আবু বকর সিদ্দিক 'চল্লিশ বছরের কবিতা : বায়ান্নো থেকে বিরানব্বই' প্রবন্ধে লেখেন :

> অনাচার মন্বন্তর ও হতাশার রন্দ্রপথ বেয়ে যে শনি এই দেশের শরীরে প্রবেশ করেছিল, ১৯৭৫-এ কালদংশন বসিয়ে দেয় সে। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিধন শুধু নয়, বাংলাদেশের রক্তার্জিত গণতন্ত্র নিধন বর্ষ হিসেবে কুখ্যাত হয়ে থাকবে এই ১৯৭৫। আমাদের সংবিধানের প্রায় সব ক'টি মূল শর্ত উপড়ে চষে সমভূমি করে ছিলো এক দাঁতাল দানব। এই দানবটির গায়ে জলপাই লেবাস, বসত ক্যান্টেনমেন্টের ব্যারাকে। এর পোশাকী নাম মার্শাল ল তথা সমরতন্ত্র, প্রচ্ছন্ন নাম ফ্যাসীতন্ত্র। সংবিধানের বহু সাধের গণতন্ত্র পরিণত হলো স্বৈরতন্ত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতা পর্যবসিত হলো মৌলবাদে, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গেলো। জেনারেল জিয়া যে কাজটি শুরু করেছিলেন প্রচ্ছন্ন কৌশলে, এরশাদ সেই কাজটি অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিকতার মূল্যবোধগুলিতে নগ্ন ব্যাভিচারের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করার উৎসবে প্রকাশ্যে প্রবৃত্ত হন। '৫৮ থেকে '৯০- এর ৬ ডিসেম্বর তেমনি কৃষ্ণযুগ। (সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত, *কবি ও কবিতার সংগ্রাম*, পৃ. ৫১)

এরশাদের শাসনামলে দেশ ক্রমান্বয়ে এক গভীর ও সর্বগ্রাসী সংকটে নিপতিত হয়। এক শ্রেণির মানুষ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটান। চৌর্যবৃত্তি ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে মূলধন, সম্পদ পুঞ্জিভূত করার পথটি সে সময় স্বীকৃত পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল :

> রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ও মেরুকরণ হয় এরশাদ আমলেই। এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে জিয়া সরকার দ্বারা সৃষ্ট কালাকানুন ও স্বৈরতন্ত্রী শোষণমূলক ব্যবস্থা এবং সম্পর্কসমূহের ধারাবাহিকতা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হয়নি। এগুলোর আরো পুষ্টি সাধন করা হয়েছে। উপরন্তু– দুর্নীতি, লুণ্ঠন, অপশাসন, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার দমনপীড়ন, সকল অপশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দান স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অষ্টম সংশোধনী বিল তার আমলেই পাশ করা হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ব্যাপক প্রসার ঘটান

তিনিই। দ্রুত বিকাশ ঘটে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তিসমূহের। (আমিনুর রহমান সুলতান, *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের কবিতা*, পৃ. ৪৬)

জেনারেল এরশাদ কখনোই বাংলার জনগণের হৃদয়ে ঠাঁই পায়নি। ১৯৮২ সালের এপ্রিল থেকে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্রসংগঠনগুলি এ সময় প্রথম এরশাদবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। রাজনৈতিক দলগুলিও আন্দোলনে নেমে পড়ে। শ্রমিক সংগঠনগুলিও এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অপশক্তি দূর করতে আশির দশকের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মতো ১৯৯০ সালের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে উনসত্তরের মতো নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শোষণের বিরুদ্ধে, সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সচেতনতাকে কাজে লাগান। শুধু সামরিক নয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনও তখন তুঙ্গে। বাংলাদেশের কবিরা জিয়া-এরশাদের সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটকে প্রতিনিয়ত অবলোকন করেছেন শিল্পীর মেজাজে :

> সামরিক শাসকরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। যদিও তারা এর উল্টোটাই দাবি করে। রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা আরো বেশি হতাশাব্যঞ্জক। বেসামরিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রথমে রাজনৈতিক উন্নয়নে সমস্যার সম্মুখীন হন। সবশেষে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে সামরিক বাহিনী দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরাপত্তা রক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়ে। (তালুকদার মনিরুজ্জামান, *সামরিক শাসনের ফলাফল রাজনীতির সামরিকীকরণ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের রাজনীতি [১৯৮২-৯০]*, পৃ. ১১)

ফলে এই অক্ষমতাকে দুষ্ট রাজনৈতিক ফন্দিফিকিরের মাধ্যমে সামরিক সরকার বৈধতা পেতে চায়। দেশ তখন পুনরায় স্বৈরতন্ত্রের কলাকৌশলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সামরিক সরকার প্রধান এরশাদ এমন কোনো মাধ্যম বাকি রাখেননি যে মাধ্যমটিতে তাঁর হাত পড়েনি। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলিতেও তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রচণ্ড। এতে সাধারণ মানুষ ছিল অতিষ্ঠ। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রটিকেও সামরিক স্বৈরশাসকের প্রভাব খাটিয়ে কবিতা লেখা শুরু করলেন এরশাদ এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকলে অধিকাংশ কবিসমাজ এরশাদের বিরুদ্ধাচারণ করে ব্যঙ্গার্থক কবিতা রচনা করেন। গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে এরশাদকে সজ্জিত হতে দেখে কবিসম্প্রদায় দেশের প্রতি টান অনুভব করেন। কবিরা স্বদেশকে অন্ধকারে ঘনীভূত হতে দেখেন। তাই আশির দশকের কবিতায় স্বৈরতন্ত্রের শাসনকে জনধিকৃত করে তোলেন কবিগণ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনাও এই দশকের কবিতায় প্রকাশ পায়।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে রাজনৈতিক আন্দোলন তথা সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। তবে এরশাদ সরকারের আমলে সরকারবিরোধী আন্দোলনের ধারা গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন মূলত ছাত্রদের মধ্য থেকেই সংগঠিত হয় আবার সমাপ্তিতেও তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলাদেশে সৃষ্ট নতুন মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে তিরাশিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা প্রথমে ছাত্ররাই সংগঠিত করে। এ সময় থেকে আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট ধারা তৈরি হয়। ছিয়াশিতে সংগঠিত হয় শ্রমিক আন্দোলন। সাতাশিতে আবার মধ্যশ্রেণি ও পেশাজীবী সংস্থাসমূহ নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়, সাতাশিতে অবরোধকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১০ নভেম্বর সাতাশি 'স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তিপাক' বুকে পিঠে রংতুলিতে লিখে নূর হোসেন শহীদ হয়– মূলত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই। উনসত্তরের আসাদের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সংগ্রামের যে প্রেরণা যুগিয়েছিল এই মৃত্যু তার মতোই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আসাদ মিছিলে গিয়েছিল স্বাধিকারের প্রশ্নে। নূর হোসেনও মিছিলেই গিয়েছিল। তবে স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র অপহরণকারী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। নূর হোসেন নব্বইয়ের গণআন্দোলনকে বেগবান করার চেতনার প্রতীক। পচাঁত্তর-উত্তর ময়েজউদ্দিন, তাজুল, শাহজাহান সিরাজ, রাউফুন বসুনিয়া প্রমুখ শহীদদের পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনায় ঘা দিয়ে নূর হোসেনও স্বৈরাচারবিরোধী চেতনাকে করেছে ত্বরান্বিত। কবিরা আন্দোলন ও রাজপথ থেকে সরে আসেননি। তাঁরা রাজপথে আয়োজন করেন– 'শৃঙ্খল মুক্তির জন্যে কবিতা'৮৭', 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা'৮৮', 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা'৮৯' এবং 'কবিতা রুখবেই সন্ত্রাস ১৯৯০'।

এরশাদ সরকারের শাসনামলে দুর্বার আন্দোলন মাঝে মধ্যেই দানা বেঁধে উঠেছে, আবার সে আন্দোলনকে ভরাডুবিতে নিয়ে যাবার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার। ছাত্রদের মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দেয়া এরশাদের যেন রুটিন বাঁধা আন্দোলনবিরোধী কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই কবিরা তাঁদের কবিতায় বাংলাদেশের অর্জিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মূল্যবোধের, অবক্ষয় রোধে ও গণতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠায় এমন একজন মানবকে প্রত্যাশা করেছেন যার প্রতিভা হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো, যার হাতে স্বাধীনতা কিংবা গণতন্ত্র জন্ম নেবে পরিপূর্ণ বিকাশে। এরশাদ আমলেই অদ্ভুত এক প্রতিকূল পরিস্থিতি বাংলাদেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ বাঁধার সৃষ্টি করে। এর জন্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শূন্যতাই ছিল বহুল পরিমাণে দায়ী। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন :

> রাজনীতি ও কবিতা একসঙ্গে যাবে না—এটা বলা সহজ, বলার প্ররোচনাও অধিক, ব্যবধান কর্মের সঙ্গে কল্পনার, ঘটনার সঙ্গে অনুভূতির, সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির। কিন্তু রাজনীতি যে জীবনেরই অংশ, সে যে কবিতা হয়ে যেতে পারে অনায়াসে, কর্ম যে পরিণত হতে পারে কল্পনায়, ঘটনা মিশে যেতে পারে অভিজ্ঞতায়, ব্যক্তি সংলগ্ন হতে পারে, সমষ্টিতে। (সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, ভূমিকাংশ)

আশির দশকে লক্ষ করা যায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে নষ্ট সময় থেকে পুনরুদ্ধার করে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস। কবিতায় উঠে এসেছে স্বৈরাচারের দুঃশাসনের ভয়াবহ ও নির্মম চিত্ররূপ, পাশাপাশি ব্যক্ত হয়েছে স্বৈরাচার শাসকবিরোধী প্রতিরোধ চেতনা।

রাজনৈতিক ও সমাজনীতির দিক থেকে বিড়ম্বনার সময় পঁচাত্তর থেকে নব্বই। অনেক টালমাটাল অনেক অভিসন্ধি ও উত্থান পতনের পর জেনারেল জিয়া ১৯৭৭-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। জিয়ার শাসনামলেই রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদপসারণের চলন শুরু হয়। যে ঐক্যে স্বাধীনতার লড়াই ঘটেছিল তা ছারখার করার পাঁয়তারা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পূর্বাভাস তীব্র হতে থাকে। একাশিতে জিয়া নিহত হবার পর বিরাশির মার্চে এরশাদ নিজের হাতে শাসন তুলে নিলে, এরশাদের হাতে বিকাশ এবং পরিণতি পায় সাম্প্রদায়িক, দারিদ্র্য, একনায়কত্ব সবরকমের পশ্চাৎগামিতা ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অবক্ষয়। কিন্তু পরিণতির সমাপ্তি পর্যায়ে রাজনৈতিক তিন জোটের অভিন্ন রূপরেখা অনুযায়ী গণঅভ্যুত্থান নব্বইয়ের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের মতো গণতন্ত্রেরও স্বপ্নভঙ্গ ঘটে অচিরেই। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পায়, গণতান্ত্রিক সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিএনপি সরকারের ভূমিকার যে স্বরূপ তা দৃশ্যমান হয় অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। ফলে আবারো আন্দোলন দেখা দেয় বাংলাদেশে।

আশির দশকে অনেক কবির আবির্ভাব ঘটলেও তাঁরা মূলত ক্ষণজীবী, দীর্ঘদিন কবিতায় নিবিষ্ট থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন কাব্যধারা সৃষ্টি অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি; অধিকন্তু বর্তমান গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে যে সব কবির কবিতা প্রণিধানযোগ্য তাঁরা হলেন : খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০-২০১৩), মাসুদ খান (জ. ১৯৫৯), আমিনুর রহমান সুলতান (জ. ১৯৬৪), সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ (জ. ১৯৬৫) প্রমুখ। এই কবিদের কবিতায় গ্রামীণ জীবন ও লোকজ অনুষঙ্গ বহুলভাবে নতুন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে বলে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০-২০১৩) এর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *তিন রমণীর ক্বাসিদা* (১৯৮৪), *পার্থ তোমার তীব্র তীর* (১৯৮৬), *জীবনের সমান চুমুক* (১৯৮৯), *সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর* (১৯৯২), যমুনাপর্ব (১৯৯৮), জন্মবাউল (২০০১), তোমার নামে বৃষ্টি নামে (২০০৮) প্রভৃতি। কবিতায় মিতবাক ও স্বচ্ছ সুন্দর শব্দের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতা যে বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার অনুসারী, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় তার নিদর্শন আছে। অত্যন্ত দক্ষ ও সচেতনতার সঙ্গে বাংলা কাব্য জগতে আশির দশকে যার প্রদীপ্ত পদক্ষেপ তিনি খোন্দকার আশরাফ হোসেন, তাঁরই সৃষ্টি 'একবিংশ' পত্রিকা। নন্দনতত্ত্বের শীর্ষস্থানীয় অন্যতম এই পত্রিকাই ছিল খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কাব্যজগতের পথ চলার সঙ্গী। মেধা ও মননের মিশেলে তিনি বাংলা কবিতার ভুবনে যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য। পূর্বসূরীদের বিশেষ করে তিরিশি ধারা থেকে আলাদা ও চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট থেকেও পুরোপুরি ভিন্ন ধারার কবিতা লিখে তিনি উত্তরাধুনিক চমক সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্ট শিল্পকর্মে। বিগত দশক থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপনে তাঁর পরিশ্রম ও প্রস্তুতি দু'টিই ছিলো খুব স্পষ্ট :

> সজ্ঞানেই তিনি আশির দশকের শুরুতে আবির্ভূত হলেন। একদিকে সত্তরের শ্লোগানমুখর ঝাঁঝাঁলো ধারা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে, অন্যদিকে অনেক নক্ষত্রজ্বলা ষাটের দশকে হারিয়ে না যেতে তাঁর এই সতর্ক পদক্ষেপ। তাঁর নিজের 'নির্জীব উদ্ভাসহীন' আর প্রখর শ্লোগানচারি' সত্তর দশকের অন্তর্ভুক্ত হতে চাননি সচেতনভাবেই। (কামরুল হাসান, কবিতার মুখপত্র একবিংশ ও কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *একবিংশ*, পৃ. ৬৩)

নিজস্ব ঐতিহ্যকে রক্ষা করে আশির দশকের স্বতন্ত্র স্বর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন যার প্রমাণ *তিন রমণীর ক্বাসিদা* কাব্যগ্রন্থ। নিজস্ব ঐতিহ্যকে লালন করে সেই সাথে তাঁর কাব্য ভাবনায় মননশীলতায় উন্নীত করে শিল্পসম্মত রূপ দান করেছেন। তিনি কবিতাকে দিতে চেয়েছেন নতুন আঙ্গিক, নতুন কাঠামো। চিরাচরিত এক ঘেয়েমি দূর করে কবিতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন অভিনবরূপে। যদিও তিনি পূর্বসূরীদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলেন, সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি হলেন :

> *তিন রমণীর ক্বাসিদায়* আশরাফ প্রবীণদের পরিমণ্ডল ছেড়ে যেতে পারেননি পুরোপুরি; আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, এমনকি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঘুরে ফিরে তাঁর কবিতার শরীরে উপস্থিত। তবে কবিতা যখন অনুভূতির শুদ্ধতম উচ্চারণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যখন কবিতায় ভাব ও ভাবনার যোগাযোগ অথবা প্রকাশ ভঙ্গির বৈচিত্র্যে জীবনের উপলব্ধি হয়ে ওঠে গাঢ় পুলকের বিষয়, সেসব মুহূর্তে খোন্দকার আশরাফ হোসেন

উপস্থিত হন একজন শুদ্ধ এবং শক্তিশালী কবি। (সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, তিন রমণীর ক্বাসিদা, *একবিংশ*, পৃ. ৫৫)

আশির দশকে উন্মোচিত খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর কাব্য জগত নির্মাণে কালপরিসরকে খুব সূক্ষ্মভাবে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার উচ্চ শিখরে পৌঁছে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। যার ফলে তিনি তাঁর কাব্য জগতকে ভরে তুলেছিলেন বিভিন্ন রূপক, চিত্রকল্প ও পুরাণের মিশেলে যা তাঁর ঐতিহ্য রক্ষারই নামান্তর। ইতিহাস, ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে সেটির ভেতর দিয়ে ভাবের জগতে পৌঁছেছেন তিনি। যেখানে নন্দনকলার শতভাগ মুক্তি। কবি অচঞ্চল নন। তিনি প্রচণ্ড, তিনি উদভ্রান্ত, তিনিই প্রেমিক। তাঁর অহংকার তাঁর কবিসত্তার সাথে সাথে প্রেম সত্তার। পৃথিবীতে তাঁকে বোঝা এত সহজ নয়, সেই অহংবোধের পরিচয় পাওয়া যায় :

আমাকে বুঝতে চাও এ সাহস কবে থেকে হলো?/আমার জীবন তুমি দু'হাতের অঞ্জলিতে নিয়ে
ধীরে ধীরে চেখে দেখবে আমি নই এমন সহজ।/দুঃখের ভিতরকার নম্র শাঁস তোমাদের সচ্ছল জিভের
বিনীত শিকার নয়, কণ্টকিত গোলাপের ডাল/ছোঁবে তুমি? রক্তাক্তই হবে শুধু দু'হাত তোমার।

(দুর্বোধ্য নায়ক, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ২২)

প্রেমিক সত্তার এই অহংবোধের আগেই তাঁর কবিসত্তার অহংবোধ দেখা যায় 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রার্থনায় নম্র হও পাবে' কবিতায়। নিজের কবিত্ব শক্তির প্রতি এত বড় আত্মবিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে বিরল ঘটনা :

পৃথিবীর সর্বশেষ কবি আমি অহঙ্কার আমার কবিতা/ বিষাদে বিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয়ের জলাধারে ধরো,
আমাতে নিবদ্ধ হও পূর্ণপ্রাণ ফলবন্ত হও-/ আমাকে পাবে না ফলে, পরাগ-নিষিক্ত হও, পাবে।

(প্রার্থনায় নম্র হও পাবে, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ১১)

এই আত্মবিশ্বাস তাঁকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয় যেখান থেকে তাঁর এই অহংকার অলংকারে পরিণত হয়। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতার প্রধান দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য : নারীসত্তা ও প্রেমিকসত্তা। অন্যভাবে বললে নারীকে ও প্রেমকে তিনি গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে দেখতে চেয়েছেন :

আশরাফের কবিতায় যা লক্ষণীয়, তা হচ্ছে নারী সম্পর্কে কবির প্রবল ও বিচিত্র স্ববিরোধ। আত্মনিবেদন ও আত্মাভিমান, স্বাতন্ত্র্য আর আত্মবিলোপ এই দুই বিরোধী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নারী সম্পর্কিত যাবতীয় ভাবনা চিন্তায় এসেছে এক তীব্র শক্তি। (সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, তিন রমণীর ক্বাসিদা, *একবিংশ*, পৃ. ৫৯)

প্রেমিকসত্তা ও নারীসত্তার বিচিত্র স্ববিরোধের চমৎকার চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন :

গোপন ছুরিকা দিয়ে কেটে নাও আমার দু'হাত।
তোমার নদীতে পালতোলা ছাড়া ওরা অন্য জীবিকা শিখেনি,

হাতি-দেখা অন্ধের মতোন তারা তোমার নিতম্ব ছুয়ে বলে,
এইতো ঘাসের দ্বীপ, স্থির জল, এইখানে নোঙর নামাও।

(নোঙর নামাও, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ৩৯)

প্রেমে উন্মত্ত কবি তাঁর প্রেমিক সত্তার পরিচয় দিয়েছেন যেভাবে তা লক্ষণীয় :

আমার শরীর ছাড়া অন্য কোন মোম/গলে গলে তোমার কোমল মুখে আলো ছড়াবে না,
আমার নিঃশ্বাস ছাড়া অন্য কোন অক্সিজেন নেই।/গাছেদের মতো আমি দুই ঠোঁটে চেটে নিই অঙ্গারক বায়ু
তোমার প্রকৃতি থেকে, অতঃপর শুদ্ধ প্রেম বাতাসে ছড়াই। (প্রেমিক, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ২৫)

কাজেই নারী কাব্যসাধনার এক বিরাট অনুপ্রেরণা। নারী হতে পারে জননী বা অন্য কোনোরূপে। অর্থাৎ, নারীই পারে পরিপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করতে যার রহস্যের সীমা অনতিক্রম :

নারীরা যদি হয় পূর্ণতা বহনকারী; কবি সত্তার অধিষ্ঠাত্রী ঈশ্বরী তবে আলোক হয়ে ওঠার বাসনাটি পূর্ণতা পায় যদি অন্তর্চক্ষুর উন্মীলন ঘটে ... আশরাফ প্রাজ্ঞ পন্ডিতও বটে, তাঁর কবিতায় দর্শনের তাত্ত্বিকতা নান্দনিক রূপ পেয়েছে রূপকের মুখশ্রীতে। নারী এখানে রূপান্বিত রূপক, কবি সত্তার একক জননী- যে কবিকে উত্থিত করে (বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দীসন্ধির কবিতা : দিশা ও বিদিশা*, পৃ. ১১৭)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন কবিতা নির্মাণে প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ নজরদারী করেছেন। তাঁর কবিতায় উপমা, রূপক, চিত্রকল্পের যে অপার ঐশ্বর্য্য তাতে যে কোনো কাব্যবোদ্ধা অনায়াসে ঝাঁপ দিয়ে আহরণ করতে পারেন মনিমুক্তা। তাঁর কবিতায় কোনো অস্পষ্টতা নেই, যা বলতে চেয়েছেন একদম বাস্তবসম্মতভাবে স্পষ্টভাষায় নির্দ্বিধায় খুব মজবুতভাবে তাঁর স্বরটি দৃঢ়চিত্তে উপস্থাপন করেছেন। কবিমাত্রই উপমা, রূপক চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা পর্যবেক্ষণ করেন সেই দিকটি বাদ দিলে কবি আশরাফ হোসেন অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তাঁর বাণীরূপ দিয়েছেন কাব্যকলা নির্মাণে। তাই একথা অকপটে বলা যায় :

কবি মাত্রই জানেন এবং কবিতার পাঠকও জানেন যে, কবিতায় ধরা ছোঁয়ার বাইরের জগৎকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে হলে ভাবের সাথে চিন্তার একটা যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। ধরা ছোঁয়ার বাইরের জগৎ বলতে শুধু ইন্দ্রিয় বহির্ভূত নয়। বরং প্রতিদিনের জীবনযাপনের অন্তর্গত সূক্ষ্ম অনুভূতি, আবেগ, সকল কিছুই বোঝায় যার সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ শুধু কবিতার নিগূঢ় উপলব্ধির জগতেই সম্ভব। (সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, তিন রমণীর ক্বাসিদা, *একবিংশ*, পৃ. ৬০)

এই উপলব্ধির জগতের সাথে বাস্তব জগতের সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ যোগাযোগ ঘটাতে প্রয়োজন উপমা, রূপক, চিত্রকল্প যা খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর কবিতায় খুব সাবলীলভাবে এর বিকাশ ঘটিয়েছেন দক্ষ কারিগরের মতোই। তাঁর চিত্রকল্পগুলো এত স্পষ্ট, যেন নিপুন হাতে কোনো চিত্র শিল্পীর তুলির ছোঁয়ার চিত্রপট চোখের সামনে ভেসে ওঠে :

ক. শেষরাতে যাকে ওরা শোয়ালো মাটিতে
সেতো আমারই মতন হবে দৈর্ঘ্যে আর।
বিষণ্ন দাড়িতে তার আমারই মতন কিছু কাঁচাপাকা
সুখ আর দুঃখের মিশেল। (গোর খোদকের মেয়ে, *পার্থ তোমার তীব্রতীর*, পৃ. ৫৯)

খ. এখন প্রখর দিন নগরীর ফুটপাথে তোলে কলরব,
গাড়ির ঘুরন্ত চাকা বহমান জীবনের মুখর শ্লোগান তুলে।
ছুটে যায়, রক্ত আর ঘাম মিশে চালু রাখে রিকশার চাকা!

(নুলো ভিখিরীর গান, *পার্থ তোমার তীব্র তীর*, পৃ. ৬৮)

শুধু তাই নয় খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট যে 'তিন' সংখ্যার প্রতি ছিল তাঁর পক্ষপাত বা আকর্ষণও বলা যায়। প্রায়শই দেখা যায় এই 'তিন' সংখ্যা নিয়ে নানাভাবে খেলে গেছেন তাঁর কবিতার মধ্যে :

> *তিন রমণীর ক্বাসিদা* কাব্যগ্রন্থের নামকবিতায় নামের মধ্যে তিনটি রমণীর তিন পর্বে উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। তিন পর্বে তাদের তিন রকমের রূপাবয়ব। কখনো তিন সখী, কখনো আবার তিন বোন, শেষপর্বে জননী-জায়া-কন্যার রূপে সমাগত। কবির অপূর্ণ পঙ্‌ক্তি, 'তিনটি রমণী শুধু বুনে যায় সূক্ষ্মতন্তু জাল'। এই তিন রমণী কবির সত্তায় জ্যামিতিক পূর্ণতার প্রতীকে আসে। তাই তিন সংখ্যাটি তাঁর শিল্পবোধের পূর্ণতা বোঝাতে বারবার ফিরে আসে। (অনু হোসেন, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সৃষ্টিপ্রতিভা, *একবিংশ*, পৃ. ১০৫)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন আলোচ্য কাব্যে রূপক ব্যবহারে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন :

ক. তুমি আমি দুইজন এক ফাঁদে বাঁধা আজ শিকারী-শিকার,
সুতার ত্রিকোণ ফাঁস নেমে এলে অন্ধকার ঘরে। (শিকারী ও কোড়াপাখি, *পার্থ তোমার তীব্র তীর*, পৃ. ৮৪)

খ. আমি দেখেছিলাম তাদের।/ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া পার হয়ে পাড়ে নামতেই
তিনটি কলস কাঁখে তিনজন নারী এসে/সামনে দাঁড়িয়েছিল, তিন প্রাজ্ঞ বৃক্ষের মতোন।

(তিন রমণীর ক্বাসিদা, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ১৪)

খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতার দক্ষতা ও শৈল্পিক দিক প্রমাণ করে দেয় তিনি কত বড় কবি। অনায়াসে ও খুব আন্তরিকভাবেই বলে দেন যা তাঁর বক্তব্য। অযাচিত শব্দের আড়ম্বর নেই তাঁর কাব্যের শরীরে। মন ও মননের সঙ্গে নান্দনিকতা ফুটিয়ে তুলতে তিনি সার্থক। তাঁর কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজেরই ভাষ্য :

> আমার কবিতা বিবর্তিত হয়েছে আমার অজান্তেই, আমার সচেতন প্রয়াস ছাড়াই। কারণ আমি কখনো কবিতা বানাইনি; যাঁরা মনে করেন কবিতা শুধুই নির্মাণ, ইটের পর ইট সাজিয়ে সামান্য কল্পনার পলেস্তরা দিয়ে বানিয়ে তোলা, আমি তাঁদের সাথে একমত নই। কবিতাই বরং বানিয়ে তুলেছে আমাকে, আমি আজ

যা তাই, শিব কিংবা বানর, সুশোভন কারুশিল্পিত পানপাত্র অথবা দোবড়ানো থেবড়ানো মাটির ঢেলা, অন্য কিছু। (অনু হোসেন, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সৃষ্টি প্রতিভা, *একবিংশ*, পৃ. ১১০)

প্রথম কাব্যগ্রন্থের পর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতে যেমন : *পার্থ তোমার তীব্র তীর*, *জীবনের সমান চুম্বক*, *সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর* এতে তাঁর কবি প্রতিভা বিচিত্র কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে নবদ্যুতির বিচ্ছুরণ ঘটে। আবার দেশাত্মবোধেও তাঁর কবিতা উদ্দীপ্ত :

খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় তা-ই যেন সংহত শিল্প প্রণোদনায় আরও বেশি প্রগাঢ় হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ তার কবিতার উপাদানমাত্র, যার অভ্যন্তরে দেশাত্মবোধ অনুপ্রেরণার কাজ করে, কিন্তু কবির লক্ষ্য হচ্ছে শিল্প নির্মাণ। একজন সত্যিকারের কবি সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে থেকেও কাব্যিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। (কাজী নাসির মামুন, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা : জীবনবাদী চেতনার অশ্বারোহী, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৬)

দেশের প্রতি দায়বদ্ধতাকে সঙ্গে করেই তাঁর সহজ সাবলীল কাব্যধারার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন লোকজ সংস্কৃতি, লোকজীবনভিত্তিক পুরাণ, উপাখ্যান ও পদাবলি। যার ফলে তিনি কাব্যজগতে একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট কবি প্রতিভারূপে উদিত হলেন।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন যতই শাহরিক জীবনের সাথে অভ্যস্ত থাকুন না কেন তাঁর শিকড়ে রয়েছে গ্রামবাংলা, নিসর্গ-প্রকৃতি। ঐতিহ্যের টানেই তিনি বারে বারে ফিরে তাকিয়েছেন তাঁর শৈশবে, আর সেখানেই অবগাহন করেছেন সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়ে। নিত্য-দিনের প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে তাঁর এই ঐতিহ্যের ছাপ রেখে গেছেন স্বাভাবিকভাবেই। বাস্তব জীবনের আলেখ্যে স্থির জীবনচিত্রকে তিনি রূপদান করেছেন শৈশব স্মৃতির পটে লোকজ জীবন অনুষঙ্গের ভেতর দিয়ে :

শৈশবে হাটের কোণে দাঁড় করিয়ে যেতেন বাবা
আনাজের দরদাম, আমিষের, অম্লতার খোঁজে। মনে হতো
কতো কাল এখানে দাঁড়ানো আছি, বাবা আসছেন না, আসছেন না
মনে হতো কি অচেনা প্রতিটি লোকের মুখ, কি অজানা স্নেহহীন প্রতিটি মানুষ।

(দাঁড়িয়ে আছি বৃক্ষের মতোন বৃক্ষ, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ১২)

নাগরিক জীবনের হতাশায় দিকবিদিক শূন্য জীবনযাত্রা বিমর্ষ প্রায় কবি স্বপ্ন দেখেন তাঁর এই স্থির জীবনের উদ্যমতা, চঞ্চলতা, স্বপ্ন, আশা ভরসা নিয়ে কেউ পরিপূর্ণ করে দিতে আসবে। সেই মুগ্ধ মানুষের অপেক্ষায় তিনি, যে মানুষ জনকের মতো আপন, যিনি তাঁর স্থির জীবনকে গতিময়তা দিবে পরম স্নেহে, যত্নে, ভালোবাসায় :

মানুষের স্রোত যায়, প্রতিটি মানুষ তবু এতটা অচেনা:
কবে ফিরবেন তিনি? পিতার মতোন কবে সে মুগ্ধ মানুষ
ফিরবেন, বলবেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'পা নিশ্চয় অবশ,

চল ঘরে যাই চল, এই হাটে বেচা কেনা তেমন জমে না।

(দাঁড়িয়ে আছি বৃক্ষের মতোন বৃক্ষ, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১২)

কংক্রিটময় শহর আর শহুরে মানুষগুলো মুখোসপরা জীবন দেখে হাফিয়ে উঠেছেন কবি। তাঁর অন্তরাত্মা পিপাসিত তাঁরই মাটির টানে। সেই কবে নিমাই পুত্র ঘর ছেড়েছিল, কিন্তু আজো সেই ছেড়ে আসা ঘরের জন্য মন কেমন করে। শহুরে ব্যস্ততা ভরা জীবন, সারাক্ষণ শুধু ছুটে চলা, সেই ছুটে চলা থেকে রেহাই পেতে কবির একমাত্র আশ্রয় তাঁর পল্লিপ্রকৃতি, সবুজে ঘেরা শান্তির গ্রাম :

তবু বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো, বাড়ি .../পথ ছাড়ো সুসময়, প্রতিশ্রুত সুখনিদ্রা, নিমগ্ন বালিশ
পথ ছাড়ো জীবনযাপন ব্যথা, পথ করে দাও।/আজ যাবো
ঝিনাই নদীর জল হাঁটুতে কাপড় তুলে পার হবো/মধ্যরাতে ডাক দিবো
মা মাগো এসেছি আমি! সেই কবে গভীর নিশীথে/তোমার নিমাই পুত্র ঘর ছেড়েছিল, আজ কাশী বৃন্দাবন
তুলাধুনা করে ফের তোর দীর্ণ চৌকাঠে এসেছি। (বাড়ি যাবো বাড়ি, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ৪৪-৪৫)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন ঐতিহ্য রক্ষায় শিল্পের বুনুনি দিয়েছেন পদাবলি, লোকায়ত জীবনের পুরাণ, লোকসংস্কৃতি ও সংস্কার প্রভৃতি উপকরণের সমন্বয়ে। তিনি নিজেকে বারবার ভেঙ্গে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাব্য সাধনায়। *তিন রমণীর ক্বাসিদা* কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় 'তিন রমণীর ক্বাসিদা'তে পৌরাণিক কাহিনির চরিত্র অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকারের বিখ্যাত চরিত্র ঈশ্বরী পাটুনীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এখানে নারী চরিত্র ও নারীর দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট :

আমি দেখেছিলাম তাদের।/ঈশ্বরী পাটুনীর খেয়া পার হয়ে পাড়ে নামতেই
তিনটি কলস কাঁখে তিনজন নারী এসে/সামনে দাঁড়িয়েছিল, তিন প্রাজ্ঞ বৃক্ষের মতোন।

(তিন রমণীর ক্বাসিদা, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ১৪)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন দার্শনিক মনোভঙ্গির সঙ্গে রূপকের আড়ালে লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির অনুষঙ্গগুলো তুলে ধরেছেন হাতের কাজ, সুতার কাজ, শোলক কাটা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে :

তিনটি রমণী বসে বুকে আঁটে ছায়ার বোতাম,/তিনটি রমণী তারা এইখানে কাটছে শোলক,
পিপাসার জল নয়, হাতে নিয়ে জলের পিপাসা/দীপ্ত এক অশ্বারোহী টেনে ধরে ঘোড়ার লাগাম।

(তিন রমণীর ক্বাসিদা, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ১৩)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন অস্তিত্বের সন্ধান খোঁজেন লোকপুরাণের অনন্তের পাখির রূপকে। এই সাধের মানব জন্মের শুরু কোথায়, শেষ কোথায়, বা মানব জন্মের অন্তরালে কবি তাঁর জন্মের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ান, খুঁজে বেড়ান মৃত্যুর উদ্দেশ্যও। লোকপুরাণের সাথে সাথে তিনি গ্রামবাংলার সংস্কৃতি পিঠা-পায়েস বানানোর জন্য কুলবধূ যিনি ছিলেন কবির 'আত্মার সঙ্গী' তাকে মনে পড়ে যায়– 'আলো চাল ধোয়া হাত' এর সেই স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে :

সারাদিন কাকে ডাকো, অনন্তের পাখি?

ডাকি ছায়া, নম্র আলো, ডাকি পূর্ণ ফলের বিশ্রাম,
আলোচাল ধোয়া হাতে একদিন আত্মার সঙ্গিনী
কপালের ঘাম মুছেছিল, উঠোনের এক প্রান্তে বেড়ে ওঠা
পুঁই ডালিমের পাতা একবার গেয়েছিল নির্বাণের গান-
তারপর মিশে গেছি জলপাতা ধুলার শরীরে। (সুদূরের পাখি, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ১৩)

জীবনের সমান চুমুক কাব্যগ্রন্থে *শ্রাবণযাপন* কবিতায় কবি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টির ভেতর দিয়ে বৃষ্টির ঝরে পড়াকে অবলোকন করেছেন। বৃষ্টি হলে মানুষ খুব স্বাভাবিক নিয়মে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে নদী পার, হাটের পথ, অন্ত্যজ মানুষের বসবাসের স্থানে কোনো এক বউয়ের ভেজা শরীর প্রভৃতি বিষয় তিনি ছবির মতো এঁকে গেছেন। যা গ্রামবাংলার বৃষ্টির সময়ের চিরায়ত রূপ :

বৃষ্টি এলো হাঁটুর উপর কাপড় তুলে গাঙ পেরুনো/হঠাৎ করে অথই জলে উবুর চুবুর উল্টে যাওয়া
হাটের পথে অন্ধকারে ফিরতি মানুষ/অনেক কথার কলবলানো,
জলি ধানের অপ্রাপ্যতা, পাটের বাজার মন্দা অতি/কামার পাড়ার হিজল বৌয়ের গ্রাত্রবরণ
বৃষ্টি এলো মরণমুখীর বুক-পরিমাণ সর্বনাশ। (শ্রাবণযাপন, *জীবনের সমান চুমুক*, পৃ. ১১৮)

কবি ক্ষণস্থায়ী এই জীবনকে সবটুকু উপভোগ করতে চান। আনন্দে অবগাহন করতে গিয়ে আনন্দঘন খেলা ঝাপুই যেটা গ্রামবাংলার উল্লেখযোগ্য একটি খেলা বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী দলবেঁধে নদীর ঘাটে-স্নান করা অবস্থায় এই ঝাপুই খেলে থাকে। জীবনকে সর্বাবস্থায় আনন্দময় করে তোলার ক্ষেত্রেও কবির সজাগ দৃষ্টি লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক খেলাধূলার প্রতি :

আয় লো তোরা ঝাপুই খেলি/নদীর মধ্যে জলের সাথে এক দুই তিন
চার পাঁচ নয় অলোকস্তম্ভ উঠছে ভেসে/যাক ভেসে যাক সোনার কলস
খোঁপায় গোঁজা লাল চামেলি/ঝাপুই খেলি
আয় লো তোরা ঝাপুই খেলি/ (ঝাপুই খেলা, *জীবনের সমান চুমুক*, পৃ. ৯৯)

পল্লির মা তার স্নেহের দুলালকে বিদায় বেলায় বারবার মায়ের স্নেহে ভরিয়ে দিচ্ছেন তার প্রিয় সন্তানের। কবি এখানে যেন নিজেই সেই সন্তান- যিনি গ্রাম থেকে বিদায় নিয়েছেন আর ফিরে যাবার উপায় নেই, আকুতি থাকে সর্বদা। মায়ের আকুতি রাখালের বাঁশি, নিমাই সন্ন্যাসীর দুঃখ ভরা পালার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। দেখা যাচ্ছে খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর গ্রামবাংলার চিরায়ত দিকটি ভোলেন নি :

আবার বাজলো বাঁশি, অই সেই সর্বনাশা সুর/শুনেছে যা চিরদিন দুঃখিনী মা; নিমাই সন্ন্যাসী-
পালা দেখে কতক্ষণ কেঁদেছিলি মনে পড়ে খোকা?/আবার লঞ্চের সিটি, দাঁড়া তুই শুধু একবার।
(উঠোন, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ৪৩)

পল্লিগ্রামের অনিষ্টকর প্রাণী ইঁদুর, শেয়াল এবং পৌরাণিক কাহিনির চরিত্র মনসার দুষ্ট আত্মা সবকিছুকে কবি দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য অর্থাৎ শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন লোকায়ত জীবনের আলেখ্যে তাঁর *জীবনের সমান চুমুক* কাব্যগ্রন্থের 'নৈশভোজ' কবিতার শরীরে। খোন্দকার আশরাফ হোসেন সমসাময়িক বাস্তবতার ভেতর থেকে তাঁর কাব্যচর্চা করে গেছেন। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তও তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে। যার ফলে তৎকালীন সময়ের স্বৈরসরকারের বেহায়াপনা, ক্ষমতার দর্প, ক্ষমতার অপচয় এবং তোতা পাখির মতো তোশামোদগিরির কথা অকপটে উল্লেখ করে গেছেন রূপকথার অলৌকিক কাহিনি, পরী ইত্যাদি লোকজ ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে :

আমরা ধরেছি খুঁট অলৌকিক চাদরের, আমরা বেঁধেছি নাড়া-
আমাদের পরী দেখাবে? বিরান শস্যের ক্ষেতে রাতে
দু'একটা মেঠো ইঁদুরের লেজ গর্ত থেকে বেরুলে তখন
আপনার যাদু-দন্ড নিমেষেই ঝলকাবে দারুণ-
নিমেষেই বানাতে পারেন তাকে কবিতা সিন্ড্রেলা।
আরো শুনি মধ্যরাতে সুচেতনা-নাম্নী কোন ডোম্বিনীর ঘরে
কল্পনার কালো টুপি পরে যাওয়া-আসাও করেন। (ওস্তাদ, *তিন রমণীর ক্বাসিদা*, পৃ. ৩১)

সমসাময়িক সময়ের দাবি উপর্যুক্ত কবিতাটি। স্বৈরশাসকের শাসনকালে ক্ষমতালোলুপতা, নারীলোলুপতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের যে স্বাক্ষর কবি তাঁর লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তা সত্যি অনেক বড় সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। এক্ষেত্রে বোঝা যায় খোন্দকার আশরাফ হোসেন পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে কখনো সত্য থেকে পিছপা হন নাই। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, যা দেখেছেন যা ঘটেছে তা দ্ব্যর্থভাবে লুকাছাপা না করে বলেছেন। খোন্দকার আশরাফ হোসেন বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলার লোকায়ত জীবনের ভেতর দিয়ে বিশেষ করে পুরাণ, লোককাহিনি, লোকঐতিহ্যভিত্তিক বিষয়গুলোকে কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতা- কোলাজ এর রঙ্গ কবিতায় সখিনা কাব্যটির ভিতর দিয়ে সখিনার যে দুঃখ দুর্দশা তার বর্ণনা করেছেন ছড়ার আদলে :

হায় সখিনা ঝাঁপ দিও না জলে/বিধির কলমের কালি সখিনার অঞ্চলে
মুছলে না যায়রে কালি ধুইলে না যায় জলে। (রঙ্গ-১, কবিতা কোলাজ, *সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর*, পৃ. ১৫৩)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন কবিতায় ঐতিহ্যের টানে বারবার পৌরাণিক কাহিনি থেকে উপাদান নিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠেন। যা তাঁর কাব্যের শৈল্পিকতার পরিচয় বহন করে :

> জীবনের বহুতলস্পর্শী শিল্পচেতনার অন্তর্গত তাগিদে কবি লোকায়ত সমাজে শিকড়ায়িত মনসা-বেহুলার লোক-পৌরাণিক কাহিনীর মৌলচেতনা এবং পুনর্নির্মিত নবচেতনার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে কবিতায় সন্নিবেশিত করেন। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩৪০)

মৃত স্বামীকে জীবিত করার আপ্রাণ চেষ্টার ভেতর দিয়ে বাঙালি রমণীর ধৈর্য্য ও সহ্যের চিত্র ফুটে ওঠার সাথে সাথে রমণীর সাংসারিক বিষয়টিও প্রাধান্য পায় বেহুলা চরিত্রের মাধ্যমে যার প্রমাণ মেলে তাঁর 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' কাব্যগ্রন্থের 'সিঁড়িতে পায়ের শব্দ' কবিতার বিষয়বস্তুতে।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন 'সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কবিতা কোলাজ' এর অধীনে 'ধানরমণী' কবিতায় দেখিয়েছেন যে ধান ভানার কাজে পারদর্শী রমণী বেহুলার প্রতীক হয়ে খুল্লনা ও লহনা রক্তের সম্পর্কের মতো সম্পর্কিত হয়ে লোকজীবনের অত্যন্ত বাস্তবঘন রূপ দেয় যা কবির নিপুণ শৈল্পিকতার দাবিদার :

> ধানভানে তিনজন, তিন বোন।
> বেহুলা কনিষ্ঠা তার বড়ো বোন যুবতী খুল্লনা
> মেজটি লহনা
> তারা ধান ভানেও ভালো জানেও ভালো-
> তাদের গায়ে রূপার সোনার গহনা।
>
> (ধানরমণী, কবিতা কোলাজ, *সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙর*, পৃ. ১৫৭)

লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকপুরাণ বেহুলা-মনসা কাহিনি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিমনে তা গভীর ছায়া ফেলেছে। *পার্থ তোমার তীব্র তীর* কাব্যের 'নোটনের জন্য শোক' কবিতায় তার স্পষ্ট প্রকাশ :

> বেহুলা ভাসান দিলো জীবনের সব দুঃখ-সুখ
> কচি কলা পাতা তার যৌবনের বুক
> নির্জন উঠান ঘিরে ছায়া ফেলে শকুনের মেলা
> ভেসে চলে চিরকাল বেহুলার মরণের ভেলা।
> গাঙড়ের জলে তার ভেসে চলে জীবন-যৌবন।
>
> (নোটনের জন্য শোক, *পার্থ তোমার তীব্র তীর*, পৃ. ৭৫)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে কবিতায় ব্যবহার করেছেন লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ– লোকমেলা ও লোকছড়া, লোকপ্রবাদ প্রভৃতি। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তার কবিতার পরতে পরতে লোকজ ঐতিহ্য ছড়িয়ে আছে। সময়ের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতার পাশাপাশি তাঁর লেখায় প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে বাংলার লোকপুরাণ, লোকসংস্কৃতি, লোকাচার; শোষিত মানুষ আর গ্রামবাংলার রমণী। খোন্দকার আশরাফ হোসেন দক্ষ হাতে কবিতার জগতে নানান

বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন। নতুনত্বের জন্যই অন্যদের থেকে তিনি আলাদা। তিনি নিজেও সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর অন্তরে ধারণ করতেন :

আমি একটু অন্য রকম পেখম মেলার ইচ্ছা রাখি,
বুকে আমার একটু জখম অন্য রকম,
রক্তপাতের পরে যেমন নিঃস্ব মানুষ নিশ্চেতনায়
ঘুমিয়ে থাকে, আমি তেমন ঘুমিয়ে ছিলাম
দীর্ঘ সময়-
আত্মঘাতী যুদ্ধ শেষে একটু বাঁচার ইচ্ছা রাখি।

(আত্মপক্ষ, *পার্থ তোমার তীব্র তীর*, পৃ. ৫৩)

স্পষ্টতই বোঝা যায়, কাব্য সাধনাকে চিরন্তন করার নিমিত্তে কবির এই দীর্ঘ প্রস্তুতি। স্বল্প সময় সাধনায় তাঁর কাব্যগুলো সত্যিই অন্যরকম, ভিন্ন স্বাদে কাব্য রস পান করা যায়। আধুনিক মানসলোকে লোকায়ত জীবনের আলেখ্যে যে শৈল্পিকতার পরিচয় দিয়েছেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন, তার জন্য তিনি বহুদিন বেঁচে থাকবেন বাংলা সাহিত্যের মণিকোঠায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাসুদ খান

মাসুদ খান (জ. ১৯৫৯) আশির দশকের কবি হলেও তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : *পাখিতীর্থদিনে* (১৯৯৩), *নদীকূলে করি বাস* (২০০১), *সরাইখানা ও হারানো মানুষ* (২০০৬), *আঁধারতমা আলোকরূপে তোমায় আমি জানি* (২০১১), *এই ধীর কমলা প্রবণ সন্ধ্যায়* (২০১৪), *দেহ অতিরিক্ত জ্বর* (২০১৫), *প্রজাপতি ও জংলি ফুলের উপাখ্যান* (২০১৬) এবং *প্রসন্ন দ্বীপদেশ* (২০১৮)। মনন ও মেধার সমন্বয়ে বিরহ-মিলনের যুগল সত্তা হলো কবিতার রহস্যালোক, যেখান থেকে তৃষিত আত্মা প্রতিনিয়ত বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে; এই দৃঢ় অনুধাবনই আশির দশকের কবি মাসুদ খানের কবিতা বিষয়ক চিন্তাভাবনার ফল। তাঁর মানস প্রবণতায় উঠে আসে নিজস্ব দর্শন চিন্তার স্ফূরণ, যা তাঁর স্বগোতক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত :

> কবিতা-অরণ্য হলো সেই রহস্যমেদুর রেইন ফরেস্ট, যেখান থেকে অক্সিজেন নেয় বহু-বহু বিষণ্ন ফুসফুস আর ত্যাগ করে খেদ ও নির্বেদ, গ্লানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, এমনকি কখনো-কখনো মনোক্সাইড। আর সেই বৃষ্টিবন ওইসব বিষ ও বিষাদকে ফের রূপান্তরিত করে ফেলে দ্রুত অম্লজানে। কবিতার রয়েছে সেই অভিনব সালোক-সংশ্লেষণী ক্ষমতা। (মাসুদ খান, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১)

আশির দশকের পরিশীলিত কবি নিজস্ব মেধা ও রুচির সমন্বয়ে জীবনের অতি সূক্ষ্ম বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় আত্মস্থের মধ্য দিয়ে সব্যসাচীর ভূমিকায় কবিতার উচ্চমার্গীয় শিল্পীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। বিজ্ঞানমনস্কতা ও নান্দনিকতা অনুভবের সাথে দেশ-বিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ, আকাশ, স্পেস, নীহারিকা এসবের সঙ্গে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের নানা বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি হয়ে উঠেছেন একেবারে সিদ্ধহস্ত। মাসুদ খানের কবি প্রতিভা সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক বেগম আখতার কামালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> মাসুদ খানের প্রথম কাব্যের অন্তর্বয়নের শব্দজাদু তাঁর টেক্সটকে গভীরভাবে দ্যোতক-দ্যোতিতের নিবিড় সংশ্লেষণে ক্রিয়াশীল থাকে এবং সময়ান্তরে পরবর্তী কাব্যে তা নিঃসীম নীরবতা আর দ্যোতনার দ্যুতিময়তায় কথনক্রিয়াকে নিয়ে যায় শিল্পের রহস্যপুরীতে। কিন্তু এই কবির স্বাতন্ত্র্য হল তাঁর ডিকশনে দুর্বোধ্যতা প্রশ্রয় পায়নি, পাঠকের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী চিত্তে অন্তরতর হয়ে ওঠে। সে অর্থে আমরা তাঁর ডিকশনে এক ধরনের শক্তিময়তাই লক্ষ করি। আমাদের লোকসংস্কার, কাহিনি, মিথ-পুরাণ আর প্রাত্যহিক জীবনস্বরই অনুরঞ্জিত হতে হতে একসময় নিরবতায় উত্তীর্ণ হয়, নিরঞ্জন হয়ে ওঠে। (বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দীসন্ধির কবিতা*, পৃ. ১৩৫)

বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে নিজস্ব চিন্তা ও চরিত্রের অনবদ্য আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পাখিতীর্থদিনে' থেকেই তিনি কবিতার জন্য আধার ও আধেয় দুইয়েরই ভিত্তিভূমির সন্ধান

পেয়ে যান। সেই ঠিকানা যে পাকাপোক্ত তা কাব্যগ্রন্থ পাঠে অনায়াসে চোখে পড়ে। নিজস্ব ঐতিহ্য সচেতন কবি মাসুদ খান ঐতিহ্যকে দেখেছেন বিজ্ঞানের চোখে যার দরুণ বিগত দশক বিশেষ করে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কবিদের কবিতার মতো তাঁর কবিতায় ঐতিহ্য এতো সোজাসাপটা ভাবে ধরা দেয়নি। তিনি ঐতিহ্যকে বিজ্ঞানের আলোকে পর্যালোচনা করে কবিতার ভেতর আনতে চেয়েছেন ভিন্ন পর্যায়। আর বাংলা কবিতায় তাঁর এই প্রচেষ্টা অভিনব। বিজ্ঞান সচেতন কবি ঐতিহ্যের অবগাহন করেছেন সেই সাথে জড়ো করেছেন তাঁর কবিতায় কসমিক জগতের অনু-পরমাণু সবকিছুকে। তাঁর কবিতা যেন এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে ধরা দেয় পাঠক হৃদয়ে যেখানে মিথ বাস্তব-পরাবাস্তব সব একই বিন্দুতে। আত্মআবিস্কারে মূল থেকে মাসুদ খান নিজেকে মেলে ধরেন ব্যাপকতার মাঝে। স্থান কাল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কালপ্রবাহ ও ইতিহাস ঐতিহ্য মিথ মিশ্রণে তিনি যেন একের মাঝে অনেক ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক। তিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙ্গে চলছেন বিজ্ঞানের দৃষ্টিমেলা চোখে ঠিক যেন মৌলিকতায়। তিনি পদার্থের মতোই নিজেকে ভেঙ্গে চুরমার করে আবার গড়ে তোলার বাসনায় নিয়োজিত। তিনি নিজেকে নিয়ে যেতে চান এক অসীম আলোকে যার ছোঁয়া পেতে মাসুদ খানের অপেক্ষা যেন অনন্ত কিন্তু কোথায় এর শেষ। মাসুদ খান এক স্বপ্ন চৈতন্যে যেন ভেসে চলেছেন, তাঁর স্বপ্নের বাড়ি যেন আকাশে লক্ষ তারা নীহারিকা বা উল্কাকে ছাড়িয়ে দূরে আরো দূরে। সেখানে পৌঁছানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। দেখেছেন কবিতাকে নতুন এক আঙ্গিকে যেখানে ফুটে ওঠে নতুন এক শৈল্পিকতা :

> এই নন্দনতত্ত্ব যতটা আধুনিক বোধের সংলগ্ন, তারও বেশি নিজস্ব শৈলী আবিষ্কারে অন্তর্নিবিষ্ট– যা আধুনিক বোধ ছাড়িয়ে বর্তমানতার চারিত্র্য গঠনে মনোনিবেশী। (বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দীসন্ধির কবিতা*, পৃ. ১৩৩)

স্বঘোষিত কবিতার সালোক সংশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী কবি তাঁর কবিতার জারক রসে জারিত করতে চান এই মহাবিশ্বকে। মহাকালকে ধরে রাখা বাস্তবে সম্ভব না হলেও তিনি কবিতার মাধ্যমে সেই কাল প্রবাহকে বেঁধে রাখতে চান আধুনিক উত্তরাধুনিক আর পরাবাস্তবতায়। বিজ্ঞানমনস্ক কবির সবচিন্তা ভাবনা বিজ্ঞানসম্মত। তিনি আত্মআবিস্কার করতে গিয়ে সমষ্টির আত্মার পরিচয় খুঁজে ফেরেন। তিনি কবিতাকে মিলিয়ে দেন একই সঙ্গে একক ও সমষ্টির দ্যোতনায় :

> যে কারণে প্রথম কবিতা গ্রন্থ থেকেই তিনি অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান ও আবেগের এমন যৌথরাগ কবিতার শব্দগুচ্ছে তুলে ধরেন, যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনায়নের অস্থির তরঙ্গ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর 'পাখিতীর্থদিনে' কবিতাগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় কবির মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে অস্তিত্বগত নিঃসঙ্গতা ও আত্মসন্ধানের হাহাকার। মানুষ যে একই সঙ্গে নিজের ভূখণ্ড এবং বিশ্বজীবনের অংশ, এক গভীর

বিজ্ঞানমনস্ক অনুধাবন থেকে সেই স্তরে উপনীত হয়েছেন তিনি। (রফিকউল্লাহ খান, *শ্রেষ্ঠ কবিতা : মাসুদ খান*, পরিশিষ্টাংশ, পৃ. ১৯১)

বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য বহু পুরানো যা হাজার বছরের প্রায়, সেই সময়কাল পর্যবেক্ষণে উঠে আসে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রতির যুগল বন্ধন। আর সেই হারানো ঐতিহ্য যেন খুঁজে ফিরেন কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। তিনি তাঁর শিকড় যেন ফিরে পান এই 'ধূলি' রাশির 'ঘনত্বজাতক' এ অর্থাৎ কবির মতে যা কিছু পুরানো যা কিছু ঐতিহ্য তা ফিরে পাওয়া যাবে একমাত্র মহাজাগতিক এই মৃত্তিকার ভেতর আর মাটি নিজেই যে একটি প্রাণের উৎস তার পরিচয় মাটির ক্ষমতায় কবির ভাষায় :

ধূলি?
মৃত্তিকার কনিষ্ঠ উপজাত।
আবার, মৃত্তিকা?
মহাজাগতিক ধূলিরাশির শেষতম ঘনত্বজাতক।
তাই এমন কোনো পদার্থ নেই, যা বিরাজ করে না মাটিতে।
আর দ্যাখো, মৃত্তিকা বড়ই প্রাণ-উদ্দীপক-
পাথরও, পুঁতে রাখলে, ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

(ধূলিবিদ্যা, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২৭)

মাসুদ খানের কবিতায় বিষয় ভাবনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলার পেছনে কাজ করেছে তাঁর নিঃসঙ্গ, বিষণ্ন ও অর্ন্তমুখি জীবনের হাহাকারের সাথে শিকড়ের সন্ধান যা তিনি পার্থিব জগতের সাথে এক করে তুলেছেন। তাঁর কসমো ভাবনাই তাঁকে স্বতন্ত্র করেছে। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার স্রোতে বুঝতে পেরেছিলেন এই চলমান বিশ্বের মতো কবিতাও একটি সক্রিয় বস্তু, ফলে তিনিও এই মহাবিশ্বের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে চেয়েছেন :

সর্বদা গতিশীল মহাবিশ্বের ন্যায় কবিতার জগৎ চলমান মাসুদ খানের সৃজনবিশ্বে। ফলে তাঁর কবিতার আত্মদহন, আত্মজিজ্ঞাসা কিংবা আত্মোন্মোচনের যে সীমারেখা তা অনেকাংশে পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত ও পৃথিবীর বাইরের অনান্য নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ, তারা পর্যন্ত পরিবাপ্ত। যেখানে কবি নিজের তাৎপর্য খোঁজেন মহাশূন্যের করতলে, এমন পরিস্থিতিতে কবির বিষাদ-বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়ে যা একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতি হয়েও বিশ্বময়। (মানিকুল ইসলাম, মাসুদ খানের কবিতা : বিষয়বৈভব ও প্রকরণনিষ্ঠা, *উলুখাগড়া*, পৃ. ১৭১-৭২)

মাসুদ খান অনুকরণপ্রিয় নন। বিগত কবিগণ যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন ফলে তাঁরা দূরে সরে যাচ্ছিলেন নিজস্ব ভাষা সাহিত্য থেকে ঠিক সেখানেই মাসুদ খানের ঘুরে দাঁড়ানো। তিনি চেয়েছেন নিজস্ব সত্তাকে চিন্তা ভাবনার প্রসারে আপন আলোকে অবগাহন

করতে। তিনি নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্যকে পুনরায় নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরতে চান তাঁর দূরদৃষ্টি বিজ্ঞান মনস্ক ভাবনায়।

ঐতিহ্যবাহী কবি নিজস্ব ঐতিহ্যকে অনুভব করেন আত্মার মধ্যে। তাঁর বেড়ে ওঠার পেছনে এই ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসার প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশ বেশ আন্দাজ করা যায়। তিনি গ্রামবাংলার নদীনালা খালবিল, ঝিলের সহজ দুপুরের, দূরন্ত যৌবনের একান্ত আপন সন্তান। নিজ মাতৃভূমি তাঁর রক্তে অস্থিমজ্জায় মিশে আছে সেই কারণেই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি, যেখানে ছোঁয়া থাকে নতুনত্বের :

> স্বদেশসংগ্রাম, ভাঙ্গাগড়া ও স্বাধীনতা-উত্তর জাতীয়, বৈশ্বিক পরিমণ্ডল ধারণপূর্বক চারদিকের অন্তঃসারশূন্য সময়-সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাসুদ খান বাংলার ভাবসম্পদ ও লোকায়ত দর্শনকে অনুভবনিষ্ঠায় উপস্থিত করেন কবিতার পাঠকের সামনে; সেখানে যেমন আছে বহুমাত্রিক বিষয় তেমনি আছে বিষয়হীনতার শাব্দিক উদ্ভাসন। তাঁর কবিতা মুখ্যত দাঁড়িয়ে আছে মানবমনের নিঃসঙ্গতা, আত্মানুসন্ধান, বিলাপবেদনার অন্তঃক্ষরণ, বিজ্ঞানচিন্তা, পুরাণকথা, লিরিকাল মাধুর্যতা, মহাবিশ্বের সংযোগসূত্রতার ব্যাক্তিময়তার ওপর। (মানিকুল ইসলাম, মাসুদ খানের কবিতা : বিষয়বৈভব ও প্রকরণনিষ্ঠা, *উলুখাগড়া*, পৃ. ১৭০)

শৈশব-কৈশোরে বেড়ে ওঠার পেছনে তাঁর যে কবিতা লেখার একটি বিশাল অনুপ্রেরণা কাজ করেছে তা অনায়াসে বোঝা যায়। শুধু তাই নয় মাসুদ খানের নিজস্ব স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যও তাই প্রমাণ করে। প্রকৃতির অপরূপ লীলা তার পসরা সাজিয়ে যেন বসেছে কবির শৈশবে। কোনটা রেখে তিনি কোনটাকে প্রাধান্য দেবেন সেই শিশু বয়স থেকেই চলে নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়া। একসময় সেই বোঝাপড়ার দ্বন্দ্ব শেষ হয়। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন কিশোর বয়সেই, সবই তাঁর ভাবনার বিষয়ে ঠাঁই পায়, বাদ পড়ে না কিছু। বাবার চাকুরির বরেন্দ্র অঞ্চল, কর্কশ লাল মাটি, ধূলি হাওয়া, বৃষ্টি, আঠালো মাটি, কাদা মাটি, গাছপালা- পশুপাখি, আলো-ছায়া, অক্সিজেন, কিছুই বাদ পড়ে না। সব তাঁর সূক্ষ্মচিন্তার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তাঁর নিজের ভাষায় :

> আমার জন্ম উত্তরবঙ্গে, জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলালে। শৈশবও কেটেছে বগুড়া ও জয়পুরহাটের নানা জায়গায়, পিতার কর্মস্থলে। বরেন্দ্র অঞ্চল। শুকনা মৌসুমে সেখানকার কর্কশ লাল মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ধূলি ওড়ে খরখরে হাওয়ায়। আবার বৃষ্টি হলেই একেবারেই কোমল কাদা। সে-কাদা লাল, সান্দ্র, আঠালো। আবার আমার কৈশোর কেটেছে নরম পলিমাটি- গড়া যমুনা- ধোয়া অববাহিকায়। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে। প্রমত্ত যমুনার বিচিত্র লীলাবিজড়িত সেই অঞ্চল। প্রচুর আলো ও ছায়া, অক্সিজেন, গাছপালা, পশুপাখি, প্রাণবৈচিত্র্য আর প্রাণচাঞ্চলে ভরা মুখর এক জনপদ। পানি, স্রোত বালু আর পলিমাটি। নদী সেখানে ভাঙে, আবার গড়ে। তালে তালে তাই মানুষকেও ভাঙতে হয় অনেক কিছু গড়ে তুলতে হয় পুনর্বার। (মাসুদ খান : *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১)

কবিতার জগতের ভিন্ন এক বাসিন্দা আশির দশকের বিজ্ঞানমনস্ক এই কবি বিজ্ঞানচেনাশ্রয়ী চিত্রকল্প নির্মাণে সর্বদা সচেষ্ট। তিনি নির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কবিতার নন্দন ভাবনাকে নিজস্ব এক শিল্প আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। গ্রামবাংলার চিরকালীন ঐতিহ্যের সমাহার তাঁর কাব্যে নবতর দ্যুতি ছড়ায় ঠিক আলোক রশ্মির মতোই। তাঁর কবিতা আকাশে লক্ষ তারার মিছিলে ধ্রুব তারার মতোই পথ নির্দেশক। ঐতিহ্য-সন্ধানী কবি বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যে ডুব দিয়েছেন, সমালোচকের ভাষায় :

> বাঙালি-বাংলার চিরায়ত ও লোকায়ত ধারা কিংবা ঐতিহ্য কোনোটাই তার কাব্যে নিছক নয়; চেতন-অবচেতনের সঙ্গমে পরিশীলিত এবং প্রত্নরূপে দৃপ্ত পরিবেশনা পায়। অমলিন অমরতায় পথ চলতে থাকে। এর প্রধান কারণটি নিহিত; কোনো নিয়ম, বৃত্ত বা আরোপ করা কোনো শর্ত একেবারেই তাঁর রূপজগৎকে স্পর্শ করতে পারে না। এক ধরনের প্রচণ্ডতায় (স্যাটায়ার, হিউমার, উইট কিংবা নাটকীয় প্রবাহে) আধুনিকতাকে তিনি গেঁথে ফেলেন ঐতিহ্যিক ধ্বনিচিহ্নের মূলবিন্দুতে। উত্তর-উপনিবেশী মন তাঁর এ পথটি তৈরি করে থাকলেও মূলের আনুত্য তো অনস্বীকার্য নয়। বরং একটা সময়ে তা আত্মঅস্তিত্ব এবং অনিবার্যরূপে পুনর্গঠন তৎপরতার দীপ্র প্রেরণা। এসব ব্যাখ্যায়নে মাসুদ খান অনেকের থেকে তিনি স্বাতন্ত্র্য। (শহীদ ইকবাল, আশির কবিতায় নির্মাণচিন্তা ও প্রতিষ্ঠিত সঞ্চয়, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৩২৭)

'পাখিতীর্থদিনের' কাব্যগ্রন্থে 'কুড়িগ্রাম' কবিতার ভেতর দিয়ে তাঁর গ্রামীণ ও লোকজ জীবন প্রণালী ধরা পড়ে। যেখানে রাতের গভীরে যেন 'কুড়িগ্রাম' বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাস্তব-পরাবাস্তব এর সমন্বয়ে আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে এই তিন সূত্রের বলয়ে যেন কবিতাটি ঘুরতে থাকে সেই সাথে তার মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে স্মৃতি নষ্টালজিয়া, তিনি তিনটি কালকে ধরতে চান মহাজাগতিক আবর্তে :

> রাত গভীর হলে আমাদের এই প্রচলিত ভূপৃষ্ঠ থেকে
> ঘুমন্ত কুড়িগ্রাম ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যায়।
> অগ্রাহ্য করে সকল মাধাকর্ষণ।
> তারপর তার ছোট রাজ্যপাট নিয়ে উড়ে উড়ে
> চলে যায় দূর শূন্যলোকে। (কুড়িগ্রাম, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২১)

কবির কল্পনায় যখন সমস্ত মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে কুড়িগ্রাম হাজার হাজার দূরত্বে চলে যায় তখন যেন মনে হয় বিশাল আকাশের মুখে তিল পরিমাণ একটা কিছু। কবির কুড়িগ্রাম যেন কবিকে নিয়ে নভমণ্ডলে ঘুরে বেড়ায় এক সময় তারাদের রাজ্য থেকে ঘুরে এসে আবার চলে আসে এই মর্ত্যধামে। অর্থাৎ, তাঁর স্বপ্নের কুড়িগ্রাম স্বপ্নরাজ্য ঘুরে চলে আসে বাস্তব পৃথিবীতে যেখানে আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে। কবি অত্যন্ত দরদী হয়ে কুড়িগ্রামের মাছরাঙা আর পানকৌড়ি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের রূপকে চিহ্নিত করেন। পাখিদের ঘর সংসারের চিত্রকল্পের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মাসুদ খান গ্রামবাংলায় বয়ে চলা নদীর কথা ব্যক্ত করেন। যেখানে শুকিয়ে যাওয়া নদীর তীরে পাখিদের আবাসস্থল :

সেই দেশে, কুড়িগ্রামে, ওরা মাছরাঙা আর পানকৌড়ি- দুই বৈমাত্রেয় ভাই
কুড়িগ্রামের সব নদী শান্ত হয়ে এলে
দুই ভাই নদীবুকে বাসা বাঁধে
স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ তারা কলহ করে। (কুড়িগ্রাম, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২১)

মাসুদ খানের কবিতার মধ্যে দেখা যায় চিরায়ত বাংলার লোকজ চেতনা যা মাটি গন্ধী জীবনের দিকে ধাবিত, গীতলতাপূর্ণ, যা মর্মে মর্মে পৌঁছে এক অনুরণন ঘটায়। আর এই কারণেই তাঁর কবিতা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বহন করে।

কৈশোর জীবনে কবি নদীতে অবগাহন করেছেন, ডুব সাঁতারে দু'হাত ভরে তুলেছেন নদীর দান নুড়ি পাথর। নদীর সাথে সেই লীলাময় স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। যেই নদীর জল এতটাই স্বচ্ছ যার তুলনা হয় ইস্পাত পাতের সাথে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেমন নদীর গতিপথ বদলায় তেমনি মানুষের জীবনও বদলায়। নদীর বোহেমিয়ান চলার কারণে যেমন 'নিঃস্বকালো গহ্বর' এ কুড়িগ্রামকে ডুবে যেতে দেখেন কবি তেমনি গ্রামবাংলার মানুষের জীবন পরিবর্তিত লোকায়ত জীবন ঢাকা পড়ে কুড়িগ্রামের সেই নিঃস্ব কালো গহ্বরের মতো। কবির ভাষায় :

হঠাৎ বয়নসূত্র ভুলে যাওয়া এক নিঃসঙ্গ বাবুই
ঝড়াহত জীর্ণ মাস্তুলে ব'সে
দুলতে দুলতে আসে ওই স্বচ্ছ ইস্পাত-পাতের নদীজলে।
কুড়িগ্রাম, আহা কুড়িগ্রাম !
পৃথিবীর যে জায়গাটিতে কুড়িগ্রাম থাকে
এখন সেখানে নিঃস্ব কালো গহ্বর। (কুড়িগ্রাম, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২১)

মাসুদ খানের স্নায়ুতে ঐতিহ্যের ধারা বহমান আর মস্তিষ্কে চলে বিজ্ঞানের নানা অনুষঙ্গের বিশ্লেষণ। এই দুই রকম চিন্তাধারার ফসল হলো তাঁর ঐতিহ্যসন্ধানী কবিতার বাণী আর বিজ্ঞানের আশীর্বাদপুষ্ট বাস্তবতা। অর্থাৎ, বাংলার যেমন রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য- একথা যেমন ধ্রুব সত্য এও সত্য যে মানব জীবন প্রবাহ পুরোটাই এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া। সেই কারণেই মাসুদ খান তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ভাবনাকে কবিতার মধ্যে এনে নতুনত্ব রূপ দেবার প্রচেষ্টা চালান :

তোমাকে বিধৃত করে থাকে
অশেষ-ছড়ানো দুপুরের ঘন ক্ষীরমাখা হরীতকী ফলের প্রচ্ছায়া
নিচে অকথ্য অসহ আন্দোলন,
নিচে ধীর বহমান জীবাশ্মা-জ্বালানি, ম্যাঙ্গানিজ ...
তবু, কত নিদ্রা যাও রে কন্যা ...
জাগো, জাগো একটুখানি। (কন্যাসংহিতা, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২৩)

বিজ্ঞান ও আবেগের যৌথ মিলনে গড়ে ওঠে মাসুদ খানের কবিতার শিল্পরূপ যেখানে মনের অতল থেকে উঠে আসে কবিতার ভাষা ছন্দ অলংকার। সেই প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে তিনি বুনে চলেন লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গ ও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ-স্মারক। 'বৈশ্যদেরকাল' কবিতায় কবির কাছে ধরা পড়ে নানা কিছু। সেখানে লোকঐতিহ্যের 'পঞ্চকাণ্ড মেলা' যেমন তাঁর ভাবের স্রোতে বহমান ঠিক তেমনভাবে মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী নিসর্গের অন্যতম প্রধান উপকরণ বৃক্ষ যা মানব জীবনের অপরিহার্য অংশের দাতা (অক্সিজেন), আর বিজ্ঞানের প্রমাণিত মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি এক ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করে যা তাঁর কবিতাকে রূপকথার উপকথার লোকবিশ্বাসের সাথে সাথে অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে যা নিঃসন্দেহে শৈল্পিক :

ওইখানে হইহই রইরই পঞ্চকাণ্ড মেলা বসতো
হাজার বর্ষ আগে
আজ শুধু একজোড়া নিরিবিলি জলমগ্ন বৃক্ষ বাস করে।
দূরে ওই বৃক্ষমিথুনের থেকে, থেকে-থেকে মিথেন জ্বলে উঠলেই
ছেলেরা ও মেয়েরা একালে বলে ওঠে, ওই যে ভূতের আলো দেখা যায়।

(বৈশ্যদের কাল, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৩০)

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবি জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সফল হতে চান, নিজের ভেতরের আত্মবিশ্বাসকে তিনি জাগ্রত করতে রূপকথার উপকথার পিঠা ফলের লোকজ কাহিনিকে রূপান্তরিত করেন নিজস্ব আদলে। পিঠাফল হলো ধনসম্পদের প্রতীক। লোক কাহিনির রাখাল পিঠাফল ফলিয়ে যেমন গ্রামবাংলার ভাগ্য ফিরিয়ে আনেন তেমনি রাখালের এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসকে মূল করে কবি তাঁর কবিতা সৃজনে ব্রত, তিনি সেই প্রত্যয়ী পিঠাফলের নায়ক রাখাল :

১. পিঠায় পিঠায় ভরে গেছে সব গাছ।
আজ সে-রাখাল, সেই অলস সৃজনকর্তা, ছিটকে
বেরিয়ে প্রথম প্রকাশিত নদীপথে এ স্লেচ্ছভাষায়,
প্লাস্টিক ছেঁড়ার মতো শব্দ করে বায়ুতে বায়ুতে।

২. বিস্ফারিত তার চক্ষু ত্রিভুবন
অসংখ্য ঝকঝকে ঝুলমান পিঠার প্রকাশ।

৩. আমাদের মন্থর ম্যাজিশিয়ান আহা এ আলস্য মধুরেণ
পিঠাকীর্তি- পুরাণ ওই ...
পেতে-রাখা কম্বলের ওপর দু-চারটি টুপটাপ পিঠাফল।

(পিঠাপুরাণ, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২৪)

মাসুদ খান বাংলার ঐতিহ্যকে বারবার স্মরণ করে চলছেন যার ফলস্বরূপ তাঁর কবিতার চরণে সেই আলোকছটা বিকিরণ করে। মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কৃষ্ণকে তিনি লীলাকৃত্য থেকে নিয়ে আসেন অন্য রকম অবস্থায়। কৃষ্ণ 'নিস্পলক নিয়তি-বাধিত'। যেন কেউ সম্মোহন করে রেখেছে এই পৌরাণিক চরিত্রটিকে। কৃষ্ণরূপী কবি যেন অনুধাবন করতে চান আমিষ ও অ্যাসিডের কখন বিক্রিয়াটি ঘটে, কখন মানব দেহের ভেতর চলে রাসায়নিক বিক্রিয়া। পৌরাণিক চরিত্রের আলোকে মানব দেহে ঘটে যাওয়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি প্রেমকে যেন দেখেছেন এই বিক্রিয়ার মধ্যেই :

শ্রীকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে তাই লীলাকৃত্য ফেলে উষাকাল থেকে
বিবিধ আমিষ ও অ্যামিনো অম্লের সামনে দাঁড়াতে হয়
নিস্পলক, নিয়তিবাধিত।
দেখে যেতে হয়–
আমিষে অ্যাসিডে ঠিক কখন উন্মেষ, প্রথম স্পন্দনের। (স্রোত ৫, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৩৪)

নিজ গৃহ ফেরার টান কার না থাকে। আর সে যদি হয় পরবাসী। সেই প্রবাসী কবির কাছে পৃথিবীর সব স্থানই যেন তাঁর কাছে মনে হয় নিজের আবাস। বাবুই পাখির মতো শিল্পী কবি মাসুদ খান তাই দিগন্ত জুড়ে তাঁর কল্পনায় ভাসে– 'একা একটি কুঁড়েঘর' বলার অপেক্ষাই থাকে না এই ঘরের বাসিন্দা কবি নিজে। কিন্তু কবি সেই ঘর ফেলে এসেছেন অতীতে, ফেলে আসা সময়ের আত্মাহীন দেহটি প্রবাসে থাকলেও তিনি স্বপ্নের ভেতর লালন করেন সেই কুঁড়েঘর :

দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি একা একটি কুঁড়েঘর,
ডানে-বামে আশেপাশে কোথাও কিচ্ছুটি নেই।
কারা থাকে, ঘরে? (স্রোত ১৪, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৩৭)

ঠিক একই অনুভবে তাঁর 'আপেল' কবিতাটি নির্মিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চক্রমণ শেষে মানুষের মূলে ফেরার বাসনা জাগ্রত হয়। মাসুদ খানও তেমনি দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ শেষে যেন ক্লান্ত প্রাণ ঘরে ফেরার, মাটির কাছে ফেরার অদম্য টান অনুভব করেন। আর এই অদম্য ইচ্ছা শক্তিকে তিনি নিউটনের তৃতীয় সূত্রের সাথে মিলিয়ে আপেলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কাছে পরাস্তের রূপকে যেন নিজেকেই দেখেন। প্রকৌশল বিদ্যায় জ্ঞান থাকায় তিনি বিজ্ঞানের সাথে বিদ্যাপতির পদটিও জুড়ে দেন যা থেকে বোঝা যায় তাঁর নিজ ভাষা সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ :

আপেল বাগানের মালিক ঝিমাতে ঝিমাতে
এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।
অলক্ষ্যেই ফল ঝরে পড়ে ধরিত্রীর গায়ে।
অবশেষে। বিবিধ মাথুর শেষে। মাধ্যপ্রেমে।

আপেল লাফিয়ে উঠে বলে-

মেদিনী বিদার দিউ, পঁশিয়া লুকাউঁ কেন্দ্রে। (আপেল, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৩৮)

ভাষা, শব্দ, ছন্দ, অলংকারকে নানা রং রূপে আর চিত্রকল্পের সমাহার তাঁর কাব্যশরীরকে দেয় এক স্বকীয়তা যেখানে তিনি এই মহাবিশ্বের সাথে এক বিন্দুতে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা :

বহু ব্যঞ্জনাস্তরিক এক ধরনের পার্থিবতার সার্কারামা রচেন তিনি যেখানে ঈশ্বর, মৃত্তিকা, কার্বন; নারী, হাঁস আর বুদ্ধ- ইত্যাকার প্রপঞ্চ দ্যোতিত হয়। (বেগম আকতার কামাল, মাসুদ খানের কাবিতা : বস্তু ও প্রাণপৈতির চক্রমণে জীবনপ্রপঞ্চ, *উলুখাগড়া*, পৃ. ১৩০)

এই প্রপঞ্চ মিলিয়ে সেখানে এক নান্দনিকতার সৃষ্টি হয়। বিরহ-মিলনের দুই হাতে দুই আদিম পাথরের মতো যেন কবি ধরে থাকেন তাঁর অস্তিত্ব সংরাগ যতো অনুভূতি নিচের চরণগুলো সেই নির্দেশনাই দিচ্ছে :

রাত্রিগ্রস্ত দুই ঈশ্বর মাদুরে ঝিমাতে থাকে

মাটির পাত্রে অস্থিপোড়ানো অঙ্গার, কার্বন

বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে এক নারী বৈতরণীর বাঁকে

ওই অবিনাশী পৃথিবীর মতো আইবুড়ো, কার বোন? (সার্কারামা, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৫১)

মাসুদ খান কবিতায় লোকপুরাণের কাহিনি তুলে ধরেছেন বিজ্ঞান চিন্তা চেতনায় যেখানে দেখা যায় চুলের ভেতর উৎপন্ন হওয়া ইলেকট্রন যেন উন্মাদিনী রাধিকার স্বরূপ। কবি এখানে কৃষ্ণপ্রেমে আকুল রাধার বিরহ দশায় বিপর্যস্ত অবস্থায় বর্ণনা করেছেন ভিন্নরূপে, যা শৈল্পিক :

১. ইলেকট্রনিক, কান্তা মুক্তবেণি, বেণি বাঁধতে বসেছিল তখন
সহসা কেন্দ্র ফুঁড়ে উড়ে আসে সুরের সৌরভ
আকুল শরীর তার বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ তার আউলাইলো বান্ধন।।

২. উনুন, তৈজসপত্র ...অরক্ষিত রেখে সব
বধূ ছুটে যেতে চায় বনকেন্দ্রে
আর অবলোহিত কুলমর্যাদা তার
টেনে ধরে রাখে বারবার। (পরমাণু, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৪৪)

প্রচণ্ড আবেগে কৃষ্ণপ্রেমে রাধা যেন তড়িৎ এর বেগে ছুটে যেতে চায় হাতের সব কাজ ফেলে কিন্তু সমাজ-পারিপার্শ্বিকতায় বাধাগ্রস্ত হয়। মাসুদ খান এখানে পৌরাণিক কাহিনি বিজ্ঞান মানসে নতুনরূপে উদ্ভাবন করেছেন যা পাঠে আনন্দ দান করে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মাসুদ খান বেশকিছু ছড়া ও রচনা করেন নতুনরূপে :

১. চক্ষু দুটি চড়কগাছে
ঘাড় গিয়েছে বেঁকে

একটু-আধটু রস পড়ছে

বকযন্ত্র থেকে। (ক্লাউন, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৪২)

২. পিতা ডাকে কাকাতুয়া,

খোকা ডাকে তাতাতুয়া, (প্রজাপতি, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৩৩)

আবার রূপকথার রাক্ষস-খোক্ষক ও রাজকুমার, দাসী, ক্রীতদাসী এসবই লোকায়ত জীবন রূপায়ণে গভীর দ্যোতনা সৃষ্টি করে কবি অতি স্বাভাবিক গতিতে তার কাব্য যাত্রার দিক নির্দেশক নাবিক :

১. পেঁপে গাছের নিচে ছয়রঙা রাক্ষস

ছয়বার হারাকিরি খেলে সন্ধ্যায়। (ধর্ম, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৪১)

২. চুয়ান্নজন দাসী আর উপদাসী

সবচেয়ে এই সুন্দরী তার কন্যা ও ক্রীতদাসী।

শ্যামল হৃদয়, দেহের খনিজ, পশমিসবুজ বেলুন।

(ক্রীতদাসী, পাখিতীর্থদিনে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৪৫)

ঐতিহ্য সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক কবি মাসুদ খান। তাঁর কাব্য জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রামবাংলার লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ। বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করে তিনি চিরায়ত লোকজ সংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবনের প্রচ্ছায়ায় কাব্যকুশলতার জায়গা করে দেন। কবিতার শব্দ প্রয়োগে তিনি নির্দিষ্ট ইজম ব্যবহার করেন নি। কাব্যের খাতিরেই যখন যেমন পেরেছেন তেমন শব্দ জুড়ে দিয়েছেন কবিতার শরীরে। তাঁর কাব্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল :

> বাংলার লোকজ ধারা, জ্যোতিবিশ্বনিষ্ঠ এবং স্বকীয় ঐতিহ্যের পটভূমিকে গুরুত্ব দিয়ে মাসুদ খান যে কাব্যভুবন নির্মাণ করেন এই ধীর কমলাপ্রবণ সন্ধ্যায় তা বাংলাদেশের কাব্য ইতিহাসে কতটা অবদান রাখতে পারবে তার চূড়ান্ত মূল্যায়ণ মূলত মহাকালের করতলগত। (মানিকুল ইসলাম, মাসুদ খানের কবিতা : বিষয় বৈভব ও প্রকরণনিষ্ঠা, *উলুখাগড়া*, পৃ. ১৭৬)

সেই সাথে এও বলা যায় যে তিনি পেয়েছেন নতুন কিছু ভাবার, শুধু ভাবেন নি, শব্দকুশলতা দেখিয়েছেন যেখানে এই মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকপুরাণ, মিথ, ঘর-বাহির, দেশ-বিদেশ সব এক সূত্রে গ্রন্থিত। এখানেই মাসুদ খান সার্থক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমিনুর রহমান সুলতান

আমিনুর রহমান সুলতান (জ. ১৯৬৪) এর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম : *জলের সিঁড়িতে পা* (১৯৮৭), *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না* (১৯৯০), *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী* (২০০০), *মৃন্ময় মুখোশ* (২০০৩), *পানসি যাবে না সাঁতার যাবে* (২০০৮), *একুশের আলো* (২০১০), *সাধুর কর* (২০১০) প্রভৃতি। একজন কবিকে চেনা যায়, জানা যায় তাঁর কবিতা পাঠ দিয়ে। তাঁর কবিতার জগতের কিছু কিছু বিষয় থাকে যেগুলোর একটি কেন্দ্র থাকে। আর তা থেকে কবির মানসকে বোঝা যায়, মানস গঠনের স্বরূপও উপলব্ধি করা যায়। আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতাপাঠে তাঁর মানস স্বরূপের ধারণাটিতে লোকায়ত এবং লোকভাবনার পরিপার্শ্ব স্পষ্ট। আশির দশকের এই কবি এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন। আমিনুর রহমান সুলতানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে 'আবহমান লোকসংস্কৃতির বিস্তার মননে, চিন্তায় ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে।' (আমিনুর রহমান সুলতান, কবিতাসংগ্রহ, ফ্ল্যাপ) হাওর-বাওর এবং জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিতির সঙ্গে লোকজীবনাচার এবং অসাম্প্রদায়িক জীবনযাপন একটি অঞ্চলকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে শেখায় যে অঞ্চলটিকে, সেটি হলো– বৃহত্তর ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহে জন্ম আমিনুর রহমান সুলতান এর। ফলে তাঁর মানসগঠনের সঙ্গে মিশে আছে লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারা। লোকসংস্কৃতির ভেতর থাকে রূপান্তর, স্থবির নয় বলেই এমনটি ঘটে। আমিনুর রহমান সুলতানের লোকজকবিতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ কারণেই স্বাভাবিকভাবে মানসগঠনের রূপান্তরটিও উঠে আসে।

লোকায়ত জীবনের ও লোকজীবন ধারার পরিপার্শ্বের সঙ্গে নৈসর্গিক প্রাচুর্য ও মানবিক প্রেমের ঐশ্বর্য খুবই গভীরভাবে স্পর্শ করেছে আমিনুর রহমান সুলতানের মানস গঠনে। তবে তাঁর মানসগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাগরিক ও শাহরিক জীবন যাপনের বন্ধুত্ব। আর এজন্যে তাঁর কবিতাকে কেবলই ঐতিহ্যের অনুসারী না বলে পুনর্নির্মাণ এবং নগর ও গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সমন্বয় হিসেবে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতাপাঠে লোকজসংস্কৃতির ও লোকায়ত জীবনের শেকড়ের খোঁজ পাওয়া যায়। শেকড় অন্বেষণে পরম্পরায় উপভাষার বৈচিত্র্য যেমন তাঁর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্যে দাঁড় করায় তেমনি বিষয় নির্বাচনেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত জনপদটি অন্যান্য অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিবেচনা থেকে সূক্ষ্মভাবে স্বতন্ত্র– এ কথা বলা চলে। আর তারই পরম্পরাকে আত্মস্ত করে নিজের কবিতার অবস্থানকে নান্দনিক আভিজাত্যে এবং লোককবিতার মানুষকে ভৌগোলিক প্রতিবেশের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে মাটিবর্তী করার কাব্যক্ষমতা

আমিনুর রহমান সুলতানের একাধিক কবিতায় প্রতিফলিত। আধুনিক কবিতার সঙ্গে লোকঐতিহ্যের কবিতার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে লোকালয়ের জনমানুষের জীবন অভিজ্ঞতা ও উপভাষার প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে– একথা সর্বজন বিদিত :

> আমিনুর রহমান সুলতান দীর্ঘদিন কবিতাচর্চা করেছেন; কবিতার পথে তার পরিক্রমণ পরিপক্ক অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। জলের সিঁড়িতে পা থেকে মৃন্ময় মুখোস (২০০৩) অবধি যাত্রাপথে কবি মূলত মাটি-মাতৃকা-স্বদেশকে প্রধান অন্বিষ্ট করেছেন। এক্ষেত্রে পৌণপুনিক তার কবিতায় আসে প্রত্ন-স্মৃতি, গ্রামীন আবহ, কৈশোর নস্টালজিয়ার আবেগ-আক্ষেপ আর স্মৃতিতাড়িত সত্তার গভীর মোহময় হৃতোচ্ছ্বাস। (শহীদ ইকবাল, আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতা : ঐতিহ্যের বাহনে সম্মুখগামী মননযাত্রা, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৩৫-১৩৬)

প্রেমের গভীরবোধ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কত প্রগাঢ় 'বারমাস্যা'গুলোর মধ্যে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। বারমাস্যাগুলো মূলত নারীর প্রাণের আকুতিতে ভরা। পাবার প্রত্যাশা। বিশেষ করে স্বামীকে। স্বামী গেছে বিদেশ বিভূঁইয়ে। স্বামী কবে আসবে, স্বামীর অনুপস্থিতে স্ত্রীর মনে যে শূন্যতা তাকে বারমাস্যার বিভিন্ন বর্ণনা দিয়ে পূরণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়। আমিনুর রহমান সুলতান 'বারমাস্যা' লিখেছেন। তবে এই বারমাস্যা তাঁর সমকালে বিষয়ের দিক থেকে কিছুটা রূপান্তর ঘটেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পরিবর্তে প্রেমিক-প্রেমিকার যুগলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এই ক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যভাষা উপভাষার হয়েও আধুনিক। কবিতাটি উপলব্ধির জন্যে হুবহু তুলে ধরা হলো :

> পুইল্যা ক্যাঁথায় রাইত কাটে না পৌষ মাইস্যা শীতে/মরণ জানি আইল ইবার পরান কাঁপে ভীতে।
> গরমকালে ঘামে শরীল ভিইজ্যা ডুগ্‌গুর হইছে/ভুলে-চুলেও গাছগাছালি বাতাস নাহি দিছে।
> আষাঢ়-ভাদ্রে একি দশা হইল দেখ কাল/উস্যিলাতে পঁইচ্যা গ্যাছে আমার ঘরের চাল।
> এমনি কইর‍্যা শরৎ গ্যাল গ্যালো বাকি মাস/আইবো কবে তোমার ওমে মিটাই মনের আশ।
> জীবনগাঙে পরান মাঝি কুহুকুহু তানে,/মনপবনের ডিঙায় চড়বো শত ঝড় তুফানে।
>
> (বারমাস্যা, *জলের সিঁড়িতে পা*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ২৪)

জীবনের অভিজ্ঞতার চেয়ে পরিপার্শ্বের অভিজ্ঞতা এই কবিতায় নতুন এবং অভিনব। 'পুইল্যা ক্যাঁথা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কাঁথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুবছর ব্যবহৃত হতে হতে তেলচিটের মতো হয়ে যায়। সাবান বা ক্ষারের অভাবে না ধোয়ার কারণে অনেকটা ময়লাযুক্ত। 'ভিইজ্যা ডুগ্‌গুর' মানে ঘামে শরীর ভিজে জুবুথুবু হয়ে যাওয়া। 'উস্যিলা' হচ্ছে কুয়াশা। আর উস্যিলার ব্যবহার এক্ষেত্রে নতুন। ঘরে খড়ের ছাউনির চাল অভাবের কারণে নতুন করে, দীর্ঘদিন খড় দিয়ে ছাউনি না দিলে খড় প্রতিবছরের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নরম হয়ে যায়। আর এক পর্যায়ে নরম খড়ের চালে কুয়াশা পড়লেও তা পচা মনে হয়। পুইল্যা যে কাঁথা সে কাঁথায় ওম থাকে না। তাই কবি প্রিয়তমার ওমকে ঘনিষ্ঠ করে পেতে চান এবং মনে আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ চান। অভাবের, অনটনের

জীবন– এই জীবনে বাধা এবং বিপত্তি আসবেই তারপরও প্রিয়ার সান্নিধ্য পেলে প্রিয়তমার কাছে বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারবে না। কবির উচ্চারণে তা স্পষ্ট, 'জীবনগাঙে পরান মাঝি', 'মনপবনের ডিঙায় চড়বো শত ঝড় তুফানে।'

লোকপুরাণের বিশেষ চরিত্রকে কল্পনায় নির্মাণের প্রয়াস মধ্যযুগ থেকেই সূচিত হয়েছিল। আধুনিককালে এসেও বেহুলার চলা যেনো স্রোতবাহী নদীর মতো। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বেহুলা যতো না পৌরাণিক তার চেয়ে অধিক লোকপুরাণের। বেহুলাকে কেন্দ্র করে মনসার ভাসান বা পদ্মপুরাণ জলের অঞ্চল হিসেবে ময়মনসিংহে হয়তো প্রভাব ফেলে থাকবে। আর সে প্রভাব আমিনুর রহমান সুলতানকে প্রভাবিত করে। আর বেহুলার যে কষ্ট ও সংগ্রাম এবং সংগ্রামের দীর্ঘপথে নিজেকে সাহসী করে তোলা, উত্তীর্ণ হয়ে ওঠা বাস্তবতার প্রতিকূল পরিবেশে তা বেহুলার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এছাড়াও আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকসংস্কৃতির মূল্যবান প্রতীকী চরিত্র হিসেবেও আমিনুর রহমান সুলতানকে তাড়িত করে। আর এ জন্যে তাঁর কবিতাতেও বেহুলা নতুন রূপে নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হয়।'বেহুলা বাসর নিয়ে জেগে থাকে রাত' কবিতাটি লোকপ্রেরণা থেকে লেখা তাঁর। কতটুকু মানবিক হলে, মানবীয় হলে নারী তার অবশ্যম্ভাবী নিয়তির কথা জেনেও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তার মিথিক্যাল উদাহরণ বেহুলা। সওদাগরের ঘরের বধূ হয়েও কীভাবে গ্রামীণ লোককথার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বেহুলা তার মহৎ প্রেরণা খুঁজে নিয়ে আমিনুর রহমান সুলতান কবিতায় উচ্চারণ করেন :

রাত জেগে থাকে বেহুলা বাসর নিয়ে
পায়ের কিনার ঘেঁষে শুয়ে থাকে মনসার কালনাগ
ঘুমের ভেতর ঘুম থাকে না আতঙ্ক ঘিরে ধরে
শরীর জুড়ে
হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ নির্বাক পড়ে থাকি
সাপের নিয়মে সাপ চলে যায় রাতের শেষে–
রাত ভেঙে সূর্য ওঠা মানেই সন্ধ্যায় পথ বেয়ে বেয়ে
আমার ঘরে রাতের জন্ম, রাত বাড়া, রাত জাগা
প্রতিরাত পায়ের কিনারে ঘেঁষে পড়ে থাকে মনসার কালনাগ
কালরাত্রি হয় না শেষ–
বেহুলাবাসর নিয়ে জেগে থাকে রাত।

(বেহুলাবাসর নিয়ে জেগে থাকে রাত, *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১৩৪)

আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতায় আছে লোকঐতিহ্য বা লোকসংস্কৃতির রূপান্তরের কথা। আধুনিক ফোকলোর চর্চায় রূপান্তরকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। আমিনুর রহমান সুলতানের

মানসগঠনে গ্রামীণ জীবন ও লোকজ নানান উপাদান সহজাতভাবে ভূমিকা পালন করেছে। আবার যখন তিনি বেড়ে উঠেছেন রাজনৈতিক সমাজবাস্তবতায়, স্বৈরাচারী শাসকের সময়ের শাসনের মধ্য দিয়ে তখন রাজনৈতিক প্রভাবও তাঁর মানসকে বিকশিত করেছে। মনসার সাপ নতুন প্রতীক হিসেবে রাজনৈতিক ছত্রছায়ার বিম্বিত হয়েছে, চাঁদ সদাগর নতুন বিদ্রোহের প্রতীক হয়েছে স্বৈরাচারী শাসক ও সময়ের বিরুদ্ধে। আবার বেহুলাকে নতুন রূপে দেখা যায় যেখানে চির দুঃখী বাংলাদেশকেই খুঁজে পাওয়া যায়। লোকঐতিহ্যকে ধারণ করে সংকটের বাংলাদেশ, অসুস্থ রাজনৈতিক সময়ে লোকপুরাণের চরিত্রের ভিতর দিয়ে যে পুনর্নির্মাণ তা আমিনুর রহমান সুলতান তাঁর 'নয়া মনসার সাপ' কবিতায় মূর্ত করেছেন :

১. শাদা শাদা জল নামবে কোথা থেকে/কোথা থেকে স্বপ্নময়ী শান্তিরা গড়াবে
গোলাপের গায়ে গায়ে!

২. খোয়ানো জলেরা নামে না মাটিতে
ওড়ে ওড়ে যায় আকাশে আকাশে/দংশিত বৃষ্টির পাশে
স্বপ্নের শান্তিরা বেহুলা সুন্দরী যেন/বসে বসে কাঁদে।

৩. গোলাপ গোলাপেই চাঁদবেনে সে/একটা একটা ঝরাবে পাপড়ির সুখ
নতজানু তবু নয় পাথর-সময়ে/নয় পূজারী চিতার আকাশের কালোগ্রাসে।

(নয়া মনসার সাপ, *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৪৬)

নাগরিক জীবনের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। নাগরিক জীবনে বসবাসকারী কবির কাছে গ্রামীণ সংস্কৃতি বিস্মৃত হবারও না। লোকসংস্কৃতি, লোকজীবন এবং কবিতার চমৎকার যুগলবন্দিতে মায়ালোক রচনা করেন কবি আমিনুর রহমান সুলতান। ব্যস্ত নাগরিক জীবনের বাইরে প্রকৃতিকে তাঁর শিল্পে অকপটে নিয়ে এসেছেন। গ্রামীণ জনপদের ছড়িয়ে থাকা লোকচিত্র, লোককলা, লোকমোটিফকে তিনি আবেগ তাড়িত হয়ে নয়, মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই কবিতায় নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।

এজন্য বিষয় নাগরিক হলেও আঙ্গিকে ধারণ করেছেন লোকগোষ্ঠীর, লোকজনপদের বিস্তৃত জগত। নাগরিক কোলাহলে, নাগরিক পথচলায় সৌন্দর্যের দুর্লভ অনুভূতি প্রকাশে আবহমান বাংলার মাটির স্পর্শ যে কত সস্থির ও নির্ভরতার তার প্রকাশে কবি ঐতিহ্যকেই ব্যবহার করেছেন। গ্রামীণ জনপদের অতুলনীয় রূপের স্পর্শ আমরা অনায়াসে পাই। 'বেইলী রোডে বৃষ্টি ছিল' কবিতা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায় :

নুড়িপাথরের চাপা মাটির চোখ অন্ধ সে নয়
পীচঢালা রাজপথে গলে গলে তোমার চোখের জল

ছুঁয়েছে মাটির চোখ।

কে রোধে বৃষ্টির জল মাটিতে গড়ালে!

(বেইলী রোডে বৃষ্টি ছিল, *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১০২)

তবে তাঁর অধিকাংশ কবিতা গ্রামীণ জনপদের এবং জীবন ও সংস্কৃতির অপূর্ব সে সৌন্দর্যমূর্তি এবং চিত্রকল্প। সৃষ্টির এবং প্রজন্মের সম্ভাবনাকে ঐতিহ্যের প্রতীকে ও রূপকে কীভাবে জড়িয়ে শিল্পরূপ দেওয়া যায় তার যথার্থ উদাহরণ 'অন্যন্যাকে দেখতে যাবো' কবিতা :

অনন্যাকে দেখতে যাবো ঐ পারেতে
নদীর ঘাটে জলের উপর ভাসিয়ে ডিঙি
চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্না রাতে গভীররাতে।
ডিঙি রেখে তারপরেতে নগ্ন পায়ে হেঁটে হেঁটে
শহর ছেড়ে গাঁয়ের পথে আল ধরে পথ যাব নেচে।

(অন্যন্যাকে দেখতে যাবে, *জলের সিঁড়িতে পা*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৩১)

ঐতিহ্যের এবং প্রকৃতির বৃক্ষের, ফুলের, বীজের ব্যবহার আমিনুর রহমান সুলতান এমনভাবে তাঁর কবিতায় করেন যেখানে চিত্রকল্প বিষয়ের অভিনবত্বে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। পুরনো পাথর এবং শিমুল তুলো– এই দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে অথচ কবিতায় আমিনুর রহমান সুলতান যখন প্রয়োগ করেন তখন উভয়কে গৌরবময় মনে করেন। 'বেঁচে আছি সংশয়ে' কবিতাটির বিশেষ অংশ সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। যেমন :

১. দ্বিধা আছে বলেই এখনো বেঁচে আছি/প্রমাণ সমেত।
২. সমস্ত বিভ্রম কেটে গেলে আসলে তুমিও তাই
আত্মঘাতী আদিম পাথর/ভালবাসা তখন সন্ন্যাসী স্মৃতি
ওড়ে শিমুল তুলোর মতো অস্তিত্ব তোমার/বোহেমিয়ান বাতাস যেন।

(বেঁচে আছি সংশয়ে, *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৬৭)

পুথিগত বিদ্যার বাইরে প্রকৃতির কোল থেকে শিক্ষা নেওয়া কবি জীবনের আনন্দকে উপভোগ করতে চেয়েছেন। 'স্মৃতির অসুখ' কবিতাটি এখানে উল্লেখযোগ্য :

পেছনে তাকালে–স্মৃতির অসুখ/লতাগুল্মো ছেয়ে যাওয়া বৃক্ষের মতো– জড়িয়ে ধরে।
নিগ্‌লা মাছের সালুন কিংবা গোয়াল ঘরে কান্নায়/কলাপাতায় ক্ষীরের স্বাদ– আহা কী যে স্বাদ
ভাবনাহীন সময় বুঝেনি তখন; (স্মৃতির অসুখ, *জলের সিঁড়িতে পা*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৩২)

কলাপাতায় ক্ষীরের স্বাদ প্রসঙ্গটি লোকাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। লোকাচার ও লোকবিশ্বাস লোকঐতিহ্যের অন্যতম উপকরণ। 'হিরালী ও মেঘের লুকোচুরি' কবিতাটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একটি ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী হিরালী। হাওরে ধান যখন পেকে উঠত তখনই কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে শিলপাথর পড়ে ফসলি জমি নষ্ট করতো। আর ফসল যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য হিরালীরা

মন্ত্রপাঠ করে শিল-পাথরগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিতো। শুধু তাই নয়, মেঘের তুষ্টিতে ব্যাঙ বিয়ের যে লোকাচার তারও আয়োজন করা হতো। বিষয়টি শৈল্পিকভাবে কবি আমিনুর রহমান সুলতান উঠিয়ে এনেছেন। কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো :

অনাবৃষ্টি দেখে দেখে হিরালীর দীক্ষায় সে/মন্ত্রপাঠে বিভোর নেমেছে হাওরে
রমরমা ব্যাঙের বিয়ে থেকে শুরু করে/সব কিছু আয়োজন সম্পন্ন রেখেছে মেঘের তুষ্টিতে

(হিরালী ও মেঘের লুকোচুরি, *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৯৮)

লোকবিশ্বাসও তাঁর কবিতার বিষয়কে আপন সত্তার সঙ্গে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। 'ছায়া' কবিতার বিশেষ অংশ উল্লেখযোগ্য :

দেখব আমি পিতার স্বদেশ
বাম পাঁজরের হাড় থেকে জন্ম নেয়া
আমার প্রথম প্রেমিকার মায়াময় প্রতিভাস।

(ছায়া, *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৫৫)

লোকাচার, লোকবিশ্বাস এসব জীবন অভিজ্ঞতায় নতুনভাবে উঠে আসে আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতায়। এছাড়াও লোকচিকিৎসা কিংবা লোকপ্রবাদ এসবও বাদ যায়নি। আর এসব যে তাঁর ঐহিত্যগত চেতনাবোধ থেকে উচ্চারিত তা অনায়াসে বলা যায়। 'ভাঙা কুলা' কবিতাটি লোকপ্রবাদ থেকে সরাসরি নেওয়া, কিন্তু কবিতায় মানবচৈতন্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে নতুন উপলব্ধিতে। কবিতাটির বিশেষ একটি অংশ তুলে ধরা হলো :

১. উঠিয়ে নেয়ার নামটি নেই পড়ে আছি গোবর গাদায়,/পরিত্যক্ত অনাবাদী ভাঙাচোড়া কুলা।
২. ও ঝড়ো বাতাস, ও বাতাস বাইকুড়নি বাতাস/কাঁপনে কাঁপন তোলে
অদল বদল হতে দাও যাপিত জীবন/ও বাড়ির মানুষগুলো যতই ভাবুক আমি
ভেঙে গেছি পঁচে গেছি/বাঁশের তৈরির প্রতিটি হাড়েই ধরেছে পচন
আমি বলি এখনও সতেজ আছি পুরনো হলেও।

(ভাঙাকুলা, *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৫২)

যার কেবলই গ্রাম আছে, আছে গ্রামীণ জীবন তার আবার ফেরা কিসের। ফিরে যায় যারা তারা নাগরিক মানুষ। কৈশোরে রেখে আসা সময়টায় আবার ফিরে যেতে চান তিনি। আমিনুর রহমান সুলতানও ফিরেছেন তাঁর কবিতায় পরিভ্রমণ করে। 'নদী খুঁজতে খুঁজতে' কবিতাটি এখানে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হলো :

১. জলের ভেতর মেঘ দেখে দুরন্ত বালক আমি
২. মায়ের আঁচল থেকে নিজেকে খসিয়ে
শৈশবে একবার নদী খুঁজতে খুঁজতে দাঁড়িয়ে ছিলাম
নদীর কিনার ঘেঁষে কাঁচামাটিয়ার কাদাজলে
৩. নদী খুঁজি খুঁজতে খুঁজতে/নিজেকে হারাই বুড়িগঙ্গার কোমল জলে
এইখানে খুঁজে ফিরি হারানো শৈশব/এইখানে ডুবে ডুবে কান পেতে থাকি

নদীর জলের স্পর্শে কখন খইফোটা বৃষ্টির বর্ষণ হবে?

(নদী খুঁজতে খুঁজতে, *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১০৪)

আমিনুর রহমান সুলতান লোকঐতিহ্যকে বিষয় করার পাশাপাশি আঙ্গিক নির্মাণে ঐতিহ্যগত যে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন তা থেকে কবি স্বভাবের সঙ্গে সামাজিক, প্রাকৃতিক পটভূমিকেও খুঁজে পাওয়া যায় এবং সে সব চিত্রকল্প নতুনভাবে অন্বেষণে আগ্রহী করে তোলে। কয়েকটি চিত্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

১. জলের সিঁড়েতে পা রাখতে আমার বড় ভয় হয়

২. শ্যাওলার সিঁড়িতে পা রাখতে আমার বড় ভয় হয়
অথচ তৃষ্ণা সংবরা মাছ
সময়-অসময়ে কাছে ডাকে।

(জলের সিঁড়িতে পা, *জলের সিঁড়িতে পা*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১৫)

৩. এই হাতে উঠে আসে শিকারি কোঁচ; মহানন্দায়
ব্রহ্মপুত্রে-কাঁচামাটিয়ার কাদাজলে–

(কোন্ জলের জলসুন্দরী, *জলের সিঁড়িতে পা*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১৮)

৪. খর-লাঙ্গলের জোয়াল মানুষ কাঁধে নিয়ে
অসময়ে নিরন্তর কার পানে ছুটে চলে!

(বার্ধক্যে, *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৬৮)

৫. রাত্রির পিপাসা নিয়ে ব্যাকুল বাউল
ক্লান্তিহীন হেঁটে গেছি ঝাউতলায়।
নিবিড় পাড়ায় নেমেছে এখন জটিল আঁধার।

(নিবিড় পাড়ায় যাব বলে, *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৮৩)

৬. কখনো মেঘের শাড়ি থেকে ঝুরঝুর/খসে পড়ছে বৃষ্টিদানা

(মেঘের শাড়ি ও বৃষ্টিদানা, *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৯৯)

৭. মাটি তার কতটুকু বোঝে
বৃষ্টি তার রেখে যায় জলেরই সান্নিধ্য!

(বৈরী মেঘের বৃষ্টিতে, *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী*, কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১০৫)

ঐতিহ্যগত জীবন, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির ভেতর কবিতার বিপুল সম্ভাবনাকে আমিনুর রহমান সুলতান নানা বোধে শিল্পময় করে ঐতিহ্য অন্বেষণের নতুন ভূমি নির্মাণ করেছেন। একসময় ভাবা হতো, ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি বা লোকঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু আশির দশকের কবি আমিনুর রহমান সুলতানের রচিত কাব্যে উপলব্ধির জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং দেখিয়েছেন লোকঐতিহ্য কেবল গ্রামীণ নয় শাহরিকও বটে। নগরেও এর সম্প্রসারণ ঘটছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

বাংলা সাহিত্যের আশির দশকের শক্তিমান কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ (জ. ১৯৬৫), যিনি তাঁর কবিতাকে ভরিয়ে তুলেছেন পৌরাণিক কাহিনি, গ্রিক মিথ ও লোকঐতিহ্যের সমন্বয়ে। নান্দনিকতায় ভরপুর তাঁর কবিতা। বিষয়-বৈচিত্র্যের নানারূপের মিথস্ক্রিয়ায় সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সিদ্ধহস্ত। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম: *অন্তউড়ি* (১৯৮৯) [আধুনিক বাংলা পদ্য-রূপান্তরে চর্যাপদ], *তনুমধ্যা* (১৯৯০) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এরপর ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়: *পুলিপোলাও* (২০০৩), *কবিতাসংগ্রহ* (২০০৬), *দিগম্বর চম্পূ* (২০০৬), *গর্দিশে চশমে সিয়া* (২০০৮), *মর্নিং গ্লোরি* (২০১০), *ভেরোনিকার রুমাল* (২০১১), *হাওয়া-হরিণের চাঁদমারি* (২০১১), *আমাকে ধারণ করো অগ্নিপুচ্ছ মেঘ* (২০১২) প্রভৃতি।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ তাঁর সমসময় থেকে ভিন্ন পথে হেঁটেছেন এবং সেই কারণে আলাদা হতে পেরেছে যার পেছনে ছিল তাঁর কবিতার দেহের ভাষা, ছন্দ, অলংকার, উৎপ্রেক্ষা-উপমা, কাহিনি-বিন্যাস, সমসাময়িক ঘটনার অত্যাধুনিক রূপ। মোট কথা, প্রকরণে তিনি এক নতুন পথের সন্ধান করেছেন যেমনি, তেমনভাবে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে যোগ করেছেন এক মণিমাণিক্যপূর্ণ রত্নভাণ্ডার। তাঁর এই ভিন্নপথে হাঁটা অর্থাৎ পালের গাদার সাথে না মিশে নিজস্ব একটি পথের পথিক হয়েও নতুনকে সাদরে গ্রহণ করার জন্যই তিনি বিগত দশক শুধু নয় তাঁর সমসাময়িক দশকগুলো থেকে তাঁর কবিতাকে একটি স্বতন্ত্রের কোটায় দাঁড় করাতে পেরেছেন। এখানেই তিনি কবি হিসেবে স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত ও সার্থক। শুধু তাই নয়, আরো গভীর বিশ্লেষণে উঠে আসে:

> অনতিক্রম্যতা কোনো বাসনা নয়, কবিতার আটপৌরে চেহারায় কিঞ্চিৎ চিড় ধরিয়ে দেয়া আর কি। হেঁয়ালি আছে। ঋজুতা বর্জনীয় জ্ঞাতসারেই। শব্দের গাঁথুনি ঐতিহ্যিক, প্রথানুগত নয়। বাংলা কবিতার প্রচল ধারার শব্দচয়নকে তিনি বিনয়ের সঙ্গে না বলেছেন। পাললিক নম্রতা নেই বললেই চলে (আল মাকসুদ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা : দৈশিক ভাবনার প্রতিধ্বনি, *লোক*, পৃ. ১৪৬)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে ঐতিহ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর কাব্যকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। সারাবিশ্ব থেকে মনিমুক্তা কুড়িয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে কবিতায় উচ্চ পর্যায়ের ক্লাসিক শিল্পের পরিচয় ঘটিয়েছেন; যেখানে আনন্দ, বেদনা, একাকিত্ব, মিথ, লোককাহিনি, গ্রামীণ লোকপুরাণ, লোকাচার, প্রতিদিনের চলাফেরা, স্মৃতিরোমন্থন- সব একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, নান্দনিক।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের একটি বিশেষ দিক হলো তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায়শ প্রচলিত ছন্দকে ভেঙে নিজের মতো করে নতুন আঙ্গিকে রূপ দিয়েছেন, যা একজন দক্ষ শিল্পীর কারুকার্য। সেই সাথে আরো বলা যায় :

> ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিষম শব্দবোধ, সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়ানো দুই প্রকাশনা, প্রাচীন ও অর্বাচীনের নিয়ত অসমঝোতাকে তিনি মিলিয়ে দিতে পারেন ঝড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার মত করে আশ্চর্য এক কলা-কুশলতায়। যে কোনো বিপ্রতীপকেই তিনি যেন মিশিয়ে দিতে পারেন এক মোহনায়। আর যারা স্বভাবতই মিলন প্রয়াসী তাদেরও সাত ঘটের জল খাইয়ে ভিড়িয়ে নিতে পারেন কোন ভিন-আঘাটায়। (তামিম ইয়ামীন, সুব্রতর্পণ, *লোক*, পৃ.৭৩)

অর্থাৎ, এতসব থেকে বোঝা যায় তাঁর মানসপ্রবণতা কবিতা বিষয়ে কতটুকু প্রজ্বলিত। তিনি শব্দ নিয়ে খেলতে ভালোবাসেন, একটি শব্দকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে তৈরি করেন তাঁর শব্দ ভাণ্ডার। শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে কবি বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকেও সমান নজর দেন। তাঁর কবিতার মধ্যে অলৌকিক বিষয় উপেক্ষা করে বাস্তব ঘটনা সমৃদ্ধ বিষয়ই বিশেষ প্রাধান্য পায়।

প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ ভাবনা, জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ নানাভাবে বিদেশি শব্দ কবিতায় অহরহ উপস্থাপন, খাঁটি বাংলা শব্দের প্রতি নিরেট ভালোবাসা, ঐতিহ্যবোধ, ইতিহাস, পুরাণ উপাখ্যান ইত্যাদি থেকে তাঁর স্বদেশপ্রেমের বা স্বদেশের প্রতি একনিষ্ঠতা প্রতিবিম্বিত:

> স্বদেশবন্ধুর কথা মনে পড়ে খুব:/যখনই সন্ধ্যার মুখে অলৌকিক 'সার্ক্যুলার কী'-তে
> ভয়াল সঙ্গীত বাজে চীনা সারেঙ্গিতে,/কেঁপে ওঠে জীবনের অভ্রংলিহ তুচ্ছতার স্তূপ–
> অগণ্য হার্লেকুইন চতুর্দিকে, মাঝে এক নগণ্য ক্লাউন/তার স্বরে ডুক্‌রে উঠি–
>
> (পুলিপোলাও, ৯, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০৩)

কবির অন্তরাত্মা 'নগণ্য ক্লাউন'-এর স্বরে ডুকরে ওঠে আর পাঠকের হৃদয় ডুকরে ওঠে প্রিয় কবির স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ডে। মা, মাটি দেশের প্রতি এর চেয়ে ভালোবাসার নিদর্শন আর কোথায় পাওয়া যাবে। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা পড়তে গেলে তাঁর সমসাময়িক পাঠক বা সাধারণ পাঠক হোঁচট খেতে পারেন। কারণ, তাঁর কবিতা হাটে, মাঠে, ঘাটের নয় যেমন, তেমনি নয় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবে এই কবির কবিতা পড়তে গেলেই শুধু নয়, বুঝতে হলে, অর্ন্তনিহিত ভাবটি অন্তরে গাঁথতে হলে অবশ্যই কবিতা সম্পর্কে, কবিতার গভীরতা সম্বন্ধে কিছুটা হলেও জানাশোনা থাকতে হবে। সেই সাথে বিশ্বসাহিত্যের সাথেও থাকতে হবে আন্তরিকতা, অন্যথায় হোঁচট খাওয়াটা বিচিত্র নয়। কারণ, সুব্রত অগাস্টিনের কবিতায় রয়েছে প্রচুর রেফারেন্স, যা তিনি মহাসমন্বয়কের মতো করে তাঁর কবিতার দেহে মিলিয়ে দিয়েছেন কষ্টিপাথরের মতো নিপুণকর্মে।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ আধুনিকতার এক নতুন দিক্-নির্দেশনা দেখিয়েছেন; সেই পথ নতুন, চ্যালেঞ্জ আছে, আছে নতুন কিছু আহরণের, আবিষ্কারের এক নিখুঁত গভীর প্রশান্তি ও রোমাঞ্চকর অনুভূতি। অন্যদিকে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজও আত্মপরিচয় সংকটে ভুগেছেন তাঁর বিগত অন্য কবিদের মতোই যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'পুলিপোলাও' কাব্যগ্রন্থের ৪৪ নং কবিতায় :

> কোথায় আমার ঘর? কে-ই বা আপন? কে বা পর?/মোছলমানের দেশে জন্ম মম নাছারার কুলে!
> অবস্থা এমন, হায়, প্রায়শঃ কাপড়-জামা খুলে/পরীক্ষা করিয়া দ্যাখে কেমন নাগর।
>
> (পুলিপোলাও, ৪৪, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১১৫)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কাব্যগুণ বিচার প্রসঙ্গে তাঁরই সমসাময়িক অন্য একজন কবি বলেছেন :

> বৈচিত্র্যের সমারোহে পূর্ণ তাঁর কবিতা ও গদ্য ওঙ্কারে, ঝঙ্কারে, রীতিরাত্মায়, ভাবে ও ভাষায়, রূপে ও শৈলীতে। তাঁর আধার যেমন বহু বিচিত্র, আধেয়ও তেমনি। (মাসুদ খান, সালোক-সংশ্লেষণের কুশলী কলাকার, *লোক*, পৃ. ১২৮)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতায় মিশে রয়েছে নানা স্বাদ- তবে সেই স্বাদ আহরণের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত রসনা। আর তাঁর কবিতার রংধনুর নানা বর্ণের প্রধান উপকরণ তাঁর প্রচলিত অকৃত্রিম স্বতন্ত্র ভাষাগঠন। কবি প্রতিদিনের বেড়ে ওঠার ভেতর দিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করতেন, যে ভাষায় তিনি একান্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতেন, সেই ভাষাকে অবিকল অকৃত্রিমভাবে তুলে ধরলেন তাঁর কবিতাতে, যার ফলে তিনি তৈরি করে ফেললেন নতুন পথ ও নতুন স্বর ও স্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ, তাঁর কবিতা পড়লেই বুঝতে পারা যায় এটি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা :

> সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর সেই স্থানিক ভাষার সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলিকে, গড়ে তুলেছেন তাঁর স্বকীয় ভাষারীতি, নিজস্ব ভাষা ভুবন। সে-ভুবনের বাতাবরণ কখনো কঠিন, কড়া ও ঝাঁজালো, কখনো কোমল, সরস, সুরেলা। সে-ভুবনের আবহাওয়ায় কখনো উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস, কখনো মেঘলা বিষণ্নতা। পলিবহুল তাঁর স্রোতস্বী, তাই হয়ত তা ঘোলাটে কখনো-কখনো, তবে গভীর সুনাব্য। তাঁর অর্চার্ডে ফলে নানা রঙের, নানা জাতের ফল-মসৃণত্বকা, কঠিনাবরণ, রোমশ ...। সব ফল যে মিষ্ট ও মুখরোচক, তা নয়, তবে পুষ্টি প্রসঙ্গে তারা অনুপম। (মাসুদ খান, সালোক-সংশ্লেষণের কুশলী কলাকার, *লোক*, পৃ. ১২৮-১২৯)

কথ্য ভাষার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যে যা কিনা বিগত দশকের কাব্যবিচারে নতুন মোড়। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ যে-সব কথ্য ভাষা তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন তার কিছু উদাহরণ: শ্যালক, পইড়ে দ্যাখ, সোন্দর, আইজকা, দ্যাহো দেহি, শালা, মোর লগে, আওয়া, আইফোনের চৌদ্দগুষ্টি মারি, আইফোন মারাচ্ছে শালা। অর্থাৎ, কথ্য ভাষার অপার সম্ভাবনাকে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ এগিয়ে দিয়েছেন আরো এক ধাপ। বলা যায় :

> রোমান্টিক যুগের ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ মানুষের মুখের ভাষাকে কবিতায় ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সেই সম্ভাবনাকেই তাঁর কবিতায় যাচাই করেছেন। (কাজী নাসির মামুন, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা : অভ্যস্ত শিল্পীর জাদু দিয়েছে ওদের দেহে প্রাণ, *লোক*, পৃ. ৫৮)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিমানস বহুদিকে ধাবমান। অন্যদিকে তাঁর কবিতার ভেতর এমন কিছু হাস্যরস রয়েছে যা পড়লে খুব হালকা হাসিতামাশা মনে হলেও তাঁর কবিতার অর্ন্তনিহিত বা গূঢ় ভাবটি লুকিয়ে থাকে-আর কবি হিসেবে এখানেই তিনি সার্থক। ভাষা, ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক-উৎপেক্ষা মোট কথা বলতে গেলে যেমন প্রকরণ তেমনি কাহিনী-বিন্যাস, ঘটনার নির্ঘটন, গীতিকবির সুরেলা আলাপন যেন সুমিষ্ট আবেশিত আবার কখনো ঘোর কেটে গেলে বাস্তবতায় পর্যবসিত- এই সব মিলিয়েই আশির দশকের কবি অর্থাৎ সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতার পরতে পরতে ভরে আছে গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ, পৌরাণিক কাহিনি, মিথ, যা ঐতিহ্য নির্ভর। ঐতিহ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি অত্যন্ত পরিশীলিতভাবে তাঁর গ্রামীণ ও লোকজ চেতনা নানা বর্ণে বর্ণিল করে সাজিয়েছেন যা শ্রুতিমধুর ও সেই সাথে বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ রত্নভাণ্ডার। ঐতিহ্যনির্ভর কবি কখনোই নিজস্ব ঐতিহ্যকে পার্শ্বে ফেলে চলেননি বরং তিনি গ্রামবাংলার লোকাচার, সংস্কতি, পুরাণ সব কিছুকে মূল করে তাঁর কবিতা দেহকে পুনর্নির্মাণ করেছেন তাই তাঁর কবিতা ঐতিহ্যনির্ভর, আধুনিক।

জীবনবাদী কবি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর ধ্যানধারণা এবং গ্রামীণ ও লোকজ মিথ, পুরাণ, ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবহার ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী। সমকালীন ও সমগোত্রীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে তিনি বরাবরই একটু অন্য ধাঁচের ফলে তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। তাঁর কবিতার পাঠ মনকে দেয় বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস নেয়ার আরাম। একান্ত সতেজ, সরল ও প্রাণবন্ত তাঁর কবিতা সেখানে আয়োজন চলে অনেক কিছুর, আয়োজনটাও জমজমাট :

> তিনি সম্ভবত চাইলেন বাংলা কবিতাকে ফিরিয়ে দিতে তার সুর ছন্দ চিন্তার আঁতুড়ঘর। বিশ্বসাহিত্যের চিন্তা, দর্শন, নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল গুণী এই কবি পূর্বের চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের সময়ের হালফিল বাস্তবতা পর্যন্ত উপাদান সংগ্রহ করে এক মহাসমন্বয় সাধনে নিজেকে ব্রতী করলেন। চিন্তায়, প্রকরণে, শৈলীতে নিজের হাতকে পাকিয়ে তুললেন ওস্তাদ সঙ্গীতকারের মতন। বাংলা ছন্দ তো বটেই, তাঁর চর্চার ভেতর আমরা দেখতে পাই সত্যেন্দ্রনাথের সেই হারাধনের ছেলে সংস্কৃত ছন্দের রূপটিকে। (হিজল জোবায়ের, ঐতিহাসিক, *লোক*, পৃ. ৮০)

সুব্রত অগাস্টিনের কবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্র, ভিন্ন স্বাদ, যা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত এবং বহুদিকে ধাবমান, তাই তাঁর কবিতা বর্ণিল। ঐতিহ্যে ভরপুর তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'তনুমধ্যা'র (১৯৯০) প্রথম

কবিতাতেই তা ধরা পড়ে। তামাদি-র প্রথম সর্গের শুরুতেই অসম্ভব সুন্দর নাটকীয় উপস্থাপন যেখানে আকৃষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নাই যেমন :

১. ঘাসেদের সর্বনাশ ঘটে গেছে তরশুরও আগে।
পদ্মার শরীরে থান কতো-যুগ কে রাখে হিসাব?
কাঁঠালছায়ায় এক লুকানো কুটির আর কুটিরে লুকানো
সোনাবউ, আর তার দেড়গজী ঘোমটায় লুকানো হরিণ–

২. এতকাল নদীকূলে চাঁদ সদাগর
যাহা লয়ে ছিলো ভুলে সকলই সে দিলো তুলে/ত্রিকাল ভেলায়–
এই ভেলা থামবে না থামবে না আর/ভেসে যায় ভেসে যায় ডালিমকুমার

৩. সেই আমি– খেলারাম, জমিদার, কেউ নয়, সেই
অস্পৃশ্য অদৃশ্য আমি নদীটাকে করেছি সাবাড়! (তামাদি, প্রথমসর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ১-৩)

মনুষ্যসৃষ্ট আধুনিকতার জন্য প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটেছে, যা কবি দেখিয়েছেন পদ্মা নদীকে বিধাব-রূপকের মাধ্যমে। সবুজ ঘাসও বিবর্ণ, এরই সাথে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছেন পৌরাণিক চরিত্র, চাঁদ সদাগর, রূপকথার ডালিমকুমার– যে মহাকালের ভেলায় ভেসে চলেছে ঠিক 'সোনার তরী'র মতো। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ এই চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে নিজেকেই যেন উপস্থাপন করেছেন তাই :

> ডালিমকুমারের সঙ্গে বর্তমান নায়কের সম্পর্কের গভীরতাকে উন্মোচনের প্রয়াস চালান, তবে সেটা বিনির্মাণ-তত্ত্বের আলোকে। আধুনিক যান্ত্রিকতায় ডালিমকুমারের প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়। (মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, পৃ. ২৯১)

এখানে দেখা যাচ্ছে এই ডালিমকুমার চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন 'কলাকোপা'য় মায়ের ছেলে 'দাতা খেলারাম' যে কিনা অত্যাচারী জমিদারের প্রতীক, যে দখল করে থাকে 'ইছামতি নদীভরা গান' এবং 'নদীভরা ধান', সেই সাথে 'ধানের বাইচ'। এই নায়কের মধ্য দিয়ে যে দাতা খেলারাম, তার খল নায়কের রূপ, স্পষ্ট চিনিয়ে দিতে পারেন কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ। তিনি এই অত্যাচারী ভুইফোঁড় জমিদারের মধ্য দিয়ে বর্তমান একনায়কতন্ত্রের চরিত্র দেখিয়েছেন। সেই সাথে তাঁর গ্রামীণ ও লোকজ চেতনা সুস্পষ্ট, ফলে তিনি কবিতার ভেতর নিয়ে এসেছেন গ্রামীণ ও লোকজ নানা বিষয়, মিথ, রূপকথা যেমন- ইছামতি নদী, ধান, ধানের বাইচ, সোনা বউ, ভেলা, চাঁদ সদাগর, ডালিমকুমার অর্থাৎ গ্রামীণ ও পৌরাণিকতার চমৎকার মিশ্রণ যা শ্রুতিমধুর- নান্দনিক। একই কবিতার দ্বিতীয় সর্গে তিনি গ্রামবাংলার অতি আদুরে পাখি 'বউ কথা কউ'-এর অতি পরিচিত ডাক ও 'দুধের পোয়াতি গাই' -এর উপমা এনে ঐশ্বর্য নির্ভর সমৃদ্ধ গ্রামবাংলার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন :

> বউ কথা কও বলে বউ কথা কও/নিরানো নরম মাটি শরমে অধীর

মরমে বধির/বউ কথা কও

বউ কথা কও/করো কবুলান

দুধেল পোয়াতি গাই/চক ভরা ধান

উলুলুলুলুলুলুলুলু। (তামাদি, দ্বিতীয় সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ৫)

স্পষ্টতই দেখা যায় সুব্রত অগাস্টিন তাঁর গ্রামবাংলার সমৃদ্ধি নিয়ে গর্বিত। তিনি ভুলে যান নাই বাংলার ঐশ্বর্যের বিশাল ভাণ্ডারকে, যা খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে তাঁর কবিতায় সেই সময়ের ধনে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধি বাংলাদেশের গ্রামবাংলার চিত্রপট। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতায় গ্রামীণ অনুষঙ্গের সঙ্গে লোকজ দিকটিও আলোচনার দাবিদার। তাঁর কবিতার ভেতর পাওয়া যায় গ্রামীণ-লোকজ নানা আচার, রীতিনীতি যেমন: 'মাছের পেটি' 'শীতল পাটি' এই দু'টি শব্দ দিয়েই বোঝা যায় গ্রামবাংলার মানুষ অতিথি আপ্যায়নে নজিরবিহীন। বাড়িতে অতিথি এলে তাকে শীতল পাটি বিছিয়ে বসতে দেয়া লোকাচার আর অনুষঙ্গ হিসেবে আসে বড় মাছের পেটিটা মেহমানের পাতে তুলে দেয়ার রীতি :

চিতল মাছের পেটি / ঠাণ্ডা শীতল পাটি

ধলি বিলের ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। (তামাদি, তৃতীয় সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ১২)

আবার শৈশবের সংস্কারগুলোর উদাহরণ পাওয়া যায় নবম সর্গের কিছু লাইনে। বাল্যকালে ভাত মাখিয়ে নলা নলা করে ভাগ করে সেগুলিকে বিভিন্ন জনের ভাগ বলে ছোট সোনামণিকে ভুলিয়ে খাওয়ানোর রীতিটিও চমৎকার :

বড় মা খারাপ কথা-কইওনা, কও, ও মানিক, / এই নে চান্দের নলা, এইড্যা সূয্যির, জাদু, এই

নলাডা কঙ্কার, তুই মুখ খুল, ও সোনা, হাঁ কর, / এই যে আনার কলি, বেদনার দানা ভাঙ তুই।

(তামাদি, নবম সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ৩৯)

লোকছড়াও সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের চোখ এড়িয়ে যায়নি। লোকছড়া বা ঘুমপাড়ানি গানকে তিনি আধুনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন নতুন শব্দ, বাক্য ও ভাবনা জুড়িয়ে দিয়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে গ্রামের পথে ঘাটে বনেবাদাড়ে প্রায়শ চোখে পড়ে লক্ষ্মীপেঁচা। নগরায়ণের ফলে যৌবনচ্যুত ইছামতির অকালে শুকিয়ে যাওয়ার উপমায় চমৎকার শৈল্পিক এক বাস্তব চিত্রকল্প :

আয় ঘুম আয়/লক্ষ্মীপেঁচার দুচোখ জুড়ে

আয় ঘুম আয়/মায়ের চুলের মতো কাজল আঁচল পেতে বোস

আয় ঘুম আয়/রুপার কাটি জাগর পুরে

ভুলিয়ে দিয়ে যারে আমার বেঁচে থাকা দোষ। (তামাদি, অষ্টম সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ৩৭)

আবার, রূপকথার ডালিমকুমার যেমন কবির চিত্তের জায়গা কর নেয় তেমনি রূপকথার সেই সুয়োরানি-দুয়োরানিও তাঁর মনের গভীরে থাকে। রয়ে যায় কল্পনাসম সোনালি অতীত, যেন যেই পথে

সুয়োরানি-দুয়োরানির যাতায়াত ছিলো আর সেই পথেই দেখা কবির মানসপ্রিয়ার সাথে। সাতটি সাগর আর তেরো নদীর ওপার থেকে আসা সেই মানসসুন্দরী যেন আজ শুধুই কল্পনা। আজ সেই সব শুধুই ভুলে যাওয়া অতীত :

আমি যেন সব কবি তুমি যেন পৃথিবীর সমস্ত কবিতা
এভাবেই কেটেছিলো আমাদের জীবনের প্রথম সায়ম্, মনে আছে?
সুয়োরানি দুয়োরানি পথ দিয়ে কতো গ্যাছে হেঁটে,
কাজল মেঘের কাছে ডাইনি বুড়িরা
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে কতো জানিয়েছে হৃদয়ে পীড়া-
আমরা ঘাসের মতো গজিয়েছি বারেবারে
সাতটি সাগর তেরো নদীর ওপারে, (তামাদি, ষষ্ঠ সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ২৫)

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র মতো কবি হৃদয় বিরহে মুহ্যমান, কবি প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তাঁর হৃদয়ের গভীর বেদনাবোধকে সঁপে দিয়েছেন লোককাহিনীর চরিত্রের কাছে, যেখানে তিনি তাঁর মাটির টান, হৃদয়ের টান খুঁজে পেয়েছেন সেখানেই তাঁর আশ্রয়, আর এখানেই তিনি সার্থক।

বাংলার লোক ঐতিহ্যের আখর থেকে কবি দু'হাত ভরে নিয়েছেন এবং সে সব নিজস্ব প্রতিভা দ্বারা উদ্ভাসিত করেছেন। মধ্যযুগে বাংলা গীতিকবিতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা তাঁর হাতে রূপ নেয় আধুনিক রক্ত মাংসের নারীতে। তাদের দুঃখ-কষ্ট, প্রেম-বিরহ হয়ে ওঠে একান্ত লৌকিক। পরমাত্মা রূপান্তরিত হয় জীবাত্মায়, আর কৃষ্ণও সাধারণ পুরুষের মতো দেবত্ব ছেড়ে এসে পড়ে মর্তে মাটির কাছে। সে প্রেমিকা রাধিকার কাছে প্রেম নিবেদন করে মানবসত্তার রূপ নিয়ে-অর্থাৎ উপাদান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে নিলেও কবি বাস্তব জীবনের প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকার কথাই যেন বলেছেন :

১. কান্দিয়া মরিবি রাই কান্দিয়া মরিবি/যেদিন দেখিবি মোরে কৃষ্ণতর।
আকাশ পাথরবাটি, কোথা পাবি ঠাঁই/যেদিন আমিও নাই, আমি আর নাই?
২. এরও বেশি শোক তুমি পাবে কি এখন?
এখন যা চাই দেও, দিয়া দেও সব, (তামাদি, ষষ্ঠ সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ২৮)

আবার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা, বেদনা, প্রেম, ব্যর্থতা, নিরাশা থেকে উৎপন্ন হয়ে যে যন্ত্রণা কবি হৃদয়ে তুসের অনল জ্বালিয়ে দেয়, স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে তা হয়ে ওঠে শিল্পসম্মত যা গ্রামীণ ও লোকজ আবহে আবর্তিত। কবির ভাষায়:

দেওতলা বাঁশঝাড়ে প্রতিদিন আসতো কুড়ানি,/আমি বাঁশ কাটার সুবাদে প্রতিদিন সেখানে যেতাম।
একদিন কুড়ানি বললো, বাঁশ আর কেটো না সুজন,/বাঁশ শেষ হয়ে গেলে পাতা আর কুড়াবো কোথায়?
(তামাদি, তৃতীয় সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ১২)

অসম প্রেম সমাজ মেনে নেয় না। সাম্প্রদায়িকতার বিষদাঁত তাই দংশন করে নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীকে। কবিহৃদয় বেদনাহত সমাজের এহেন কার্যকলাপে। আলোচ্য কবিতায় সেই দিকটাই স্পষ্ট করেছেন কবি। খ্রিস্টান তরুণী মারিয়া প্রথম যৌবনে ভালোবেসে ফেলে 'এক তরুণ পুরুষ' যার নাম 'মোমিন', মুসলিম ধর্মের সে। কিন্তু সমাজ তাদের এই বিশুদ্ধ প্রেমকে মেনে নেয়নি। সমাজচ্যুত করা হয় তাদের। সমাজের বিষদংশনে 'সবুজ মেয়েটা নীল'। গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার এ এক করুণ চিত্র, যার সাক্ষী কবি নিজে। মানুষ জন্মের থেকে যেমন জাত নিয়ে জন্মায় না তেমনি মৃত্যুতে জাত সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। নবজাতক ও মরার কোনো জাত নেই কিন্তু মানুষেরা এই মিথ্যা বিষয়কে পুঁজি করে সমাজের ধ্বংস ডেকে আনে। নিষ্পাপ তরুণ-তরুণীর জীবন কুঁড়িতেই বিনষ্ট হয়ে পড়ে সেই বাস্তব ঘটনার আলেখ্য কবির ভাষায় রূপ পায়। নীচের চরণগুলো স্পর্শকাতর :

১. মারিয়া কোথায় গেল? অই যে মেয়েটা/একঘরে ছিলো- বাঁশঝোপের রাস্তায়
আসতো কলসি-কাঁখে মাথা নত- রোজ?/ওরা কি চলেই গেলো শেষমেষ?
২. তারপর সে কথা জানা-ই–/খুবই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ সেই বোলতারই বিষে
সবুজ মেয়েটা নীল। সাপেরা ওঝার/মুখোশ পরলে আর কী করার থাকে?
৩. মায়ের জঠরে আর মাটির জঠরে/কে কাকে শাসাতে পারে বলো? আর ভারি
মজার ব্যাপার এটা, মানুষ সেখানে/যেতে ভারি ভয় পায়– তবু একবার
গেলে আর ফিরতে চায় না, থেকে যায়। (তামাদি, তৃতীয় সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ১৪-১৬)

অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে কবি দেখিয়েছেন সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের বলি তরুণ-তরুণীর বিশুদ্ধ প্রেম শিল্পসম্মতরূপে। যিনি সংবেদনশীল, তিনি তো তেমনি অনুভূতি প্রবণ হবেন মানুষের প্রতি, নিজ দেশমাতৃকার প্রতি, সেটিই তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। ঠিক সেই ধারাবাহিকতায় দেশপ্রেমে মুহ্যমান কবিহৃদয় জুড়ে রয়েছে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি- মা, মাটি- দেশ-নদী-নালা। কবির হৃদয়বীণার গভীরে ঝংকৃত হয় সেই মায়াভরা নদীর ডাক। বেঁচে থাকার জন্য যেমন শিরা, ধমনী, ফুসফুস অর্থাৎ মানবদেহের অপরিহার্য, তেমনি গ্রামবাংলার এই নদীগুলো কবি জীবনের অত্যাবশ্যকীয় আর দেহের এই একান্ত অপরিহার্য যে অংশ তার দুর্দশা তিনি অবলোকন করেছেন করুণভাবে :

ইছামতি আমার ধমনী; বুড়িগঙ্গা শিরা; / ধলেশ্বরী ফুসফুস- যক্ষ্মাভক্ষ্য চরায় চরায়;'
পদ্মা হৃৎপিণ্ড- কোমায় নিথর, কাফনে আবৃত বুড়ি রাঁড়; / মড়ক-উজাড় ভুঁয়ে সৎকার কে পায়?
(তামাদি, দশম সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ৪৩)

উপর্যুক্ত কবিতার বর্ণনায় যেন কবি নিজেরই মরার সৎকারের আয়োজন করছেন। নদীগুলো মরে যাচ্ছে– নদীই জীবন আমাদের এই গ্রামবাংলায় বাংলাদেশের মানুষের জন্য এই নদী অর্থের যোগানের সাথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে আর আধুনিকায়নের নামে নদীগুলো ধ্বংসের

পথে যা পক্ষান্তরে মানব জাতিরই ধ্বংস- অর্থাৎ কবি নিজের মৃত্যুর আড়ালে পুরো জাতীয় ধ্বংসের দিকটিই উন্মোচন করতে চেয়েছেন। কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের ছিলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি যার দরুন সমাজের কোনো ঘটনাই তার দৃষ্টির বাইরে যায়নি। পাশ কাটিয়েও তিনি চলেন নি। প্রতিটি সমস্যার ভেতর দিয়ে গিয়েছেন। তেমনি শ্রমজীবী মানুষও তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে থাকে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে কবি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এই অধিকার আদায়ে তাঁকে অনেকটা নজরুল অনুসারী মনে হতে পারে। গ্রামীণ জীবনের অতি পরিচিত নিত্যদিনের ঘটনা অর্থাৎ গরীব চাষিদের একখণ্ড জমি নিজের থাকে না পরের খাজনার জমিতে সারাদিন ভর 'সেচ', আর রাতভর 'হাল চেষে' রক্ত-ঘাম এক করে ফেলে। সেই শ্রমজীবী গ্রামের চাষা ভুষা বলে খ্যাত মানুষের প্রতিনিধি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে অধিকার আদায়ের কথা বলেন সেই সাথে পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিতে পরিণত হোন কবি, যা অত্যন্ত শিল্পরূপে প্রতীয়মান :

আমি সেচ চাই, আমি চাষ চাই,/মৌরুসি নয়, আমি খাস চাই,
নয়ানশ্রী গাঁ-র মেঠো ঘাস চাই,/তোমাতে আমার অধিবাস চাই। (সাহারা, ৫নং তনুমধ্যা, পৃ. ৬২)

সমাজসম্পৃক্ত কবি কখনো সমাজকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। আশির দশকে স্বৈরাচারী সরকারের রাজত্বে রাষ্ট্রের যে দিক-বিদিক অবস্থা সেটিকে তিনি তাঁর উদ্ভট টাইপ কিছু এলোমেলো কথাবার্তার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন স্বৈরশাসক এর সেই সময়কালটি। দেখা যাচ্ছে সবই উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ:

মগডালে বসে/কাঁচাকলা চোষে
পুকুরের রুই,/নদীগুলি ফাঁকা,
খালগুলি খাঁ খাঁ/আমি কোথা শুই?
জঙ্গী ধীবর/রসিয়া দেবর
শনিবারে একদিন নাকিসুরে গেয়েছিলো গান,
তাই শুনে... উড়ে গ্যালো প্রাণ। (তামাদি, দ্বিতীয় সর্গ, তনুমধ্যা, পৃ. ৭)

মঙ্গলকাব্য, আখ্যান কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, এমনকি চর্যাপদ থেকে রসদ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের মূল দিকটিকে ঠিক রেখে নিজস্ব মেধা ও মননের মিশ্রণে সাথে গ্রামীণ ও লোকজ নানা সংস্কৃতি, লোকগান, লোকছড়ার মতো অমূল্য সম্পদ নতুন রূপে তাঁর কবিতার মধ্যে বুননের ফলে বাংলার ঐতিহ্য পেয়েছে নতুন রূপ, নতুন মাত্রা আর সেই সাথে সৃষ্টি হয়েছে সৌন্দর্য, ঐশ্বর্যে শৈল্পিকতায় ভরপুর কাব্যসাহিত্য। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে নিজস্ব ঐতিহ্যকে লালন ও নিজের ভেতর ধারণ পূর্বক তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের ধারাবাহিকতায় এগিয়ে গিয়েও সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ একই দশকের অন্যান্য কবির থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নতুন রূপে নিজেকে উপস্থাপন

করেছেন। তৈরি করেছেন তাঁর কাব্যভাষা, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। ঠিক সেই কারণে অনেকের মধ্যে থেকেও তাঁকে খুব সহজে আলাদা করা যায় :

> তাই, কবিতা যখনই নন্দনতাত্ত্বিক রুচিবোধে ন্যারেশন হয়। তখন কোনও কোনও কবির ছন্দ এবং ভাষা সাবলীলভাবেই সেই কবিকে স্বতন্ত্র করে দেয়। ফলে এলিয়টীয় ভাবনার ডিকনস্ট্রাকশন করে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ তখন আমাদের প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগীয় পৌরাণিক কাহিনীর আদলে 'তনুমধ্যা'– কাব্যগ্রন্থের বিশাল ক্যানভাস গড়ে তুলতে পারেন। *(হেনরী স্বপন, কবির মনোজগতে মরমি ভাষার আশ্চর্য আসক্তি আছে..., লোক, পৃ.* ১৩৫)

'তনুমধ্যা'র মতো তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পুলিপোলাও' পর্যালোচনাতেও দেখা যাবে সেই ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা খুবই বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণের সাথে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। সেই নতুন মাত্রা কবিকে নিয়ে গেছে এক অনন্তের পথে যে পথে বের হলে ফেরা হয় না কিন্তু থাকে ফেরার সুতীব্র বাসনা। 'পুলিপোলাও' কবি রচনা করেছেন (১৯৯৫-২০০১) এই সময়কালে যা তিনি তাঁর ২০০৬ সালে কবিতা সংগ্রহের 'পুলিপোলাও' অংশে রচনাকাল স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর কবিতা সংগ্রহের আগে খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত *একবিংশ* (২০০৩) পত্রিকায় এই কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায়।

ব্রিটিশ শাসনামলে আন্দামানের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারে নির্বাসন দেওয়া হতো মুক্তিকামী বা স্বাধীনতাকামী মানুষদের, সেই সঙ্গে অন্য অপরাধীদেরও একই জায়গায় জোরপূর্বক রেখে আসা হতো। যার নাম বাংলায় (অপভ্রংশ) হয় 'পুলিপোলাও'। তবে এই নামটির সঠিক বাংলা মানে করলে দাঁড়ায় 'নির্বাসন'। অর্থাৎ দণ্ডিতদের নির্বাসন। এই নির্বাসনের সাথে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের সম্পর্ক কিসের তা কবিতাগুলোর বিশ্লেষণে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ নিজ দেশ ছেড়ে সুদূর অস্ট্রেলিয়াতে বসে তাঁর এই কবিতাগুলো রচনা করেন, এ থেকেই অনুমান করা যায় তিনি কোন দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ শৃঙ্খলিত, বন্দি- এই বন্দিদশা কখনো সমাজ, রাষ্ট্রের চাপে, কখনো বা ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের, অর্থাৎ কখনো স্বেচ্ছাবন্দিত্ব মানুষ বেছে নেয়- বা তা কখনো তাঁর উপর চাপিয়ে দেয়া :

> আধুনিক ব্যক্তি মাত্রে তার আত্মস্বাতন্ত্র্যের বেড়াজালে, যুথবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতায় স্বেচ্ছাবন্দি। আর বিশ্বব্যাপী ডায়াসপোরা তো এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা। মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই প্রকৃতিতে, দেশে-দেশে নিজেদের সম্প্রসারিত করে। চরৈবেতি তার চলার মন্ত্র। কিন্তু মানুষতো সহজেই উম্মূল, শিকড়চ্যুতও হতে চায় না, সভ্যতার গোড়ার শর্তটাই তো ছিল স্থায়ী বসতি স্থাপন। অথচ নানা দুর্বিপাকে, শাসনে-শোষণে-

নির্যাতনের নির্মম শিকার হয়ে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, দেশ থেকেও উৎসাদিত হয়। (বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দীসন্ধির কবিতা : দিশা ও বিদিশা*, পৃ. ১৭৪)

স্বেচ্ছানির্বাসিত কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের মনের একান্ত আত্মানুভূতি ফুটে ওঠে তাঁর লেখা 'পুলিপোলাও' কাব্যের কবিতাগুলোর ভেতর। এই কাব্যের কবিতাগুলোতে আশির দশকের সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ তাঁর ঐতিহ্যকে আরো সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে তাঁর গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়গুলোকে সুস্পষ্টভাবে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়েছেন। লোক পুরাণ, আখ্যান কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি তাঁর হাতে নিখুঁত শিল্পীর মতো শোভা পেয়েছে বলা যায়, অভ্যস্ত শিল্পীর জাদু দিয়েছে তাঁর কবিতা-দেহে প্রাণ।

সত্যিই তাই তিনি অনুপম সৌন্দর্যে যাদুকরের মতো বিমোহিত করেছেন, যা বাস্তব অনুভূতি শিল্পের দ্বারে পৌঁছায়। কবির মনোবেদনা হয়ে যায় দেশ-কাল ছাপিয়ে সকলের মনোবেদনা- 'পুলিপোলাও' কাব্যের ১ নম্বর কবিতায় প্রথমেই কবির হাহাকার ফুটে ওঠে তাঁর স্বঘোষিত উচ্চারণে, কেমন যেন একরাশ মনোবেদনার ছাপ স্পষ্ট। ঠিক যেন মধুসূদন দত্তের অনুধাবনের মতো- নিজ ভাষা, সাহিত্য ছেড়ে পরদেশে নির্গৃহ কবির বিলাপ যেন সুব্রত অগাস্টিন গোমেজকেও একই স্থানে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি মধুসূদন দত্তের লাইনটি হুবহু তুলেও দিয়েছেন রেফারেন্স হিসেবে। তবে মধুসূদনের সাথে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের বিরাট ফারাক, মধুসূদন দত্ত দেশে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের ফেরা হয় না, থাকে শুধু আত্মাভিমান, আত্মোপলব্ধির অসহায় বিলাপ :

১. এখনতো সব আমি মেনেই নিয়েছি।
সেই সব সেই সব, সেই হাহাকার রব, ঠেলে
দিয়েছি কয়েক-কোটি বহুমুখী সুড়ঙ্গের কোনোটিতে, আর ভুলে গেছি;
কী আশ্চর্য সঙ্ঘটনা হবে তা হঠাৎ ফিরে পেলে!

২. তোমার তোমারই জন্যে তবু আমি দিবা-বিভাবরী
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

(পুলিপোলাও, সনেট-১, পৃ. ৯৯, কবিতা সংগ্রহ)

কবির ভেতর চলে তীব্র অভিমান। স্বেচ্ছায় নির্বাসনের পথ বেছে নিলেও তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না এই নির্বাসন। তিনি যদিও বলেছেন তিনি সব মেনে নিয়েছেন- কিন্তু পুরো কবিতাটাটি পড়লে বোঝা যায় বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির উচ্ছিষ্টে তুষ্ট কবিকে তবুও 'দীপান্তরিত' হতে হয় পরদেশে, সমাজ, বাস্তবতায় কঠিন সময়ের আঘাতে পিষ্ট হয়ে। যদিও প্রচণ্ড মনঃকষ্ট নিয়ে নিজের ভেতরের দ্বন্দ্বে কুড়ে কুড়ে ক্ষত-বিক্ষত কবি, তাঁর মানসলোকে ফুটে ওঠে, 'চোয়ানো-ওয়াইনে'র সাথে

ঊষার শিশির ও প্রখর দুপুর। তবুও তিনি শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়েন নাই। আরো বিপুল উদ্যমে তিনি কবিতা লিখতে ব্রতী হন। দেশ ত্যাগ, দেশের প্রতি অভিমান হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার মূল রসদ :

> কবিতার জন্যেই থাকেন দিব্য-বিভাবরী। কবিতা তো রচিতই হয় দিব্যদ্যুতি উদ্ভাসনের বিভাবরীতে–রাতের গভীর আঁধারেই সক্রিয় থাকে তাঁর সৃষ্টিশীল মগ্ন অস্তিত্ব। এই বিভাবরী– রাত হচ্ছে কবিতা সৃষ্টির জন্যে আত্মপ্রস্তুতির কাল। (বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দীসন্ধির কবিতা : দিশা ও বিদিশা*, পৃ. ১৭৫)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের ৩ নম্বর সনেটেও চলে একই হাহাকার, কবির প্রাণের প্রিয় ইছামতি নদী- ইছামতি কবিকে হাতছানি দেয় নদীর ভরা দুইকূল আকুল হয়ে থাকে প্রিয় সন্তানকে বুকে টেনে নিতে। মায়ের মতো মমতাময়ী ইছামতির কাছে কবির ফেরার আকাঙ্ক্ষার চরম পর্যায় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। কবির অন্তিম ইচ্ছে আর-একবার শুধু আর-একবার অন্তত মরণের আগেও যদি শেষবারের মতো তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির মাটির ছোঁয়া পেতে পারেন। কবিতাটিতে কবির ব্যক্তি মনের অনুভূতি অত্যন্ত বাস্তবঘন হয়ে শিল্পরূপ পেয়েছে। যেখানে ঐতিহ্যরূপ ও নিজ দেশের প্রতি ব্যাকুলতা, দু'টি একসাথে গভীর দ্যেতনার সৃষ্টি করে :

১. এই ফাঁকা পথগুলি ভারি ভালো লাগে:
কুলকুল দুই কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ইছামতি নদী
যেন বয়। বার বার মনে হয়, আরবার যদি
ফিরে যেতে পারি আমি মরণের আগে!

২. কোথায় বা বাজে আর বাতাসে শানাই?
কেঁদে কেঁদে ফেরে হুহু, যা রয়েছে, র'য়ে গেছে, যা ছিল, যা নাই?

(পুলিপোলাও, সনেট-৩, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০০)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ গ্রামবাংলার সাথে ওতপ্রোত জড়িত। তাঁর আত্মার ভেতর প্রতিদিন চলে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন, ফেরা সম্ভব নয়। শুধু থাকে প্রবল ইচ্ছাশক্তি। প্রবাসজীবনে থেকেও, তিনি তাঁর গ্রামবাংলাকে এক মুহূর্তের জন্য মনের চোখের আড়াল করেন নি। ৪ নং সনেটে এসে নির্বাসিত জীবনের নতুন গল্প পাওয়া যায়। এখানে কবি আরো বেশি বেদনাহত। কবি এখানে অসম্ভব সুন্দর করে তাঁর লোক পুরাণের উপমায় ঘটনাগুলো বলে চলেছেন কলমের পর কলম। কি অসাধারণ সব চিত্রকল্প ভেসে ওঠে, মনে হয় সত্যি সত্যি কোনো অজানা দ্বীপে আটকে পড়েছেন তিনি। নিজ-দেশ ছেড়ে সুদূর দ্বীপের বাসিন্দা। জাহাজডুবিতে কোনো অজানা দ্বীপে আটকে পড়া নাবিক ও তাঁর সঙ্গীরা যেমন 'এসওএস' বা বোতলবার্তা পাঠায়- তেমনি কবিও যেন জীবনের কোনো ঝড়ো সময়ের দোলায় বহুদূরে চলে এসেছেন অজানা দ্বীপে (অস্ট্রেলিয়া) সেখান থেকে তিনিও চান বোতলবার্তা পাঠাতে, যেন তাকে উদ্ধার করা হয়। কবির একান্ত আকাঙ্ক্ষা যেন তাঁর পাঠানো

বোতলবার্তা পৌঁছে যায় 'সেই ঘাটে, যেখানে একদা যতী বেহুলার ভেলা' ঠেকেছিল, কবি অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ তাঁর বোতলবার্তার খোঁজ কেউ কি পেল :

১. যদি এ-বোতলবার্তা কোনদিন পৌঁছে যায়, যদি পৌঁছে যায়,
সেই ঘাটে– যে-ঘাটে একদা যতী বেহুলার ভেলা
ঠেকেছিল বৃহস্পতিবার বারবেলা;
অসম্ভব অঘটন অনুমিত হয়েছিল আকাশের ঈশান কোনায়–
জানি, সেও হবে এক দুর্ঘটনা, প্রকৃতির দুর্গতির প্রায়,

২. এমনকি লখিন্দরও যেদিন উঠেছে ন'ড়ে বর্ষার অজস্র অভিষেকে...
আর আজ– এ বোতলবার্তা পড়তে, পড়তে, প্রিয়তম
যে-ঋতু আমার মাঝে দেখ তুমি, তার নাম শীত। (পুলিপোলাও, সনেট-৪, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০০)

কবির একান্ত পরিচিত ঘাটে যদি এ বার্তা পৌঁছায় কিন্তু হায়! এ বার্তা আদৌ পৌঁছায় কিনা বা পৌঁছাতে পৌঁছাতে ঋতু বদলের সাথে নেমে আসে কবির নিসঃঙ্গ জীবনের মলিন শীত রাত, যেখানে কবি তাঁর বেদনাকে করে তোলেন বিশ্বব্যাপী- যা দেশ-কালের সীমা ছেড়ে হয়ে পড়ে সর্বজনীন, সেই জন্য সেক্সপিয়ার-এর বিখ্যাত সনেট That time of year thou may'st in me behold -এর সুধীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদটি রেফারেন্স হিসেবে এনে কবিতাটিকে বোধের চরম পর্যায়ে নিয়ে যান। যা কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে বাধ্য। কবির নির্জন, নির্বাসিত দ্বীপান্তরিত জীবন শীতঋতুর মতো মলিন, শুষ্ক, বিবর্ণ, আর তাঁর সেই বেদনার গভীর প্রকাশ যেন করছেন মানসপ্রিয়ার কাছে। আলোচ্য কবিতায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কবি তাঁর মনের ভেতর দেশকে ধারণ করেছেন লোক-পুরাণের আলোকে। পৌরাণিক কাহিনির চরিত্র যেমন- বেহুলা, লখিন্দর হয়ে ওঠে কবির আবেগ প্রকাশের সহায়ক। জীবনের ঝড়ে বিপর্যস্ত কবি ফিরে পেতে চান তাঁর হারিয়ে যাওয়া আবাসন। তাঁর বোতলবার্তা পৌঁছাতে চান প্রিয়দেশ, মা, মাটি ও প্রণয়িনীর কাছে। পথহারা নাবিক প্রতিনিয়ত খুঁজে ফেরে পথের সন্ধান এখানে কবিও যেন সেই পথহারা পথিক নিজে জীবনের নানা গ্রন্থিতে, সমাজ বাস্তবতায় নির্মম আঘাতে নিজেকে হারিয়ে খুঁজে ফিরছেন আপন দেশ, মাতৃভূমি আর মানুষ। মানুষ যখন হারিয়ে যায় তখন তার কেবলই থাকে নিজের একান্ত আপন মানুষের কাছে ফিরে যাওয়ার করুণ আকুতি। যদিও কবি বাস্তবতার জটিলতার পাকে তবুও আশাহত নন তিনি। ফিরে আসার সুসময়ের অপেক্ষায়। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ এভাবেই তাঁর অনুভূতি সনেট-এর আকারে ব্যক্ত করেছেন, যা রসঘন করে তোলে পাঠকের মন আর কবিতা পৌঁছে যায় শৈল্পিকতার সীমায়।

১১ নং সনেটে এসে কবি রোমন্থন করছেন তাঁর প্রণয়িনীর সাথে কাটানো অনুপম সময়ের। কবি তাঁর মানসপ্রিয়ার গভীর ঢেউখেলানো চুলের ভেতর হারিয়ে যেত নিরুদ্দেশ, কিন্তু সে কবেকার কথা তাঁর

সেভাবে মনে নেই। কৈশোর বয়সের সেই প্রেম ভালোবাসা হয়তো ভুলই। তবু কবি বারবার ভুল করেও সেই ভুল মনে করতে চান। আলোচ্য কবিতায় কবি সমন্বয় ঘটিয়েছেন গ্রিক মিথ ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী, রাম যেমন সীতার জন্য স্বর্ণমৃগয়ায় গিয়েছিল, গ্রিক নায়ক জেসন যেমন 'সোনালি পশম'-এর খোঁজে গিয়ে জয় করে এনেছিলো সোনালি পশমের সঙ্গে প্রেমিকা মেডিয়াকে, তেমনি কবিও তেমনকিছুর খোঁজে গিয়ে জয় করে ফিরতে চান তাঁর সেই ফিরোজা চুলের মেয়েকে। তাঁর মানসপ্রতিমা বা প্রণয়িনীকে। জীবনের কঠিন বাস্তবতায় যদিও কবি, তবুও নিজের একান্ত সময়ে আজও কবির স্মৃতিতে নাড়া দিয়ে যায় তাঁর সেই প্রথম যৌবনের প্রেমিকা, আজও যার কথা মনে পড়ে সকাল-সন্ধ্যায়, মনে পড়ে তাঁর সাথে কাটানো মধুর সময়। অত্যন্ত স্মৃতিকাতর কবির কণ্ঠে তাই বেজে ওঠে :

১. কবে তোর ফিরুজা চুলের
বিপরীত ঢেউ এসে আমারে ভাসালো নিরুদ্দেশে
তার দিন-ক্ষণ আর মনে নাই– তবু সেই পেলব ভুলের
আরক্ত মাসুল গণি আজও দিনশেষে ...

২. আরও কেউ গেছে নাকি স্বর্ণমৃগয়ায়?
জয় ক'রে ফিরেছে কি সোনালি পশম?

৩. তোরে তবু মনে পড়ে সুবার সাবায়, মাঝে মাঝে–
রভস-অবশ রক্তে ভুলে-যাওয়া বৈতালিক রাজে!

(পুলিপোলাও, সনেট-১১, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০৪)

আউল গান, বাউল গান, ভাটির গান-আর ভাটিয়ালি মন– গ্রামবাংলার ঐতিহ্য সন্ধানী কবি নিজের শিকড়ের কাছেই যেতে চান- ভাটির দেশের মানুষ কবি, তাঁর একমাত্র প্রার্থনা, অন্তিম সময়ে যেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে শেষকৃত্য হয়। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ অসাম্প্রদায়িক কবি, যার ফলে তাঁর কবিতায় সব ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় শব্দাবলি বিরাজমান। দেবীর কাছে তার আর্তি :

১. হে দেবী, এসেছি আমি বঙ্গের লঙ্গরখানা থেকে
তোমার প্রসাদে পুষ্ট করতে এই চর্মসার প্রাণ–

২. আমারে দিয়ো না গোর এ' দূর উজানে,
ভাটির মানুষ আমি, ভাটিয়ালি মন, (পুলিপোলাও, সনেট-১৫, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০৫)

লোকায়ত জীবনের গভীর বোধকে হৃদয়ে লালন করে লোকসংস্কার ও সংস্কৃতির এক উচ্চপর্যায়ে নিয়ে গেছেন সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ- তিনি 'ভাটির গানে' মুগ্ধ 'ভাটির মানুষ'। লোকজীবনের এই বোধ থেকে তিনি একমুহূর্তও বের হয়ে আসেন নি :

স্বদেশ-বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা বাংলা কবিতায় সম্ভবতঃ এই প্রথম কাব্যিকতা লাভ করে, ইউরোপের সেই লেখকের অন্তিম মর্মবাসনার সঙ্গে তা সাযুজ্যপূর্ণ হলেও সচেতন পাঠকের সত্তার গভীরে গলে পড়ে কবির বুকের রক্ত। (খালেদ হামিদী, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ : দ্বীপান্তরে জনবিশ্ব, *লোক*, পৃ. ১৬৭)

লোকায়ত জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ নদী, যে-নদী কবির হৃদয়ের সাথে বাঁধা, কিন্তু তা কবি কখনোই বুঝতে পারেননি। আর তখনই বুঝতে পারলেন যখন তিনি তাঁর এই প্রিয়ের কাছ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে। কবি তাঁর নিজের আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন করতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ধর্মীয় মিথ ব্যবহার করেছেন যা একই সাথে আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণ। কথিত আছে, যিশুকে ব্যাপ্‌টাইজ করার জন্য জন (যিশুর খালাত ভাই) যেইমাত্র জর্ডানের পানিতে তাঁকে গোসল করান, সাথে সাথে দরজা খুলে যায় স্বর্গের, ও আকাশ দু'ভাগ হয়ে একটি পারাবাত নেমে আসে। পবিত্র আত্মার আগমনের সাথে আসে একটি দৈববাণী: 'এই আমার পুত্র', আর প্রথম বারের মতো নিজস্থান ছেড়ে জর্ডান নদীর পাড়ে এসে যিশু জানতে পারে তাঁর আসল পরিচয়। জন ও যিশু দু'জনই জানতে পারে তাঁদের পরিচয়। ঠিক তেমনি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজকে ইছামতি সেই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার বাণীর মতো স্বপ্নে দেখায় 'এই আমার পুত্র' ইছামতির পুত্র কবি। কবিও যিশুর মতো প্রথম বারের মতো জানতে পারেন তাঁর আত্ম পরিচয়, ইছামতির সাথে তাঁর সম্পর্ক। আর যখন জানতে পারলেন তখন তিনি ইছামতির থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে। কবি তাঁর অনুভূতি যেভাবে ধর্মীয় মিথের সমন্বয়ে প্রকাশ করেছেন তা এক অর্থে অসাধারণ। যাদুকরী শিল্পী তিনি :

১. ইছামতি– এই নাম, অক্ষরে অক্ষরে বহমান/ সদ্যঃপাতী জীবনের চিরায়ত বামে:
ইছামতি– এই নাম, আর তার ব্যঞ্জনার ধুল-পরিমাণ / অভিঘাতে বাস্তুহারা, আমি, পরিণামে–
এবং আকাশ চিরে আড়াআড়ি সমান দু'-ভাগে / দুগ্ধশুভ্র পারাবাত নেমে আসে অন্তরিন রাতে,

২. ইছামতি– এই নাম, কোনো দেশে উচ্চারিত হয়, / হারাবার ভয়ে যারে স্বপ্ন ক'রে রেখেছে সময়।

(পুলিপোলাও, সনেট-১৬, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০৬)

সংবেদনশীল কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ তাঁর প্রবাস জীবনের বসবাসরত অবস্থায় নিজ দেশের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন বিচিত্রভাবে। সংবেদনশীল মানুষমাত্রই বুঝতে পারেন প্রথম দেশত্যাগের নির্মম অভিজ্ঞতা। নাড়ি ছিঁড়ে যেমন পৃথিবীতে আসা তেমনি দ্বিতীয়বার নাড়ি ছিঁড়ে মাতৃভূমি ত্যাগ, এই তীব্র অনুভূতি কেবল প্রবাসীদের পক্ষেই অনুধাবন সম্ভব। আর তা কাব্যে প্রকাশ করতে পারেন সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ। কবি তাঁর দেশত্যাগ করার সাথে-সাথে নিয়ে চলেছেন তাঁর নিজ-দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্ম-সংস্কার-রীতি। কবি তোতাপাখির প্রতীকে একের পর এক প্রশ্ন করে গেছেন নিজেকে :

১. কও তোতা, কাহিনি তোমার বাখানিয়া,

টক্কা টরে টরে টক্কা টক্কা টরে টরে

কেমনে আইলা তুমি আধখানা পোড়া পাখা নিয়া

উড়িতে উড়িতে আর পুড়িতে পুড়িতে এই কদলী নগরে?

২. ক্যান্ বা আইলা, পাখি, কদলী নগরে?

কোন্ বা নামাজ তুমি করেছিলে কাজা, (পুলিপোলাও, সনেট-২১, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০৭)

আঞ্চলিক ও কথ্য ভাষার মিশ্রণে অসম্ভব সুন্দর করে কবি বর্ণনা করে চলেছেন :

> এখানে ভাষা কথ্য- আঞ্চলিক রীতির ব্যবহারে ধ্বনিময়, ক্রিয়াপদে ক্রীড়াময়। কবি শব্দভাষা নিয়ে খুব বেশি নিরীক্ষাপ্রবণ। যেহেতু কবিতার বিষয় আত্মজৈবনিকতা, তাই পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য প্রযুক্ত হতে থাকে রেফারেন্সিয়াল ভাষার সংবেদন। যে জীবনে তিনি প্রবিষ্ট তাতে ফেলে-আসা জীবনের তথা নিজের দেশ-সমাজ-আত্মপরিজনের 'কায়াহীন ছায়াগুলি এসেছে' তাঁর পিছু পিছু এবং 'আপন ক্রুশ কাঁধে তুলে দিয়েছে' তাঁর। (বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দীসন্ধির কবিতা : দিশা ও বিদিশা*, পৃ. ১৭৮-১৭৯)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ দক্ষতার সাথে ঐতিহ্য-স্বরূপ টিয়াপাখির সংস্কারটিও নিজের সঙ্গে গেঁথে রেখেছেন। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাস যেন নামাজ সঠিক সময়ে না আদায় করলে সৃষ্টিকর্তা শাস্তি দিবেন তাই কবিরও মনে হয় হয়তোবা তিনি ঐরূপ কোনো অপরাধ করেছেন, তাই তার এত বড় শাস্তি পেতে হলো। এক আকাশ সমান সাজা, যেন পৃথিবীর ওজন-স্তরটি ফুটো হওয়ার উপক্রম। ২৩ নং কবিতাতে এসে অন্য এক সুব্রত অগাস্টিন গোমেজকে পাওয়া যায়। কবিতাতে কবি হারানো দিনের স্বপ্নের, স্মৃতিরোমন্থনের সাথে-সাথে তাঁর আত্মপোলব্ধির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কবিতাটির ভেতরে ভাষা, ছন্দ, অলংকার, অনুপ্রাস, উপমা, মিথ ইত্যাদির, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিজের জীবনের সাথে সমন্বয় করেছেন। বাংলার পুরাণ কাহিনীর এক অভিনব আবিষ্কার, যেখানে কবি নিজেই বেহুলা আর লখিন্দর সেজে নিজের সুবিধামতো নিজের ভেলায় ভেসে চলেছেন এক অনিয়ন্ত্রিত জীবনের উদ্দেশে, নিয়তির খেলায়। এই কবিতাটির ভেতর বৌদ্ধতান্ত্রিকতার কথা এসেছে। যেমন বত্রিশ ঘাট- অর্থাৎ বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে দেহমধ্যস্থ বিশিষ্ট স্থানগুলি আট গুণিতকে আসে; যেমন- আট, ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি ইত্যাদি। দেহের মোট নাড়ির সংখ্যাও বত্রিশ। দেখা যাচ্ছে কবি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানবদেহের সাথে বৌদ্ধতান্ত্রিকতাকে ব্যবহার করেছেন যা দুর্লভ। কবি তো ভেসে এসেছেন এই দ্বীপে (অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে) 'ঝরোকা-কাটার' উল্লেখে আছে লালনের 'আট কুঠুরি, নয় দরোজা আঁটা / মধ্যে-মধ্যে ঝরোকা কাটা' এখানেও দেহতত্ত্ব। জুরাসিক যুগের উল্লেখে বোঝা যায় এই দ্বীপ প্রাচীন (অস্ট্রেলিয়া প্রাচীন প্রস্তরের দেশ) অর্থাৎ কবি তাঁর লোক-ঐতিহ্য পুরাণের ভেতর থেকে নিজ-জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কবিতার স্তবকে-স্তবকে তুলে ধরেছেন যা একই সাথে শ্রুতিমধুর, গীতলতায় ভরপুর, বেদনাবিধূর। কবিতাটির শেষে যে-নতুন আলোর কথা কবি বলেছেন সে-আলো

যেন কবির নিজেকে, নিজের ফেলে-আসা দেশকে, অস্তিত্বকে প্রথমবার দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে। যা দেশে থাকতে কখনো সম্ভব ছিলো না। আর সেই আলোয় পাঁজরের মাঝে যেন এক জমজম খুঁড়ে দিয়েছে। শেকড় থেকে দূরে গিয়েও শেকড়ের যে টান, মাটির মমতা যে কত গভীর প্রতিটি মুহূর্তে কবি উপলব্ধি করেন হৃদয় দিয়ে। প্রিয় দেশে থেকে তিনি মাতৃভূমির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি, দেশ থেকে বহুদূরে গিয়ে সেই অনুধাবন তাঁর প্রতি চরণে :

> এই পূতিগন্ধময় মৃতদেহ নিয়ে/আমি ভেসে এসেছি অনেক দূর, অনেক বন্দর।
> আমিই বেহুলা, আর আমি লখিন্দর।/নিজেরে সুবিধামতো গাঙুড় বানিয়ে
> নিজেরই মান্দাসে আমি চলেছি ভাসান।/এক ঘাট– দুই ঘাট– বত্রিশ ঘাটার
> পরখ করেছি আমি শান:/অতঃপর ঠেকে গেছি, ফেঁসে গেছি, ঝরোকা-কাটার
> এই চরে... (পুলিপোলাও, সনেট-২৩, *কবিতাসংগ্রহ*, পৃ. ১০৮)

একজন গুণী শিল্পী তাঁর শিল্পের কারিশমা তখনই দেখাতে পারেন যখন সেই শিল্প হয় মহৎ ও তাঁর একান্ত অনুভূতিজাত। যা তাঁর মূল থেকে বিচ্যুতি না হয়ে বরং সেটিকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরেছেন পুরো তাবৎ পৃথিবী, সেখান থেকে রসদ নিয়ে তা থেকে ছেঁকে নিয়েছেন অমৃত, যে-জারকরসে তিনি একা নন, পাঠককেও জারিত করেন। তিনিই আশির দশকের অনবদ্য কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, যিনি লোকসঞ্জাত বিশ্বাস, সংস্কার, গান, কথা, মিথ ও পুরাণের মিশেল ঘটিয়ে মানব ও মানবসমাজের গোষ্ঠীগত চেতনা, টোটেম, ট্যাবু, প্রতিদিনের ধূলিমলিন আচার এবং ধর্মাচার থেকে শুরু করে শহুরে জীবন তথা চিরায়ত জীবনের প্রাত্যহিক পরিভ্রমণ করেছেন প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও আধিদৈবিক অধিবাস্তবতায়।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতার চক্রমণপথ বহুদিকে অগ্রসরমাণ, ফলে তা দেশকালের সীমানা ছেড়ে বহির্বিশ্বে চলমান। তাঁর বক্তব্য আপাতত সরলরৈখিক মনে হলেও, তা নিগূঢ় অর্থে দেদীপ্যমান। ভাষাকে একঘেয়েমি থেকে বের করে, প্রচলিত-অপ্রচলিত ও রূপকের ইঙ্গিতে কবিতার কাঠামোতে আটকিয়েছেন কবি। পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্য থেকে উপাদান ও রসদ নিয়ে তা বুনেছেন বাংলা কাব্যসাহিত্যে, যা থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার :

> জীবন তৃষ্ণা, ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ, নগরচৈতন্য, নগরজীবী মানুষের চিত্রায়ন, প্রেম, রিরংসা, স্বভূমি ত্যাগের অন্তর্কথন, বিদেশি শব্দের অবাধ প্রয়োগ, ডায়ালেক্টের ব্যবহার, দ্ব্যর্থবোধক শব্দের বাহুল্য, তৎসম শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁর কবিতার জমিনে যে পঙ্‌ক্তিনিচয়ের জন্ম দিয়েছে তা বিভূঁই হয়েও স্বাদেশিকতায় পরিপূর্ণ। তাঁর কবিতা অন্তর্চেতনাকে নতুন করে ভাবার জন্য একটি আধুনিক খোরাক। (আল মাকসুদ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা : দৈশিক ভাবনার প্রতিধ্বনি, *লোক*, পৃ. ১৪৮)

ধর্মভাবনা, সামাজিক দায়বোধ, নিত্যদিনের গ্রামীণ ও লোকজজীবন প্রবাহের এক অনুপম বিশ্লেষণ, তাঁর কবিতা আধুনিকতাকে ছাড়িয়ে গেছে। অপরিমেয় দেশজ ঐতিহ্যের সমন্বয়ে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তিনি তাঁর জ্ঞানের দ্যুতি বাংলা কবিতায় ছড়িয়েছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে এই শক্তিমান কবির পাকাপোক্ত জায়গা তৈরি হয়ে গেছে। আর তাঁর কাব্যের দ্যুতিও ছড়াবে বহুকাল।

বাংলাদেশের কবিতায় সত্তরের দশকের কবিগণ স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিরন্তর ভেবেছেন এবং লিখেছেন। যেমনভাবে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ মানুষ চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত ফল তেমনভাবে গণমানুষ ভোগ করতে পারেনি। আশির দশকের কবিগণও সত্তর দশকের কবিদের মতোই দেশ সমাজ রাজনীতি নিয়ে ভেবেছেন। বাংলাদেশের আশির দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর ঘটেছে প্রচুর। আশির দশকের কবিদের ভেতর জগৎ ছিল দ্রোহে ভরা। অবশ্য কেউ কেউ রূপকের ছলে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিক্রিয়ায় কবিতা নির্মাণ করেছেন, আবার কেউ কেউ সরাসরি রাখঢাক না রেখে কবিতাকে শ্লোগানে পরিণত করেন। আশির দশকে স্বৈরতন্ত্রের যাতাকলে বেঁচে থাকার জন্য হতাশা অস্থিরতা মানুষকে ক্লান্তও করেছে। মানুষ ছুটেছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। শহরে বসবাস বরাভয়। কিন্তু আশির দশকের কবিসম্প্রদায় শহুরে জীবনে বসবাস করে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের যাতাকলে পিষ্ট হয়েছেন। তাই মানুষের দুঃখবোধে তাড়িত হয়েছেন কবিগণ, অন্তর্দহনে পীড়িত হয়েছেন :

> আশির কবিরা তাই হয়ে ওঠেন গভীর, সংবেদনশীল ও আত্ম-প্রত্যয়ী। বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেল কবিতা। শব্দের প্রাণ ও ভরের তারতম্য, উপমার আতিশয্য সংবরণ, রূপকের সস্তা চমৎকারিত্বের বদলে সংকেতের সুদক্ষ ব্যবহার; এসব বিষয়ের নানা সুচিন্তিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝলমলে স্নিগ্ধ আলোয় আশির কবিতা উজ্জ্বল এবং বদলে যেতে থাকে পূর্ববর্তী কাব্যপ্রকরণ থেকে। (গাজী রফিক, ভূমিকা : রূপান্তর আশি দশকের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৩৫০)

পূর্ববর্তী দশকের কাব্যপ্রকরণ ক্রমান্বয়ে বদলে যেতে থাকে আশির দশকে। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কাব্যনির্মিতিতে ছিমছাম মেদহীন অবয়ব গড়ে ওঠে। মাসুদ খানের কবিতায় বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার দক্ষতা, আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতায় ভাটিবাংলার যাপিত জীবনের উদ্ভাস এবং সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতায় ইতিহাস ঐতিহ্যের পুনর্ব্যবহার আধুনিকভাবে সংঘটিত হয়। আশির দশকের কবিতায় মিথ-পুরাণের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মিথ-পুরাণের সাথে সমসাময়িক ইতিহাসের মিশেলে নবতর লোকাশ্রিত আচার দর্শন প্রতিফলিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ, প্রেম, প্রকৃতি, রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানচেতনা, প্রতিবাদীচেতনার কাব্যিক প্রকাশ ঘটে আশির দশকে :

আশির কবিতার দু'টো প্রধান প্রবণতা আধুনিক সময়চেতনা এবং মৃত্তিকামুখী সমাজদৃষ্টি। তাই সত্তরের কবিতা থেকে আশির কবিতা হয়ে গেছে স্বতন্ত্র। সত্তরের কবিরা জীবনকে শিল্পিত করতে গিয়ে প্রধানত নির্ভর করেছেন মাইক্রো-সময়ের ওপর, আশির কবিরা সেখানে ম্যাক্রো-সময়ের বিশাল ডানায় ভর করে দূরায়ত পুরাণের উৎসধারা থেকে জীবনকে তুলে আনেন বর্তমানের সীমানায়। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের কবিতা : তিন দশকের ত্রিধারা, *হালখাতা*, পৃ. ৫৩৪)

আশির দশকের সময়খণ্ডে গ্রামীণ জীবনে লোকায়ত ভাবনার রূপান্তর ঘটেছে সমানভাবে। প্রত্যেক কবিই নিজস্ব চিন্তার সমীকরণে গ্রামকে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। লোকায়ত জীবননির্ভর সমাজ বিনির্মাণে প্রাতিস্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থ-সহায়িকা :

১. অনু হোসেন, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সৃষ্টিপ্রতিভা, *একবিংশ*, (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : খোন্দকার আশরাফ হোসেন), সংখ্যা- ২৯, ঢাকা, ২০১৫

২. আমিনুর রহমান সুলতান, *রাজনৈতিক চেতনা বাংলাদেশের কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

: কবিতাসংগ্রহ, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

৩. আল মাকসুদ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা : দৈশিক ভাবনার প্রতিধ্বনি, অনিকেত শামীম সম্পাদিত *লোক*, বর্ষ : ১৭, সংখ্যা : ২১

৪. কাজী নাসির মামুন, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা : জীবনবাদী চেতনার অশ্বারোহী, *অমিত্রাক্ষর*, বর্ষ : ৫ ,সংখ্যা : ১, ঢাকা, ২০০৬

৫. কামরুল হাসান, 'কবিতার মুখপত্র একবিংশ ও কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন', *একবিংশ*, ডিসেম্বর-২০১৫, ঢাকা।

৬. খালেদ হামিদী, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ : দ্বীপান্তরে জনবিশ্ব, অনিকেত শামীম সম্পাদিত *লোক*, বর্ষ : ১৭, সংখ্যা : ২১

৭. গাজী রফিক, 'ভূমিকা : রূপান্তর আশি দশকের কবিতা', *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা : ৫, ঢাকা, ২০১৩

৮. তালুকদার মনিরুজ্জামান, *সামরিক শাসনের ফলাফল রাজনীতির সামরিকীকরণ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের রাজনীতি* (১৯৮২-৯০), প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১

৯. তামিম ইয়ামীন, সুব্রতর্পণ, অনিকেত শামীম সম্পাদিত, *লোক*, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০১৬

১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের কবিতা : তিন দশকের ত্রিধারা, *হালখাতা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০১১

১১. বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দীসন্ধির কবিতা : দিশা ও বিদিশা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২০

: মাসুদ খানের কাবিতা : বস্তু ও প্রাণপৈতির চক্রমণে জীবনপ্রপঞ্চ, সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত, *উলুখাগড়া*, সংখ্যা : ৩৪, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা, ২০২০

১২. মাসুদ খান, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

: সালোক-সংশ্লেষণের কুশলী কলাকার, *লোক*, বর্ষ : ১৭, সংখ্যা : ২১, ২০১৬

১৩. মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

১৪. মানিকুল ইসলাম, মাসুদ খানের কবিতা : বিষয়বৈভব ও প্রকরণনিষ্ঠা, *উলুখাগড়া*, সংখ্যা : ৩৩, ঢাকা, ২০১৯

১৫. মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

১৬. শহীদ ইকবাল, আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতা : ঐতিহ্যের বাহনে সম্মুখগামী মননযাত্রা, *অমিত্রাক্ষর*, বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ১, ঢাকা, ২০০৬

: আশির কবিতায় নির্মাণচিন্তা ও প্রতিষ্ঠিত সঞ্চয়, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা : ৫, ঢাকা, ২০১৩

১৭. সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল [সম্পাদিত], *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

১৮. সাঈদ-উর রহমান [সম্পাদিত], *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* (১৯৭২-'৯৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

১৯. সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, *তনুমধ্যা*, চেতনা, ঢাকা, ১৯৯০

পুলিপোলাও (২০০৩), *কবিতাসংগ্রহ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

২০. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, তিন রমণীর ক্বাসিদা, *একবিংশ*, (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : খোন্দকার আশরাফ হোসেন), সংখ্যা- ২৯, ঢাকা, ২০১৫

২১. সৈয়দ শামসুল হক [সম্পাদিত], *কবি ও কবিতার সংগ্রাম*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

২২. হিজল জোবায়ের, ঐতিহাসিক, অনিকেত শামীম সম্পাদিত, *লোক*, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০১৬

২৩. *হেনরী স্বপন, কবির মনোজগতে মরমি ভাষার আশ্চর্য আসক্তি আছে...*, অনিকেত শামীম সম্পাদিত, *লোক*, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০১৬

সপ্তম অধ্যায়

নব্বইয়ের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর

নব্বইয়ের দশকের (১৯৯০-১৯৯৯) কবিতা মূলত মেধা মনন আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার কবিতা। আবেগ আর মননের মিথস্ক্রিয়ায় নব্বই দশকের কবিতা প্রকৃতার্থে সত্তরের দশক ও আশির দশকের কবিতা থেকে নতুন অবয়বে ভিন্ন মাত্রা সংযুক্ত করে। আশির দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে গণজাগরণ থেকে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পাকিস্তান পতনের চূড়ান্ত বহ্নিশিখা ১৯৬৯ সালের মতো আশির দশকের শেষ পর্যায়ের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাক যাক'; এই অগ্নিমন্ত্রের পক্ষে তৎকালীন কবিসমাজ নব্বইয়ের দশকে যাত্রা শুরু করেন। নব্বইয়ের দশকের কাব্যকাঠামোর লক্ষণ বিষয়ে 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের কবিতা : পরিপ্রেক্ষিত প্রবণতা ও প্রান্ত' প্রবন্ধে বেগম আকতার কামাল সূত্রাকারে লেখেন :

> ক. বিশ্ব ও বস্তুচেতনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল দৃষ্টির অভিঘাত;
>
> খ. রাজনীতি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে গড়ে ওঠা বিচ্ছিন্নতার অতিক্রমণ লক্ষ্যে প্রতিবাস্তব জগতে প্রবিষ্ট হওয়া।
>
> গ. আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠিত কর্মের সঙ্গে অসদ্ভাব গড়ে তোলার বৈনাশিকতা ও আত্মবিরুদ্ধ হয়ে পড়া। (সাঈদ-উর রহমান [সম্পাদিত], *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, পৃ. ৩১)

নব্বইয়ের দশকের কবিতার বেষ্টনী প্রসারিত হয়ে পড়ে। তবে কবিদের মানসপ্রবণতা হয়ে ওঠে কুণ্ডলায়িত ও আত্মকৌণিক। পাশাপাশি এ দশকের কবিদের চেতনতল বিরোধাভাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অধিকাংশ কবিদের চিন্তার নির্যাস খণ্ড খণ্ড হয়ে প্রকাশ পায়। অতিক্ষুদ্র বস্তুতে বৃত্তায়িত হয়ে তাঁরা শব্দমালার মধ্যে অর্থসন্ধান করেন :

> অথচ সত্তাগত সূত্রে তার পরিচিতি ক্রমেই হতে থাকে মহাজাগতিক আয়তনে প্রসারিত। মিশ্র উপ-বহুলতায় স্তরবদ্ধ মানবস্বভাব বৈবিধতায় হয়ে পড়ে উদ্ব্যস্ত, যার পশ্চাতে নেই কোনো আদর্শের অন্তর্সূত্র অথবা দর্শনভিত্তি। এ-কালের মানুষের জন্য নেই কোনো ইজম, তত্ত্ব বা মূল্যবোধের নিটোল প্রতিভূ। (সাঈদ-উর রহমান [সম্পাদিত], *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, পৃ. ৩১)

নব্বইয়ের দশকের কবিতা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি আল মাহমুদ 'নব্বইয়ের কবিতা : গোধূলিসন্ধির নৃত্য' প্রবন্ধে লেখেন : 'নব্বই দশক আমাদের কবিতা প্রয়াসের উজ্জ্বল শস্য।' (সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পাদিত], *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৪১০) ষাটের দশকের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এ দশকের কবিদের কবিতায়। এ সময়ের কবিতায় কবিদের অভিজ্ঞতা, কাব্যরুচি ও স্বতন্ত্র অধ্যয়ন বৈচিত্র্য, উজ্জ্বল

আনন্দরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। আল মাহমুদ নব্বইয়ের দশকের কবিতা বিষয়ে উপর্যুক্ত প্রবন্ধে যথার্থ উচ্চারণ করেছেন : 'নব্বই দশকের কবিতা বাংলা সাহিত্যের– বিশেষ করে কবিতার স্বতন্ত্র নদীর মতো।' (সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পাদিত], *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৪১০) নব্বইয়ের দশকের কবিরা 'কবিতাকে মানব হৃদয়ের নিগূঢ় রসায়ন হিসেবে ভাষারূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।' (সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পাদিত], *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৪১০) পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কবিদের অভিজ্ঞতা নব্বইয়ের দশকের কবিরা কবিতায় বপন করেছেন। ষাটের দশকের কবি সিকদার আমিনুল হক কবিতার পাশাপাশি গদ্যচর্চা থেকে সমকালীন কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন প্রচুর। নব্বইয়ের দশকের কবি ও কবিতা নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম : 'নব্বই দশক : মাতাল তরণির কতিপয় যাত্রী'। এই লেখায় তিনি নব্বইয়ের দশক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। উপর্যুক্ত প্রবন্ধ রচনায় তাঁর চমৎকার উপলব্ধি ও আবিষ্কার উন্মোচিত হয়।

নব্বইয়ের দশকের অধিকাংশ কবি ক্রমশই ঝুঁকেছেন শিল্পিত সৃষ্টির কঠিন প্রয়াসের দিকে। বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (জ. ১৯৬৮), মুজিব ইরম (জ. ১৯৬৯), চঞ্চল আশরাফ (জ. ১৯৬৯), রহমান হেনরী (জ. ১৯৭০), কামরুজ্জামান কামু (জ. ১৯৭১), শামীম রেজা (জ. ১৯৭১), টোকন ঠাকুর (জ. ১৯৭২) প্রমুখ নব্বইয়ের দশকের কবিদের পরিচিত নাম। এ সময়ের কবিরগণ কণ্ঠস্বরে আলাদা, কবিত্ব শক্তিতে আলাদা, নতুনত্বেও আলাদা। নব্বইয়ের দশকের কবিদের কবিতা আত্মমগ্ন উচ্চারণের কবিতা। নির্মেদ তলদেশ সন্ধানী তাঁরা, নির্ভার এঁদের আত্মউচ্চারণ :

> বাংলাদেশের নব্বইয়ের কবিতা মূলত মেধা মনন ও আত্মোপলব্ধির কবিতা। আবেগ আর মননের মিথস্ক্রিয়ায় বাংলাদেশের নব্বইয়ের কবিতা, প্রকৃত প্রস্তাবেই, সত্তর-আশির কবিতা থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে গেছে। আত্মোপলব্ধি ও দার্শনিক মননশীলতায় নব্বইয়ের কবিতা সৃষ্টি করেছে, আমাদের কবিতার ধারায়, নতুন এক মেজাজ। এই মেজাজকে ধরতে হলে কবিকে সমাজের মতো 'অবজেক্ট' হিসেবে নয়, দেখতে হবে 'সাবজেক্ট' রূপে। কবির কণ্ঠে, সত্তরের মতো, যুগল শব্দস্রোতে সম্মিলিত চরণসজ্জায় কিংবা আশির মতো মিথের ব্যাকপ্রোজেকশানে কেবল কালের কথা উঠে আসে না; কবিতা এখন হয়ে ওঠে কবির আত্ম-অনুভূতি ও সত্তা-উপলব্ধির ব্যঞ্জনাগর্ভ স্বরগ্রাম। এই নিরীক্ষা এই বৈশিষ্ট্যই, বোধ করি, নব্বইয়ের প্রধান স্বাতন্ত্র্য। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের কবিতা : নব্বইয়ের নিরীক্ষা, *নান্দীপাঠ*, পৃ. ৪৪৫)

মোট কথা, আধুনিক বাংলা কবিতার কালানুক্রমিক ধারায় বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকের কবিতায় এসেছে বিজ্ঞান, মনন, লোকজ ঐতিহ্যপ্রীতি ও নিরীক্ষা প্রবণতা। এই দশকের কবিদের মধ্যে ভিন্ন স্বাদের রসব্যঞ্জনা বর্তমান। এঁরা বুদ্ধিনির্ভর পরিণত নিখুঁত প্রকরণ সচেতনতায় অন্যদের চেয়ে অগ্রসর। তাঁদের চপলতা ঠাট্টা তামাশার আড়ালে আছে কবিতা নির্মাণের সূক্ষ্ম কলাকৌশল। শব্দকে আঞ্চলিক গন্ধ দিয়ে, গভীর বিষয়কে হাল্কা মেজাজে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে

সাম্প্রতিক জীবনের ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্যতাকে আঘাত করার মধ্য দিয়েই তাঁদের আনন্দ। টানাগদ্যের কবিতা যে নিছকই গদ্য নয়, তাতে আছে অন্তর্লীন ছন্দ ও বাক্যাতীত রহস্যঘনতা নব্বইয়ের কবিদের কবিকর্মে এই সত্যটি উপলব্ধি করা যায়। তাই নব্বইয়ের কবিদের কবিতা পাঠ করে ষাটের দশকের কবি সিকদার আমিনুল হক মন্তব্য করেছেন এভাবে :

> যাঁরা যত বেশি পড়বেন আমরা ধরে নেব তাঁরা ততো বেশি প্রস্তুত। যাঁরা যত বেশি নির্জন তাঁদের অনুভূতি আর অনুভবের শক্তি ততোই তীব্র। যাঁরা প্রবিষ্ট হয়, তাঁদের প্রজ্ঞা ততো বেশিই পরমকে জানে। পৃথিবীর কঠিনতম কাজগুলোর মধ্যে কবিতা লেখা সম্ভবত একটি; এটি তরুণ মনে বিশ্বাস করানো কঠিন। চৈতন্যকে প্রতিনিয়ত কঠিন আঘাতে রক্তাক্ত করার নামই শিল্পচর্চা-কাব্য জীবন কখনই মসৃণ কিংবা রৌদ্রময় নয়। ঝড় তার নিত্যসঙ্গী। এটা যতো ভাবা যায়, ততই বুঝবো তার আত্মদর্শন খাঁটি। (সিকদার আমিনুল হক, *সিকদার আমিনুল হক রচনাবলী*, পৃ. ৫১৯)

প্রকৃতার্থে ষাটের দশকের কবি সমালোচক সিকদার আমিনুল হকের পক্ষেই নব্বইয়ের দশকের কবি ও কবিতা নিয়ে এরকম সাহসী সত্য উচ্চারণ সম্ভব ও বাস্তব।

নব্বইয়ের দশকে উল্লেখযোগ্য কবির সংখ্যা অনেক। বর্তমান কবিতার সংসারে তাঁদের বিচরণ অবাধ। অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর নিরিখে নব্বইয়ের দশকের অনেক কবির কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ তেমনভাবে দেখা যায়নি। সে কারণে অনেক কবিকে আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। প্রেক্ষিত বিবেচনায় নব্বইয়ের দশকের খ্যাতিমান কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, মুজিব ইরম এবং রহমান হেনরীর কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের অনুষঙ্গ ব্যাপক। এ ছাড়া আলোচ্য অভিসন্দর্ভের কালপরিসরে এ দশকের কবিদের অনেকেরই গ্রন্থ বের হয়নি; এমন কি এঁদের অনেকেরই কাব্যপ্রচেষ্টা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেনি। এ কারণেই এ দশকের উল্লেখযোগ্য এ তিনজন কবিকে নিয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর (জ. ১৯৬৮) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম: *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য* (১৯৯৬), *ত্রিণাচিকেতের নাচ* (২০০২), *কিম্ভূত হবার কথা ছিল* (২০০৫), *প্রজন্ম লোহিত* (২০০৭), *আড়ম্বর* (২০০৮), *বিতিকিচ্ছিরি লাইফ যাচ্ছে* (২০০৮), *প্রিয় মধ্যবিত্ত আমি কিন্তু ডাকছি আসুন* (২০১০), *জগৎ-ভ্রমিয়া...* (২০১১), *গোধূলির নুড়িশস্য* (২০১৩) প্রভৃতি। বর্তমান প্রজন্মের একজন নিবেদিতচিত্ত ও শিল্পসচেতন বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকের কবি হলেন বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। এই কবির আত্মপ্রকাশ মননধর্মী সৃজনশীলতার পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে :

> নব্বইয়ের কবিদের মধ্যে কাব্যভাষা ও বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতা। নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিটি কবিতায় বিশিষ্ট করে রাখছেন তিনি। তার কবিতাতে পাওয়া যাবে অবচেতনলোকের চমকপ্রদ উদ্ভাসন। শব্দব্যবহার, বাকপ্রতিমা নির্মাণ ও ছন্দমিলের বিচিত্র নান্দনিক ব্যবহারও লক্ষণীয়। তার কবিতাকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে ফেলে তাই ব্যাখ্যা করা সত্যি দুরূহ। কেননা একটি কবিতা থেকে অন্য একটি কবিতায় নিজেকে ক্রমশ অতিক্রম করে চলেছেন তিনি। (মাসুদুজ্জামান, বিম্বিত আয়না থেকে, পথিকেষু... বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতার একটি ব্যক্তিগত পাঠ, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১২)

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য* (১৯৯৬) শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর কবিভাবনাকে সনেটের রূপকর্মে বেশ সচেতনতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। শহীদ ইকবাল *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস* (২০১৩) গ্রন্থে বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিমানস প্রসঙ্গে লেখেন :

> বায়তুল্লাহ্ কাদেরী প্রচ্ছন্ন থাকেন সংগুপ্ত শব্দপ্রতিমার প্রক্ষেপণে। সনেটের খুব যথোচিত চর্চা, একালে কঠিন, দুরূহও– আমাদের একালের প্রযুক্তি-বিশ্বে। কিন্তু এর কার্যকারিতা প্রকৃতকবির দস্তর। বায়তুল্লাহ্র প্রকৃতি-প্রেম-জৈবিকতা দুর্দান্ত, সে প্রমাণে– তার কবি-বিবরণীতে। (শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, পৃ. ২৬৭)

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী মূলত নব্বইয়ের দশকের আন্দোলিত শিল্পশীলিত কাব্যভাষারই পরিচ্ছন্ন নিপাট নিবিড় যাজক। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্ত অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে বাংলা কবিতার ভুবনে তাঁর পরিশীলিত দীপ্ত পদচারণা বেগবান :

> রহস্যময় ও দুর্বোধ্যময় জগত থেকে কীভাবে কবিতার জন্ম ও শিল্পের জন্ম হয় কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতা পড়লে উপলব্ধি ঘটে আমাদের। আর এ কারণেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তিনি সমসাময়িক কবিদের অতিক্রম করতে প্রয়াসী হন। (আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত, *অমিত্রাক্ষর*, অমিত্রাক্ষরের কথা)

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত নব্বইয়ের দশকের কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিসত্তা একুশ শতকে এসে সগৌরবে বিকশিত হয়। তাঁর কবিকর্মে প্রস্ফুটিত হয়েছে চিন্তাযুক্ত কারুখচিত শিল্পভাষ।

বর্তমান সময়ের মননঋদ্ধ শ্রেষ্ঠ কাব্যতত্ত্ব-বিশ্লেষক বেগম আকতার কামাল প্রতিভাবান কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কাব্যযাত্রার বিচার বিশ্লেষণে অভিমত ব্যক্ত করেন :

> এই কবি শুরু থেকেই নির্মাণরীতির পরিচর্যাঋদ্ধ, প্রমাণ শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য। সনেটের মাপা বাঁধনে তিনি শীত, বর্ষা ও অন্যান্য ভাববস্তু নিয়ে গঠনসৌকর্যে অনুশীলন করেছেন নিজ কাব্যকৃতিকে। সনেট মন্ময়ভাবের তন্ময়রূপের কবিতা। শীত-বর্ষা প্রপঞ্চ নিছক প্রকৃতিপ্রীতি নয়, নিজের অন্তর্সত্তার অনুষঙ্গী হচ্ছে ঐতিহ্য-স্বদেশ-লোকায়ত-জাগতিক জীবনপরিসর। (বেগম আকতার কামাল, বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কাব্যযাত্রা : চিন্তাভ কারুবাসনা, *উলুখাগড়া*, পৃ. ১১৮)

শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য (১৯৯৬) শীর্ষক গ্রন্থের শীতাভ সনেটগুচ্ছ অংশে স্থান পায় মোট তেরোটি সনেট। এই শিল্পভাষিক কাব্যগ্রন্থ বিনির্মাণে বায়তুল্লাহ্ কাদেরী ষড়ঋতু ভাবনায় বিভোর ছিলেন না, আবার ঋতু সংকীর্তনেও তিনি পুরোপুরি পরিব্যাপ্ত ছিলেন না। এই কাব্যের সনেটগুচ্ছে শীত ও বর্ষা ঋতুর বর্ণনা এসেছে তাঁর কাব্যে ধ্রুপদী ও লোকায়ত জীবনের প্রতীক হয়ে। শীতকে তিনি দার্শনিক প্রতীতীতে স্থান দিয়েছেন। আবার শীতের প্রতীকে তিনি গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সংগ্রামশীল জীবনের প্রাত্যহিক রূপ নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। এক আলাপচারিতায় বায়তুল্লাহ্ কাদেরী এই প্রসঙ্গে চমৎকাররূপে তাঁর উপলব্ধিজাত শিক্ষকসুলভ প্রাজ্ঞ ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন :

> শীতাভ সনেটগুচ্ছ নামক সনেটগুলোতে শীত একটি প্রতীক। তবে একক প্রতীক নয়, বাঙালি জীবনে শ্রেণীচেতনার, জাতিগত পরিচয় এবং জাতিরই পিতৃ-পরিচয় বিধৃত এ প্রতীক সমগ্র জীবনাভিজ্ঞতার এক প্রবল দার্শনিকতারই নামান্তর। বলা প্রাসঙ্গিক, শীত ও বর্ষা এখানে ঋতু হিসেবে আসে নি। আমাদের সাহিত্যের বারমাস্যার চেতনাটি এখানে গৃহীত, ঋতুবর্ণনা নয়। কারণ শীত এবং বর্ষার মধ্যেই যে জীবন বলয়িত, সেটিই মুখ্য। ... শীত হল বাঙালির শিল্প-সমন্বিত, দার্শনিক প্রজ্ঞায় জারিত এক ক্লাসিক জীবনের প্রতীক। এর ভাষায় এসেছে ক্লাসিক সমুন্নত ভঙ্গি; এর জীবনটিও সংগ্রামে-দর্শনে-চিন্তনে-বাঙালিত্বে বহুপ্রান্তস্পর্শী চেতনায় ধ্রুপদী। ... অন্যদিকে 'বর্ষাতী সনেটগুচ্ছ' হয়ে উঠেছে লোকজীবনের আরেক প্রকাশরূপ। পাশাপাশি এর ভাষাও প্রাকৃত স্তরের কাছাকাছি। এর বিষয় লোকজীবন, লোকমিথ প্রভৃতির মধ্যে নিহিত। (উদ্ধৃত : কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৫৯)

উপর্যুক্ত কথোপকথনে বাঙালির লোকায়ত জীবনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর চিন্তন প্রক্রিয়ার স্পষ্টতা মুখ্য হয়ে ওঠে। তারই অনুরণনজাত কাব্যভাষা পরিস্ফুট হয়ে ধরা পড়ে তাঁর ব্যক্ত চরণযুগলে :

> শীত হলো সক্রেটিস, পাশাপাশি সত্যদ্রষ্টা কবি/মহান বাল্মীকি শীত। তার ঠোঁটে হেমলক, বুকে
> ব্যাধের নিষ্ঠুর শর। শোনো শীত, তুমিই গয়বী/শিক্ষক আমার, মূর্খ পুলিশেরা তোমার মৃত্যুকে
> তাড়িয়ে বেড়াক, আমি তো জেনেছি প্রিয় ঐ ঠোঁটে/বিষ নয়, সত্যের মহিমা রোজ ক্রৌঞ্চ হয়ে ফোটে।
>
> (শীত : তিন, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ১৮)

উপর্যুক্ত সনেটাংশে বায়তুল্লাহ্ কাদেরী শীতকে সৃষ্টি-আভায় ও দর্শনজাত জায়মান চেতনায় সত্যকে উপলব্ধি করার গভীর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আবার শীত ঋতুর প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনায় কবি মধ্যবিত্ত মানুষের শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিদিনের ধূলিমলিন যাপিত জীবনের অবয়ব অবলোকন করেছেন নিম্নোক্ত চরণগুলোতে :

> শীত-ই আমার সব, আমার অমোঘ গুরু, বস,/আমি তার অধস্তন কর্মচারী, শীত এলে ঠিক
> কর্মখালি বিজ্ঞাপনে আমার চেহারা ভাসে, ধস/নাম বন্ধ হয় হৃদয়ের, ঠেকে সত্যের শালিক
> হাতের তালুতে, তাই শীতের বিবস্ত্র দেহ থেকে/ফেরে না আমার চোখ, আত্মা শুধু শৈত্য হতে শেখে।
>
> (শীত : পাঁচ, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ১৯)

শীতকেন্দ্রিক শেষ সনেটে কবি শীত ঋতুকে পথপ্রদর্শক হিসেবে অভিহিত করে বারবার মৃত্যুযন্ত্রণায় তাড়িত বাংলাকে প্রাণের সঞ্জীবনী অনুরণন তুলতে আহ্বান করেছেন। এখানে শীত নিবিড়ভাবে আবর্তিত হয়েছে বংশীবাদক এক রাখাল হয়ে। এই রাখাল আর কেউ নয়, আদি বাঙালির মিথ-নায়ক কৃষ্ণ। বলা যায়, সৃষ্টিশীল লড়াই-ত্যাগ ও তিতীক্ষায় এবং দর্শনজাত বহুমাত্রিকতায় কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরী শীত ঋতুকে কোনো এক বা একক নিশানায় নয়, নানান বর্ণচ্ছটায় শীত তাঁর কাব্যে একটি পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ স্ফটিকের আদলেই বহন করেছে একগুচ্ছ দর্শনস্নাত চিহ্নিত শব্দপ্রতিমা :

> কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরী জীবনবোধের অন্তর্গত তাড়নায় লোকায়ত ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হন। বাংলার শীত ও বর্ষা ঋতুর প্রাকৃতিক চারিত্র্য এবং লোকসংস্কৃতির নানা বৈভবের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অনুবর্তনে তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে জীবন ও শিল্পের ভিন্নতর মাত্রা। লোকপুরাণের বেহুলা, লখিন্দর, মনসা, চাঁদ সওদাগর ও লোহার বাসরঘর ভিন্ন ভিন্ন রূপব্যঞ্জনায় কবির শিল্পভাবনার অন্তর্ভুক্ত হয়। লোকায়ত প্রেমের চিরায়ত মাধুরী নিয়ে কৃষ্ণ-রাধাও তাঁর শিল্পসংসারে স্থিতি পায়। লোকযান নৌকা, লোকবাদ্য ডমরু, লোকাচারের বর্ষামঙ্গল ঘট, লোককবি লালনের অধ্যাত্ম-চেতনা, রূপকথার রাক্ষস, হীরামন, শুকপাখি, সুঁচরাজা, উপকথার শেয়াল-কুমির ইত্যাদি লোকায়ত অনুষঙ্গের সারাৎসার তাঁর শিল্পভাবনাকে ঐতিহ্য-সংলগ্ন সজীবতায় স্থিতি দান করে। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩৮৯)

বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর প্রথম কাব্যের অভ্যন্তরেই তিনি জানান দিলেন লোকসম্পদে ভরা এই ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ বাংলা। ভারতীয় উপমহাদেশের এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানব প্রজাতিও একই আদলে গড়া। প্রকৃত অর্থে তরুণ প্রতিভাবান কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিসত্তাও স্ফূরিত হয়েছে লোকসঞ্জাত আবহমান বাংলার সমগ্র জীবন ঘিরে।

শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য তাঁর প্রথম কাব্যের দ্বিতীয় অংশ বর্ষাতী সনেটগুচ্ছে ঠাঁই করে নেয় মোট চৌদ্দটি সনেট। গ্রামবাংলার লোকসঞ্জাত জীবনবাস্তবতার নানামাত্রিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গকে ভিত্তিমূল করে বর্ষাঋতুও বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর আলোচ্য কাব্যে একক কোনো প্রতীকস্বরূপে পল্লবিত ও বিকশিত

হয়নি। *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য* কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ, বেহুলা-লখিন্দর, নটরাজ, সীতা-দ্রৌপদী, ইউসুফ-জুলেখা, দুলদুল, ইস্রাফিল প্রভৃতি লোকজমিথ এবং পুরাণাশ্রিত ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত লালিত বিশ্বাস চমৎকাররূপে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালির মনে মননে বদ্ধমূল ধারণা, হাজার বছরের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য লোকমিথ হিসেবে তাঁর এই কাব্যের বর্ষাতী সনেটগুচ্ছ অংশে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে :

১. কেমন দৌরাত্ম্যপ্রিয় বর্ষা, বন্ধু-বান্ধবের মাঝে/নিজেকে প্রকাশ করে লোমশ কদম্বে, পালহীন
নৌকার মতন ঘাস-ধান-জল ভেঙে এ অচিন/পৃথিবীতে ভেসে যায়, আর সত্তাময় নিজে বাজে
ডমরুর মতো; পৃথিবী নমিত হয়ে আসে তার/নৃত্যের মুদ্রায় : বর্ষা আমাদের প্রিয় অবতার।

(বর্ষা : দুই, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ২৭)

২. গ্রাম্য এ লোকজ বর্ষা কলার ভেলায় চড়ে দেখি/কোথায় চলেছে ভেসে, পাশে তার শায়িত পুরুষ
বৃষ্টির ফোঁটার মতো ভগ্নপ্রায়, বাসনার তুষ/শুধু এক জ্বলছে বর্ষার মনে : এই লেখালেখি
কখন থামিয়ে দেবে মেঘ এসে, বলবে ঘরের/মধ্যে বন্দী তুমি, যতো পারো গড়ো লোহার বাসর
সূচীভেদ্য অন্ধকারে, একদিন তোমার হাশর/তোমাকে দেখিয়ে দেবো বৃষ্টিময় প্রলাপে, জ্বরের।

(বর্ষা : চার, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ২৮)

৩. এমনই বর্ষার তীর বিদ্ধ করে রাধিকা রঙের/আমার এ প্রিয় দুলদুল, কষ্টার্জিত নদী ঝরে
বিবশ আঙুলে, কোথা গো রঙিন কৃষ্ণ, চরাচরে/বুঝি তুমি ইস্রাফিল, আমার বুকের কিয়ামত
ওঠাও বাঁশিতে? যেদিন বাতাসে শুধু মো'রমের/চাঁদ, জানবে আমার বাড়িতে সেদিন জিয়াফত।

(বর্ষা : সাত, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ৩০)

উপর্যুক্ত সনেটগুচ্ছে বিধৃত হয়েছে লোকায়ত জীবনে বর্ষাঋতুর গভীর ব্যঞ্জনাসঞ্চারী প্রভাব। বর্ষার প্রভাবে সারাবাংলার বিস্তৃত মাঠ মাটি মানুষ চিরনতুন, চিরসবুজ, প্রাণবন্ত ও ফলবতী হয়। সবুজে কোমলে শ্যামলে মাটির মমতারসে প্রকৃতি স্নিগ্ধ ও আচ্ছাদিত হয়। গ্রামীণ জীবনে সংগ্রামশীল জনমানসের মনে মননে ও দেহে বর্ষার আবাহন গীত পুনঃপুন দৃশ্যমান হয় :

ভুলেছি আমার দায়, আমি হায়, বিমূঢ় পুরুষ,/কেশাকর্ষণের দিব্যি গেছি ভুলে! রমণীমোহন
সেজে লুটেছি সম্ভ্রম এ-বর্ষার, সময় দোহন/করে নিয়ে গেছি তার, খরার লোলুপ আরোহণ
আমার শরীরব্যাপী, জাগেনি তো নতুন বোধন/এ-আত্মায়, জেগেছিলো বলিহারি রতির জলুস।

(বর্ষা : ছয়, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ২৯)

লোকায়ত ঐতিহ্যানুসারি এবং ঐতিহ্য অনুসন্ধানী ও শিকড়-আভিমুখ্য কবি হলেন বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। লোকজীবন এবং আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করে তার মধ্যে দার্শনিক প্রতীতী সঞ্চার করেন তিনি। বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতায় লক্ষ করা যায় দার্শনিকতাকে টেকনোলজির সঙ্গে অঙ্গীকৃত করার উন্মুখ প্রচেষ্টা। তাঁর প্রথম রচিত কাব্যে 'লোকায়ত জীবন, উপনিষদীয় তত্ত্ব ও টেকনোলজি সমীকৃত হয়েছে সমকালীন চেতনায়।' (বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *কাব্যসমগ্র*, ফ্ল্যাপ) বায়তুল্লাহ্

কাদেরী তাঁর নিজের কবিতার ব্যাখ্যা-বয়ান করেছেন দীর্ঘ আলোচনায়। কবিতার জটিলতন্ত্র উন্মোচনে সহায়িকা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি সত্তর ও আশির দশকের কবিদের নির্মাণভাবনার বিচার-বিশ্লেষণেও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর :

> দেখেছি, অগ্রজদের কবিতায় প্রেম আছে, স্বদেশ আছে, আন্দোলন আছে, মানুষ আছে, যন্ত্রণাও আছে কিন্তু নেই সর্বৈব জীবনচেতনাজাত সামগ্রিক দার্শনিকবোধ– যা দিয়ে চিহ্নিত হতে পারেন। আবার দার্শনিকবোধ বাংলা কবিতায় দূর অতীতেও যে ছিল না তাও নয়; তাহলে কীভাবে আলাদা হব? ভাবলাম : জীবন সম্ভবত দুরকম : অন্ত্যজ ও ধ্রুপদী। চাইলাম এ-দুয়ের সমন্বয় কবিতায় আনতে। আর একারণে আমার দু-জীবনের উপযোগী একটি ভাষাভঙ্গি আবশ্যক। একই আমি অন্ত্যজ এবং ধ্রুপদী জীবনকে দিতে চাই একটি সর্বৈব রূপাবয়ব। *শীতাভ সনেটগুচ্ছ* ও *অন্যান্য* গ্রন্থের লোকজ জীবনের জন্য সুবিধাজনক একটি ভাষা খুঁজতে গিয়ে দেখি হুবহু আঞ্চলিক ভাষা-ব্যবহাররীতি ব্যবহৃত হয়ে গেছে। বরং যেটি আশ্চর্যজনকভাবে নেই আঞ্চলিক শব্দজাত প্রতীক, যে গুলো আমাদের আবহমান সমাজচেতনার অংশ হিসেবে ওতপ্রোত, যা আমার ঈপ্সিত চেতনার ইঙ্গিতবহ হতে পারে। বাঙালি জীবনের স্থিতাবস্থাকে ধীরগামী কচ্ছপ (কাউট্টা), রাশি রাশি ধানের সারি যা উঠোনময় পা দিয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছে খেটে-খাওয়া ধানহীন গ্রাম্য নারী, পাশেই হয়তো তার সন্তানটি কৃমিময় পেটসার কঙ্কালিত এ ধানের প্রতীক কৃমি (যির); পিতৃ-পরিচয়হীন বাঙালির সন্ধিগ্ধ জাতিত্বপরিচয়কে 'রবারের মাছ', শীতাভ সনেটগুচ্ছ প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশ করেছি। সুতরাং ভাষাটিও হয়েছে প্রাকৃত স্তরের ভাঙা বাংলা ভাষার সঙ্গে আধুনিক প্রচল ভাষারই একটি সমন্বয়-কৃত ভাষা যা আমার অন্ত্যজ জীবন ও ধ্রুপদী জীবনকে একই সঙ্গে বিধৃত করতে পারবে। (উদ্ধৃত : কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৫৫-১৫৬)

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন। সেই সময় তিনি কুমিল্লা থেকে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বারবার বিচরণ করেছেন। চট্টগ্রাম শহর, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, বায়েজিদ বোস্তামী (র.) এর ঐতিহাসিক মাজারে দর্শনীয় কচ্ছপ প্রভৃতি কৌতুহলী দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। এই সময়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন বাঙালির মনে গেঁথে যাওয়া লোকবিশ্বাসের ছবি। আমিনুর রহমান সুলতানের সঙ্গে কবিতাবিষয়ক কথোপকথনে বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সমাজ-চিন্তনক্রিয়া স্পষ্ট হয় এভাবে :

> বাঙালি সমাজ ও কালচেতনাকে আমি লোকজ ফর্মে কীভাবে প্রকাশ করেছি সেটা দেখা যাক। একটি বিসদৃশ কচ্ছপ (কাউট্টা) উঠে আসছে সর্বব্যাপী; সে গ্রাস করতে চায় চৈতন্যকে। আবার এ শ্রেণীবিভাজিত সমাজে চর্যার কচ্ছপকে (দুলি) আমরা ভুলি কীভাবে– কাউট্টা দেখি/ধীরে ধীরে ধীরে চলছেই ধীরে/বাড়ির ভিতর থেকে বাড়ির/বাহিরে, আজীবন এক/ কাউট্টা ধীর পদার্পণে চলছে,/চলছে বিষম কুঁজো এক কালো/কাউট্টা,/খাতার মলাটে ওঠে কাউট্টা/অবশেষে বইয়ের তাকে/কিংবা কখনো/একদল মেঘ পিঠে বয়ে নেয়/বুড়ো কাউট্টা, দেয় না তেমন/দুগ্ধ, দেয় না। কাউট্টার দুগ্ধে/ভরে না পাতিল। [দেহরজ্জু, শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য] কিন্তু পরের চরণেই অকস্মাৎ এলো আমাদের লোকচেতনা ও ধর্মবিশ্বাসের এক

অনিবার্য প্রসঙ্গ– এ কোন্ শহরে এসে থেমে গেল কাউট্টাসহ/এ কোন্ শহর?/কন্ডে যাইয়ুম আঁই অবেলায়! কন্ডে যাইয়ুম? [দেহরজ্জু, শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য] লক্ষ করার বিষয়, কচ্ছপের ধীর পদক্ষেপের মধ্যে হঠাৎ 'এ কোন্ শহরে'র উল্লেখ এবং এর বিশেষ ডায়ালেক্টই বলছে এটি চট্টগ্রাম। বোস্তামির কচ্ছপের শহরও। চট্টগ্রামের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এবং বোস্তামির নাম উল্লেখ না করেও এর কচ্ছপের ঐতিহ্য আমাদের ধর্মবোধ ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে একীভূত। সুতরাং সমগ্র কবিতায় একটি দর্শনলব্ধ চেতনার প্রকাশে কাউট্টা প্রতীকটির এ ব্যবহার নতুন বৈকি! (উদ্ধৃত : কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৫৬-১৫৭)

'মানুষ পাখির মতো অতি ক্ষুদ্র হবে যে তখন' অংশে বায়তুল্লাহ্ কাদেরী অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন লোকায়ত জীবনদর্শনকে সম্পদ করে। 'ধানকৃমি' কবিতাটি তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বায়তুল্লাহ্ কাদেরী নিজেই ব্যক্ত করেছেন :

ধানকৃমি কবিতায় গ্রাম্য খেটে খাওয়া নারীর অন্যের উঠোনে ধান সিদ্ধ করা, ধানশুকানো (যার ধান নেই, আছে পাশেই ধুলোয় নিমজ্জিত কৃমিময় পেটসার কঙ্কালিত সন্তান) তার কাছে পা-দিয়ে গোল করে নেড়ে দেয়া ধান যেন যিরেরই (কৃমি) নামান্তর। এ পরজীবী 'যির' শ্রমজীবী মানুষের সম্পদের সুষম বণ্টনের প্রতিবন্ধক শোষক-সমাজ যেন– ডোলের ভিতরে এখনও কৃমির সারি, ধানকৃমি।/সমস্তরাত ধান হিজানের গন্ধেতে ভারি/এই রমণীরা, দুধ ভারি হলো বাষ্পে, গরমে;/ওদের সন্তানেরা যিরের ওষুধ খেয়ে উঠোনেতে/হাগতে বসেছে, যির নামবার সুদীর্ঘ/অপেক্ষায় রয়েছে প্রতিটি বাচ্চা।/এখানেই থামি। ধানের সারিতে/কৃমি ভরে যায়, শুধু ধানকৃমি। [ধানকৃমি, শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য] (উদ্ধৃত : কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৫৬-১৫৭)

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী গ্রামীণ জীবনকে চমৎকার উপমায় বেঁধে ফেলতে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীর প্রতি তাঁর পরম মমত্ববোধের স্পষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়। কিশোর বয়স থেকেই কবি গ্রামকে পর্যবেক্ষণ করেছেন নিবিড় যাজক হয়ে। তাই প্রথম কাব্যেই তাঁর গ্রামবাংলার প্রতি প্রীতিময় ভাবনা প্রগাঢ় হয়েছে। তাঁর দেখা বিষয়গুলো অন্যচোখে ব্যাখ্যাত হয়েছে। মিথ বিষয়ে কবির দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবনা স্পষ্ট হয় তাঁরই জবানিতে :

আমি চেয়েছি মিথকেই শক্তি করে তুলতে। বলার বিশেষ বাকভঙ্গিতে চেতনার ভিতরেই মিথের রূপাবয়ব। সেখানে কবিতার উৎস ও আঙ্গিক মিথ, তবে তা গভীরতর পর্যবেক্ষণে; উপরিতলে এর প্রবহমানতা অনেকটা প্রতীকী। এরকম একটি দৃষ্টান্ত 'মৎস্যচৈতন্যে' কবিতাটি। আমাদের অস্তিত্বচেতনার সঙ্গে তার সংগ্রাম ও চলিষ্ণুতা, পিতৃ-পরিচয়হীনতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছি। পুরাণের মৎস্যগন্ধা ও দ্বৈপায়নের সঙ্গে আমি জুড়ে দিতে চেয়েছি আমাদের সমাজ ও চেতনাকে। (উদ্ধৃত : কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান, *অমিত্রাক্ষর*, পৃ. ১৫৮)

কবিসমাজ কখনো কখনো কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে অনেক কঠিন তত্ত্বের স্পষ্ট রূপ দিয়ে থাকেন। কবিতায় অনেক সময় দর্শনের ছবি জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে। কবিতা উপলব্ধির আগেই কবিতায়

ছবির জাদু মুগ্ধ করে দেয় পাঠককে। এই জাদুর গ্রাহ্যতা এক সর্বজনীন আকুলতায় প্রকাশ পায়। কবিতার শব্দমালায় এই জাদুই মূলত মিথ। যুগে যুগে মিথ নির্ভর হয়ে কবিতার রাজ্য এগোয়। কবিতার ছবিতে কবির উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতা মিথের স্পর্শ নিয়েই সর্বজনীন হয়ে ওঠে। কবিতায় মিথের ব্যবহারে বায়তুল্লাহ্ কাদেরী তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যেই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্যে বিচরণশীল ছিলেন বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। তাই তাঁর কবিপ্রতিভার স্ফূরণ থেকেই তিনি প্রজ্ঞার পরিচয় রাখতে সক্ষম হন :

১. বর্ষশেষে বর্ষামঙ্গলের ঘট তোলা হয়ে যাবে
আমার বাড়ির পাশে। কদলি বৃক্ষের সারি এনে
লাগাবো গৃহের কোণে, আমি এই বর্ষামন্ত্র মেনে
তোমাকে তুলবো ঘরে, যদি না ভাদ্রের ভাবে-সাবে
কোনো বীতরাগ দেখি, যদি চাঁদ সমস্ত উপুড়
করে আকাশকে ঢালে দুগ্ধ, মনে বুঝবে গো বামা
পাশেই রয়েছে নদী তৃষ্ণাতুর মেঘে-রৌদ্রে-ঘামা,
বর্ষাহীন শুকিয়েছে দীর্ঘ ঢ্যাঙা তোমার দুপুর।

(বর্ষা : তেরো, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ৩৩)

২. চম্পু লেখে একজন স্বর্গ নেন কিনে/চণ্ডীর আবর্তে ঘোরে লণ্ড চণ্ডীদাস
পারি নি এখনো আমি লালনের বিনে/ভবের দুয়ার থেকে ফেলতে নিশ্বাস

(কালজ, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ৩৭)

৩. কদম্বতলের এই/গ্রাম্যনর, কামমোহিতম রতিটানে
করে বেপরোয়া মোরে/অতঃপর চলিলুং আমি অর্ণববিহীন
সমুদ্রের জলে, এ নর করন্ত মোরে/অন্তহীন প্রগল্‌ভ যতিচিহ্নময় ছেদে-বিচ্ছেদে প্রগাঢ়,
তোমারে কহন্ত কত মা মনসা, গ্রাম্য/এ নরের বংশী মোরে করেছে নাগিনী।

(তোমারে কহন্ত কত, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ৩৮)

৪. অস্থির বিন্দ্র টাক নিয়ে সূর্যের উচ্চতা মাপে
প্রিয় এ প্রভাত, সওদাগর, দেখেছো কি
চাঁদের প্রদেশে বেনে চাঁদ আজো মনসাকে ভুলে?

(সওদাগর, *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য*, কাব্যসমগ্র, পৃ. ৪৯)

৫. উঠোনে নিবিড় সন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ টুপিগুলি নেড়ে
পঞ্চায়েত-মেল বসে, তীক্ষ্ণ চোখামুখ,
চিন্তাক্লিষ্ট শ্মশ্রু, পাশেই ধানের গন্ধ, খেড়, লেপা মাটি,
ঘর ওঠে, ঘর ভাঙে, বর্ষা নামে ভাদ্রের কৈয়ের মতো
কান্‌কা ভেঙে চলে যেতে যেতে কৈয়ের পিতৃত্ব শুষে নেয় মাটি,

কহেছি কি আমি সেই গপ্পো কোনদিন?

(মৎস্যচৈতন্যে, কাব্যসমগ্র, পৃ. ৫১)

মূলত, প্রথম কাব্যের মধ্যেই বায়তুল্লাহ্ কাদেরী বাংলার লোকায়ত জীবনযাত্রার ভেতরে দার্শনিক মীমাংসা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সঞ্জীবনী নির্যাস তাঁর কাব্যবস্তুতে পরিণত করেছেন। লোকজ প্রতীতী তাঁর মননে যে কী গভীরভাবে প্রোথিত ছিল, তার প্রমাণ লোকজ ও আঞ্চলিক শব্দ চয়ন : ঘুঁটি, ময়াল, খেড়, লেপা মাটি, হাগা, হিয়াল, ছাও, হেরে, শরীল, হিন্তাল, মাছ্যা, পৈখের বাচ্চা, মুরুইল ছাওয়া, মুরকা, ঠুণ্ডা, ঠাডা, কেউচ্চা, হাইঞ্জাবেলাকার, লেইত, দুফৈর, চেইত্যা, ফুডানি, তেউল্লাচোরা, বিলাই'র গু, ফুক্কি, কাউট্টা, পাওপ্পা গাছ, গয়াম গাছ প্রভৃতি। নব্বইয়ের দশকের শক্তিমান কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরী বাংলার গ্রামীণ ও লোকজজীবনের অনুষঙ্গ বিশ্লেষণে পৌরাণিক কাহিনির রূপকাশ্রয়ে দার্শনিকতার পরিচয় প্রদানে তিনি স্বতন্ত্র ও সার্থক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুজিব ইরম

নব্বইয়ের দশকের আলোচিত এবং উল্লেখযোগ্য কবি মুজিব ইরম (জ. ১৯৬৯)। তিনি মূলত লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক প্রথাবিরোধী লেখক। প্রথা ভাঙার যে তর্কবিতর্ক নব্বইয়ের দশকের লিটল ম্যাগ আন্দোলন হয়েছিল, সেই বাঁক বদলের সফল কবি মুজিব ইরম। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো : *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান* (১৯৯৬), *ইরমকথা* (১৯৯৯), *ইরম কথার পরের কথা* (২০০১), *ভাইবে মুজিব ইরম বলে* (২০১৩), *ইতা আমি লিখে রাখি* (২০০৫) প্রভৃতি। ফোকলোর বিশারদ শামসুজ্জামান খানের মতে :

> আমাদের পুরোনো লোকজ কাব্যরীতির ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতার ছোপ দেওয়া তাঁর আত্মকথনমূলক কবিতায় সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব এবং অভিনবত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। (*ভাইবে মুজিব ইরম বলে*, ভূমিকাংশ)

কবিতার শরীর নির্মাণ কৌশল বদলে দেওয়া, অন্তর্জাগতিক কাব্য স্পর্শকে পাঠকের মনে স্পন্দিত করা, নতুনভাবে বলা সবই মুজিব ইরমকে সার্থকতার পথ দেখায় তাঁর কবিতা :

> কবি মুজিব ইরম নগরবাস্তবতার যান্ত্রিকতা থেকে গ্রামীণ সজীবতায় স্বপ্নযাত্রার মাধ্যমে লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির ঐতিহ্যমূলে স্বীয় শিল্পচেতনাকে প্রসারিত করেন। গ্রামবাংলার আঁতুড়ঘরকেন্দ্রিক লোকাচার এবং কৃষিশ্রমিকের মুখ থেকে শোনা লোকগান ও কিচ্ছার স্মৃতি কবির আবেগ-চেতনাকে আবিষ্ট করে। প্রকৃতির নদী, ধলা-মুথা-ঘাস ও তুলসী বৃক্ষের ঔষধিগুণ তাঁকে নিরন্তর গ্রামীণ জীবনের প্রশান্তিময় সান্নিধ্যে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। আর লোকপুরাণের লখিন্দর, লোকমেলার আনন্দময় আবহ, লোকশিল্পকলার মাটির পালকি, সুরেলা বাঁশি ইত্যাদি লোতায়ত উপকরণ তাঁর শিল্পবোধের সজীবতাকে কবিতায় শিল্পিত করে। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩৮৯-৩৯০)

তরুণ বয়সেই নগরজীবনের ক্লেদ ক্লান্তি হতাশ করেছে মুজিব ইরমকে। তাই তিনি ফিরে যান গ্রামবাংলায়। গ্রামীণ সংস্কৃতি ঐতিহ্য তাঁকে বিমোহিত করে। তিনি অবিরাম ঐতিহ্যিক-ভাষা ব্যবহারের পথে হাঁটছেন। সর্বোপরি, আধুনিক বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা যোজনা কাব্যনির্মাণে বাঁক বদল ঘটিয়েছেন।

মুজিব ইরমের কবিতার শরীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলার লোকঐতিহ্য, লোকসংস্কার ও গ্রামীণ পেলবতা। মুজিব ইরমের গ্রন্থের নাম ও গঠনের ভেতর লুকিয়ে আছে অতীত বা লোকায়তে যাবার ইঙ্গিত। *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান* (১৯৯৬), *ইরম কথা* (১৯৯৯) দু'টি কাব্য আমাদের তাড়িত করে অতীতে চোখ ফেরাতে। তাঁর কবিতার ভেতরও পেছন ফেরা লক্ষ করা যায়। প্রকৃত অর্থে মুজিব ইরম পেছনফেরার দলে। অতীতের টানে, লোকায়ত গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকাচার সব কিছুকে প্রতিনিয়ত ধারণ করে চলেছেন তিনি। হৃদয় সূত্রকেই তিনি কবিতায় মূলত

প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন। নিজেকে এবং নিজের চারপাশ বুঝতে চেয়েছেন ঐতিহ্যিক ভাষা প্রবণতার সাহচর্যে। তাঁর কবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্চারণে মিশে আছে বাউলের দোলা।

প্রত্যেক কবিই চেষ্টা করেন নিজস্ব ভাষা বা স্বর তৈরি করতে। সেই ভাষা ও শৈলী থেকে সেই কবিকেও অতি সহজে চিনে নেওয়া যায়। কবিরা এই ভাষা বা স্বর তৈরি করতে সমর্থ হন বিভিন্নভাবে, কেউ অতিপরিচিত জানা শোনা চারপাশের উপাদান থেকে রসদ নিয়ে তার নিজের মেধা মননের সমন্বয়ে তৈরি করেন সক্রিয় কাব্যভাষা। মুজিব ইরমও তেমনি চেয়েছেন নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি করতে। তবে কতটুকু সার্থক তার চেয়ে দেখার বিষয় তার প্রচেষ্টা; ক্লান্ত নন তিনি। তাঁর কবিতায় প্রচলিত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে নতুন সমীক্ষাধর্মী গদ্যভাষা ধারার কাব্যশৈলী নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়; মুজিব ইরমের কবিতায় ধ্বনিময়তার প্রাবল্য স্পষ্ট। তিনি গ্রামবাংলার অপরিহার্য বিষয়গুলোকে দরদের সঙ্গে নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন যা থেকে পাওয়া যায় বুনো সুবাস, যা মনে করিয়ে দেয় পুরানো সহজ-সরল হারিয়ে যাওয়ার রক্তিম রঙিন দিনগুলি। মুজিব ইরমের শিল্পভাষা প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন :

> মুজিব ইরমের কবিতা যখনই পড়ি, মনে হয় আমাদের শান্ত ও নিবিড় উঠোন থেকে শূন্যে উড়াল দিয়েছে পাখি। দাঁড়ে আর সে ফিরবে না কোনোদিন; তবু পাখ সাট দিয়ে পাখি ফিরে আসে উঠোন সংলগ্ন গোধূলিমদির আকাশে। (তপোধীর ভট্টাচার্য, কবি মুজিব ইরমের শিল্পভাষা, *লেখাবিল*, পৃ. ৩)

মুজিব ইরমের রক্তে বয়ে চলে সিলেটের নালিহুরী গ্রামের আলো বাতাস, আর সেই নিজস্ব দেশ গ্রাম যেখান থেকে তিনি ধারণ করেছেন সেই সব হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার অমূল্য ধন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যতই পৃথিবী আধুনিকায়ন হোক না কেনো, মাটির টানকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। শুধু তাই নয় উপেক্ষাতো দূরের কথা, তাঁর কবিতায় একের পর এক শব্দমালা তোতা পাখির মতো একই বুলি আওড়ে যায়। মা, মাটি, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি। অর্থাৎ, পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে রচিত হতে থাকে তাঁর ভেতরে জমে থাকা কথা যা স্তূপাকার ধারণ করে। বুকের ভেতর যন্ত্রণা তিনি প্রকাশ করেন সহজ-সরল সিলেটের গ্রামীণ ভাষায়।

গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করতে মুজিব ইরম নকশী কাঁথার এক একটি ফোঁড়ের মতো তাঁর কবিতায় দেখিয়েছেন শব্দের মেলবন্ধ বা শব্দ কোলাজ। যেমন : মেঘবালা, মেঘবাস, মেঘমাস, রাতবৃষ্টি প্রভৃতি। যখন জয়জয়কার হচ্ছিলো উত্তরাধুনিকবাদ ও নয়া উপনিবেশিকবাদের সেই সময় মুজিব ইরমের কবিতা যেন নিজস্ব চিন্তাধারায় মগ্ন থেকে ডুব দিয়েছেন গ্রামীণ ও লোকাচার আর নিজেকে মায়ের কোড়কের মতো এক আবর্তন তৈরি করেছেন, তিনি থাকতে চেয়েছেন নির্ভেজাল। যেমন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর সবচেয়ে নির্ভয়ের, নিরাপদ স্থান তার মায়ের কোল। মুজিব ইরমেরও যেন

সবচেয়ে ভরসার জায়গা তাঁর সিলেটের নালিহুরী গ্রাম; সেই গ্রামের নদী, মাঠ, ঘাট, ভাষা লোকাচার– এসব কবিকে যেন মাতৃস্নেহে আবিষ্ট করে রেখেছেন তাই আধুনিক বা উত্তরাধুনিকবাদ বা নয়া উপনিবেশিকবাদ কবিকে তেমন নাড়া দেয় না। সে কারণে তিনি দেশ থেকে সুদূরে থাকলেও তাঁর প্রিয় দেশমাতৃকা থাকে তাঁর পিছু পিছু। স্মৃতিরোমন্থনে বারবার ভেসে ওঠে সবকিছু, অতি তুচ্ছ বিষয়গুলোও হয়ে ওঠে অত্যন্ত আদরের, যা বড় বেদনার মতো সুখ-দুঃখের অনুভূতি জাগায়। মুজিব ইরম যা বলে তা হয়ে উঠে সর্বজনীন ঘর ছাড়া মানুষের ভেতরের যন্ত্রণা,-শুধু কি ঘর? সেই ঘরে থাকে মা, ভাই-বোন আর প্রিয়তমার হাতছানি সেই ইশারা উপেক্ষা করা অসম্ভব সেই সাথে চলে আত্মানুসন্ধান। মুজিব ইরমের রয়েছে তাঁর চারপাশের প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে নিবিড় পর্যবেক্ষণ যা তাঁকে অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয় :

> অভিজ্ঞতার যে-কোনো আপাত-তুচ্ছ অনুপুঙ্খও কবিতা হয়ে উঠতে পারে। আজন্ম পথিক ইরম গভীর যাত্রাতীরে দাঁড়িয়ে কেবলই অচেনা ভাটির টান অনুভব করেন, বুঝতে পারেন, তাঁর যাত্রা শুধুই উজানে। তবু নিজস্ব দর্পণে ছায়া পড়ে দ্বিধা ও সংশয়ের : 'এ কেমন তৃষ্ণা যাত্রা কেবলি ঘুরে ফিরে মাতৃঋণ গাওয়া' মাতৃঋণ অর্থাৎ তাঁর আপন ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের পরম্পরা। (তপোধীর ভট্টাচার্য, কবি মুজিব ইরমের শিল্পভাষা, *লেখাবিল*, পৃ. ৫)

মুজিব ইরম প্রাধান্য দিয়েছেন সিলেট বিভাগের উপভাষা; যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর ব্যবহৃত উপভাষা কবিতায় মাধুর্য দিয়েছে :

> এর ফলে তার কবিতার আলাদা শৈলী আলাদা সুন্দর ভয়েস উন্মোচিত হয়েছে। খরস্রোতা মনুতীরের বাসিন্দাদের হৃদয়ের ভাষারও ঘনিষ্ঠ উপলব্ধি স্ফুট মুজিব ইরমের কবিতায়। (সারওয়ার চৌধুরী, ম.ই কেনো ইরম বা ক্যরিজম্যাটিক কবিতার গুপ্তমন্ত্র খোঁজ, *লেখাবিল*, পৃ. ১১)

অর্থাৎ, মুজিব ইরম প্রচুর পরিমাণে সিলেটের উপভাষা অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। যেমন অনায়াসে তিনি যাপন করতেন নালিহুরীর জীবন, তেমনি তাঁর সেই যাপিত জীবনের ডায়ালেক্টও লেপ্টে আছে কবিতার শরীরে, যা কবিতাকে মাটিগন্ধি করে তোলে। যেমন : নাইওরি, উজাইর মাছ, মানু, লাগ বিজ্বালা, হরলি ইত্যাদি আরো বহু শব্দ। 'সিলেটি নাগরি' একটি প্রতিষ্ঠিত ভাষা ছিল। আলাদা বর্ণমালা ছিল। পুথি পুস্তক প্রকাশ হতো। হযরত শাহজালাল (র.) এবং শ্রীচৈতন্য দেবের আমলে ওই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানেরা নাগরি ভাষায় ধর্মের কিতাব ও সাহিত্য চর্চা করেন বেশি। সিলেটি নাগরি লিপির কয়েকটি অক্ষর আফগান মুদ্রায় থাকতো :

> 'সোনাভানের পুঁথি', 'হরিণনামা', 'হুশিয়ারনামা', সফতুন্নবি', 'হালতুন্নবি', 'মহব্বতনামা' ইত্যাদি সিলেটি নাগরিতে লেখা জনপ্রিয় ছিল। বৃহত্তর সিলেটের বাইরে এ ভাষা চলতো কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা ময়মনসিংহ এবং আসামের কাছাড় ও করিমগঞ্জে। এসব অঞ্চলে সেই গীত, জারি, পুঁথির প্রভাব এখনও আছে। এখনও

হয় ভজন রোদন। (সারওয়ার চৌধুরী, ম. ই. কোনো ইরম বা ক্যারিজ ম্যাটিক কবিতার গুপ্তমন্ত্র খোঁজ, লেখাবিল, পৃ. ১২)

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যে শহরে এই সব লোকজ নানা বিষয় জড়িত সেখান থেকে বেড়ে ওঠা একজন কবির কবিতায় তাঁর প্রভাব পড়বে তা সুস্পষ্ট। মুজিব ইরম কবিতা লেখেন কখনো পয়ার ছন্দে, কখনো মুক্তক, আবার কখনো গদ্যের বর্ণনায়। তাঁর কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গগুলো। যা বারবার এসেছে, কবিতার পর কবিতা রচিত হয়েছে একই বিষয়কে তুলে ধরেছেন নানা দিক থেকে :

তার আগের কবিতা-কর্ম- সিঁড়িতে ভাষা ও উপলব্ধির একটা নহর বা বরিষণ-ধারা পরিলক্ষিত। ধারাতে, মানে মু.ই-র মাঝে চিরায়ত বাংলার আত্মানুসন্ধানের অতিরিক্ত প্রয়াস। তার কাব্য ভাষাতে ডায়লেক্টের মিশলে নব রূপ আছে, মানে ভাষার মিশ্রিতাবস্থার ভিন্নতর সৌন্দর্য সিঁড়ি আছে। (সারওয়ার চৌধুরী, মু.ই কেনো ইরম বা ক্যারিজম্যাটিক কবিতার গুপ্তমন্ত্র খোঁজ, পৃ. ১২)

তেমনি একথাও সত্য যে মুজিব ইরম আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে গ্রামীণ লোকাচারের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের অনিবার্য রূপ নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। সমালোচকের উক্তি এ বিষয়ে স্মতর্ব্য :

এক তরুণ কবি; মুজিব ইরম, মনে মনে নিয়ত ফিরে আসতে চেয়েছেন তাঁর নালিহুরী গ্রামে। এই যে আর্তি ও উচাটন, কবিত্ব এখানেই। আর সেই সঙ্গে সমস্যাও তৈরি হয় কিছু ঔপভাষিক শব্দের অনিবার্য গ্রাম্যতায় কেননা সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হলে সৌন্দর্য-বিধায়ক বক্রতা ব্যক্ত হতে পারে না। যেমন : 'এতো সব খবিসিতে হয়েছি ফয়রান' 'এসেছে প্রিয় মাস দূরে আছি বাজে সব খবিসের মাঝে' 'এমন স্বজনকাল কেটে যাবে, আমি রবো বইতল হয়ে। (তপোধীর ভট্টাচার্য, কবি মুজিব ইরমের শিল্পভাষা, *লেখাবিল*, পৃ. ৭)

সহজ স্বাভাবিকতায় মুজিব ইরম তাঁর কবিতার ভেতর বুনে দেন গ্রামাঞ্চলের ভাষা, যেখানে গ্রামীণ লোকাচার ও নিয়ম রীতির আশ্চর্য সুন্দর চিত্রপট পাওয়া যায়। বাংলার নিজস্ব সম্পদ হলো গ্রামীণ ও লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে শহুরে মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে দেন তিনি। কবিতা হলো অজানা অচেনা রহস্যালোক। এর সন্ধানে কবি তার পাঠককে টেনে নিয়ে যান। মুজিব ইরম গ্রামবাংলার লোকজ রীতিনীতির পরিচয়ের গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

মুজিব ইরমের কবিতায় পরশ লেগে থাকে বহুদিন গ্রাম ছেড়ে শহুরে ইট কাঠের বসবাসের মানুষের হৃদয়ে। সর্বক্ষেত্রে তাঁর যেন গ্রামের ভেতরেই বসবাস, স্মৃতিতে গ্রাম কিন্তু মনে হয় শহরকে আবৃত করা তার গ্রামজীবনের বর্ণনা। গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষগুলোর ভেতর প্রতিনিয়ত চলে ফিরে যাওয়ার বাসনা, ফেরাতো হয়ে উঠে না, তাই মুজিব ইরমের কবিতা জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের মতো, শহরের কঠিন জীবন প্রবাহে দু'দণ্ড শান্তির পেলবতা ছুঁয়ে দেয়। যা অতি প্রয়োজনীয় শহরবাসী ও ঘরছাড়া মানুষের জীবনে। সত্যি তাই মুজিব ইরম সমস্ত মেকিতা দূরে ঠেলে একান্তে মন ও মননকে

প্রশান্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর আত্মোপলব্ধিতে ধরা দেয় গ্রামীণ ও লোকজ ঐতিহ্যই পারে সবকিছুকে ছাপিয়ে ফেলে আসা হারিয়ে যাওয়া সময় ও অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাঁর কবিতায় বারবার ভজন সঙ্গীতের মতো চলতে থাকে নিজস্ব ঐতিহ্যের গুণকীর্তন।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যকে সামনে রেখে মুজিব ইরমের ভেতর দিয়ে আত্ম জিজ্ঞাসায় কথোপকথনের ফলে উঠে আসে তাঁর কবিতার উপাদান। তিনি যাপিতজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর কবিতার কাঠামোয় রূপান্তর করেন। মুজিব ইরমের কবিতা পাঠকের দেয় ফেলে আসা হারিয়ে যাওয়া মাঠ, মাটি আর শৈশব স্মৃতি। সেই স্মৃতিতে চলে ঘটে যাওয়া ঘটনার আরাম আনন্দ-বেদনা। মধুর সেই স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয়। লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সুন্দরভাবে কবিতায় উপস্থাপন করে মুজিব ইরম সাহিত্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর জন্মভূমি সিলেটের নালিহুরী যেন প্রতীক হয়ে ওঠে ঘরছাড়া মানুষের স্মৃতি চিহ্ন। আধুনিক জীবনের অস্থিরতা, ছুটে চলা, জীবন বাস্তবতা, ইট কাঠ কংক্রিট থেকে মুক্তি পেতে মুজিব ইরম চোখ ফেরান লোকায়ত জীবনাবরণের দিকে। তিনি পেছন ফিরে দেখেন শান্ত সুন্দর আবেশ যেখান থেকে উঠে আসা সেখানেই তো ফিরে যাওয়া, সম্ভব না হলেও ফিরে তাকানো চাই। আর সেই ফিরে তাকিয়েই তিনি খুঁজে পেলেন লোকঐতিহ্যের আখড়। পূর্ববর্তী অনেক কবি লোক সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার থেকে দু'হাত ভরে নিয়েছেন, কবি মুজিব ইরমও ব্যতিক্রম নয়। বরং বলা যায় তিনি নিয়েছেন, ফেলেছেন, ছেঁকেছেন। অনেকটা চক্রাকারে একই ঘটনা ঘটিয়েছেন বারবার। একই শব্দ, একই বিষয় নিয়ে রচনা করেছেন চরণের পর চরণ। বারবার বলেছেন মায়ের ভাষায়, মায়ের কোলের, মায়ের আদরের, মাটির গন্ধের কথা। তাঁর স্নায়ুতে বয়ে চলেছে নিজ দেশ-গ্রাম ও ভাষার স্রোত। শস্যভিত্তিক পরিশ্রমী শিল্পী, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ আবহে পরিপূর্ণ মুজিব ইরমের কাব্যসমগ্র। গ্রামীণ ও লোক জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়কে তিনি অত্যন্ত আপন করে দেখেছেন। তাই প্রতিটি বিষয় সমান প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান* এ তা স্পষ্ট। শিশু জন্মের পর নানা লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি চোখে পড়ে মুজিব ইরমের কবিতায়। দেখা যায় একজন নবজাতককে খারাপ নজর থেকে বাঁচাতে নানা রকম তাবিজ কবজ, মাদুলি, 'ভাঙা লাঙল আর ছেড়া জাল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী ইত্যাদির আয়োজন চলে। খারাপ দৃষ্টি বলতে বোঝানো হয় ভুত-প্রেতের নজর, অশুভ বা অশরীরী কোনো কিছু যা থাকে বটের গাছে, গাব গাছে, শেওড়া গাছে। এই সব নানা জাতের অশুভ আত্মারও চলে নানা উৎপাত যেমন 'ঢিল পড়ে টিনের চালে।' এই সব লোকবিশ্বাসের ফলে 'পিতার বাজার থেকে কালিবাউশ হল না কিনা' অর্থাৎ, মুজিব ইরম জীবন্তভাবে বর্ণনা করেছেন যা থেকে লোকবিশ্বাসগুলো আধুনিককালেও ভয়ের উদ্রেক করে:

পূর্ণিমা উঠানে মধ্যরাতে আলো খুঁড়ে একপাল অশরীরী ভেড়া। পুবের টিনের চালে ঢিল পড়ে, গাব গাছ দোষের প্রাচীর। এই ভয় ছিল মাগো যদি পায় অশুভ আছর! পিতার বাজার থেকে কালিবাউশ হল না কিনা। শেওড়া গাছের ভূত যদি সাথে আসে? কাটা হল তেঁতুলের প্রাচীন ছায়া। (আঁতুড়ভয়, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, পৃ. ১৫)

এভাবে 'নজর' কবিতাতেও দেখা যায় একই ধারাবাহিকতা। পাড়া প্রতিবেশীর কুনজর থেকে নিজ বাচ্চাকে বাঁচাতে বাচ্চার মা পড়া পানি খাওয়াতেন ও আল্লাহর কালাম ও নানা সূরা পড়িয়ে তা তাগা করে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। লোকাচার অনুযায়ী বৃদ্ধ ফকিরকে দেওয়া হতো লাল পালিত মোরগটি সেই সাথে বিদায় হতো কুনজরের হলাহল। ছেলেবেলায় যেমন মা তার সন্তানকে কুনজর থেকে বাঁচাতে নানা নিয়ম রীতি পালন করে কিন্তু এই বিশ্বাস থেকে যায় তাই সেই সন্তানের যৌবন বয়সেও মায়ের মন মানে না-ভীত সন্ত্রস্ত সহজ সরল মা অন্তরের বিশ্বাস থেকে যুবক সন্তানের জন্য নিয়ে আসেন নুনপড়া, পানিপড়া। কিন্তু ছেলের আপত্তি থাকে তাতে, অবুঝ মাকে ছেলে বোঝাতে পারে না যুবা বয়সে তার সন্তানের উপর যে নজর পড়েছে, তাতে তো শিশু বেলার পানি-পড়া, নুনপড়া বাঁচাতে পারবে না। এ যে বড় নজর যে নজরে জ্বলতে ও জ্বালাতে দুই সুখ। 'যে নজরে হরদম হৃদয় পোড়ায়।' সেই নজর কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে সেটা ভালোবাসার নজর।

মুজিব ইরম সুন্দরভাবে মায়ের জঠর থেকে যেমন প্রথম শিশু বের হয়ে আসে তাকে তুলনা করেছেন ফুটবলে হেড দেবার সাথে। এই কবিতায়ও দেখা যায় কিছু ধর্মীয় লোকাচার। মুসলিম রীতি অনুযায়ী এই কবিতায় খৎনা দেওয়ার উল্লেখ আছে যা থেকে একটি উৎসবমুখর দিনের পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটোবেলায় এই লোকাচারগুলো স্বচক্ষে গ্রামের লোকগুলোকে পালন করতে দেখেছেন তিনি। কবি নিজেও এই লোকাচারের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছেন। যা এখন তাঁর কাছে বড় অভিজ্ঞতা :

অমোঘ বিশ্বাসে আমার বাড়তি চামড়া যেদিন কর্তন হল- এখনো অনুভবে হাত রাখি-বুঝি না উৎসবে কী নৃশংস উল্লাস ছিল! সেদিন রক্তকে বড়ো ভয়, বড়ো ঘৃণা, বড়ো ভালো লেগেছিল। কিশোরীরা হাসছিল, রক্ত ঝরছিল আমার শরমিন্দা ত্বকে। (স্বপ্ন মাত্রার দীর্ঘশ্বাস, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ১৬)

লোকসংস্কৃতির সাথে সাথে মুজিব ইরমের কবিতায় উঠে আসে কল্পকাহিনি যেখানে থাকে 'কমলা রানীর উপাখ্যান'। লোকমুখে রটে যায়- পুকুর থেকে পাওয়া মুদ্রাভর্তি সোনা-রূপার ঘটিবাটি। রূপসী রানী রূপের আগুনে পোড়ে উপাখ্যানের রাজার মনপ্রাণ কিন্তু হাত বাড়িয়ে রাজা শুধু পায় রূপসী নারীর নিষ্প্রাণ চুল রূপসী হারিয়ে যায় জলের গহীনে। এই সব লোককাহিনি কবি হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নেয় যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ধারণ করেন নানি-দাদির মুখে মুখে :

সেই যে কমলা রানীর উপাখ্যান– উত্তাল দিঘি ফোঁড়ে বিশেষ দিবসে উঠে আসত রূপসী রানী। রূপে গুণে ঝলসে যেত আকাশ বাতাস। যন্ত্রণায় কাতর রাজা একদা বাড়িয়ে দিল হাত। হাতের মুঠোয় চুলের কঙ্কাল। দিঘি ছুটে যায়, দিন বহে যায়, এরূপ গুজরিয়া যায় হাজার দিবস। রূপসী রানী জল ছেড়ে আর এলনা। (কঙ্কাল কাহিনী, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ১৮)

অতীতের অনেক কবির মতোই মুজিব ইরম তাঁর বংশের ইতিহাস ও চিহ্ন খুঁজতে ব্যস্ত। তাঁর যেন মনে পড়ে যায় তাঁর জন্মের ইতিহাস। তাঁর জন্ম চিহ্ন যেন তাঁকে দেখিয়ে দেয় তাঁর ঠিকানা। মুজিব ইরমের অস্থিমজ্জায় সুর ভেসে আসে, কোথা থেকে আসে তা তিনি আবিস্কার করেন। তাঁর পূর্বপুরুষের বংশ পরম্পরা ছিলো এই সুরের ঝংকার তাই অতীত ইতিহাস খুঁড়ে কবি পেয়ে যান হাড়ের ভেতর সাঁওতালি সুর, প্রাণে মনিপুরি তাল। আত্মপরিচয়ের উন্মোচনে কবি বলেন :

আমারও ছিল চিহ্ন পূর্ব জন্মের। হাড়ের ভিতর ছিল সাঁওতালি সুর। ফর্সা নেশা-ঝন করে উড়িয়ে দিল মনিপুরি তাল। গোবর খনিতে জন্ম নেওয়া আমি এক প্রাচীন পালক। (ব্যক্তিগত নোট, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ২০)

মুজিব ইরমের জন্মের ইতিহাসের সাথে সাথে বের হয়ে আসে কবিতায় শব্দ সম্ভাবনা। তাঁর ভাষা, তিনি যেন চিনতে পারেন না- আবার খুব অপরিচিতিও নয়- সেকি রাজার রাজা- নাকি রাজকন্যার মতো সখি নিয়ে খেলা করে যায়- সে কি ভাষা নিয়ে ভাসিয়ে দিতে চায় কবিকে, মগ্ন কবি বলে ওঠেন :

যা-ই বলো, প্রশ্ন করো–উত্তরে রাজার পরগনা। দক্ষিণে রানীর। মাঝখানে-রাজকুমারী করে খেলা লয়ে সখিগণ। কে তবে তুমি? অলীক মুকুট পরে শব্দ চরাতে এলে? তোমারও কি ছিল তবে গোপন তালুক। (ব্যক্তিগত নোট, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ২০)

চলমান জীবনের বাস্তবতার নিরিখে কবি বেহুলা-লখিন্দরের লোকপুরাণের কাহিনি সুন্দরভাবে শিল্পীত করেছেন। স্বৈরশাসকের বেড়াজাল হতে সুরক্ষা পেতে কবি পড়শির মতো ভরসার জায়গা তৈরি করেন। স্বৈরতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে একান্ত আপন হয়ে কঠিন সময়ে হাত ধরবে এই পড়শি। এখানে মুজিব ইরম গণতান্ত্রিক ঐক্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন আলোচ্য পুরাণের কাহিনির উপমায় যা কবির মানসিকতার চরম উৎকর্ষের পরিচয় মেলে :

সুদীর্ঘ বাসর রাতে বোরোবে না কি হিম হয়ে? চিকন রোদে গলে যাচ্ছে নির্ভরতার মোম। নিশ্বাসে কেমন সংবাদ রটাবে হাওরে বাওরে? শুয়ে আছি নিদ্রা ভুলে–কে আছে ভাসাবে ভেলা গাঙের জলে? আমার পড়শিরা যদি হতো আপন– ভেঙে পড়ত মন্ত্রপড়া চুল। নিরাপদে কেটে যেত লোহার বাসর। আমার পড়শিরা যদি... আহারে পড়শি আমার! (পড়শি ১, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ২১)

আবার মুজিব ইরম লোকপুরাণের সাথে সাথে লোকজ নানা অনুষঙ্গও তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামের মেয়েরা বৃষ্টির জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা মাগে, দুর্বাঘাস, বাঁশের কুলা, শস্যবীজ, কাকের বাসা সব

এক সাথে করে বৃষ্টি আসার আশায় তারা বদনা বিয়ে দেয়। এখানে মুজিব ইরম যেন জসীম উদ্‌দীনের দেখানো পথেই হেঁটেছেন। মুজিব ইরমের আগে জসীম উদ্‌দীন গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়গুলো তাঁর কাহিনি কাব্যের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন দরদের সাথে। মুজিব ইরম এখানে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন :

> মাথায় নিয়েছি বাঁশের কুলা, শস্যবীজ, দূর্বাঘাস আর কাকের বাসা। বাড়ি বাড়ি আস্ত দুপুর- কই গো তোরা ধনীর মেয়ে, চাল দেও, পানি দেও–তৃষ্ণায় ফেটে যায় তপ্ত দেহ। আল্লাহ মেঘ দে, চাতক ওড়ে কোন প্রবাসে? (বৃষ্টি, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ২২)

কোনো রকম ভনিতা ছাড়া তাঁর কথাগুলো সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। মুজিব ইরমের কাব্যে গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়গুলোর বিশাল সমাহার। গ্রামীণ চিত্রগুলো সুখকর স্মৃতির উদ্রেক করে :

> আমাদের যে খাল পুঁটি আর পাবদার দখলে থাকবার কথা- সেই সব দিন আহা সেই সব রাত–বাইন মাছ পিছলে গেলে বড়শি বাওয়া নিরর্থক। বোয়াল চিতল সাঁতার কাটলে আমার খালি জ্বর আসে। পুড়ে যায় দিন পুড়ে যায় রাত :
>
> তুমি সম্মোহনে রাজকুমারী- জীয়ন কাঠিকে নাড়াবে কে?
>
> (সহি বড় আদি ও আসল খাবনামা, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ২৫)

'গোপন সস্বাদ' কবিতায় দেখা যায় মুজিব ইরমের ভেতর কিছুটা অনুশোচনা। তাও আবার সেভাবে প্রকাশও করতে পারছেন না তিনি। কোনো এক শ্রমিক বধূর সাথে কথোপকথনের ভেতর লুকিয়ে থাকে চাপা কান্না। প্রিয়তম শ্রমিক বন্ধু আজ হয়েছে অন্যের বধূ। যে ছিলো অতি আপন সে আজ দূরের। কবিতাটিতে স্পষ্টই বোঝা যায় কেউ হয়তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হৃদয় মন্দির ভেঙ্গে দিয়ে কাউকে ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু চলে যাওয়া মানে নয়ত সবছেড়ে যাওয়া- সব ছাড়লেও সেই মধুর স্মৃতি আর আত্মপোলব্ধি ও আত্মগ্লানি রয়ে যায় কবির ভাষায় :

> তুমি কেমন আছ শ্রমিক বধূ? তোমার কাঁঠাল বৃক্ষে এসেছে কি স্মৃতির ফসল? তোমার ঘরের কোনে রোজ বিকেলে খোঁজে কি কেউ নুনের পাতিল? আমি তো নেমক হারাম। এসেছি বহুদূর। আমাকে মাতাল করে পদ্মপুকুর। যে গেছে দূর দেশে, তার কথা সযতনে তুলে রাখি, স্পষ্ট করে কিছুই বলিনা। (গোপন সস্বাদ, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ২৮)

বাংলার লোকঐতিহ্য, লোকমেলা কবির মানস প্রবণতায় শৈল্পিক বোধে জাগ্রত হয়ে তাঁকে প্রবল আকর্ষণে শিকড় অভিমুখে টেনে নিয়ে চলে। কবির কলমের খোঁচায় উঠে আসে লোকমেলার নানাবিধ উপকরণ- যা দিয়ে সাজানো হয় মেলার পশরা। চরকা বুড়ি, রথ, পলো, মাটির পালকি কেনা, মাছের বাজারে জুয়া, মেলার বাঁশি প্রভৃতি জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে :

চরকা বুড়ির সুতো মাথায় বাড়তি চুলের স্বপ্ন আঁকা। পলো বাইতে ব্যর্থ চাপে মন খারাপের শব্দে নিয়ে বাড়ি ফেরা। নিত্য ছিল লুডু খেলায় ব্যর্থ হওয়া। এখন তুমুল ঝড়। কে দেয় আজান? গেয়ে ওঠো শঙ্খধ্বনি। পিঁড়ি কই, বসতে দেবো পবন?

রথ তলায় বান্নীর ঘুমভাঙা স্বাদ। মাটির পালকি কেনা। মাছের বাজারে জুয়া, পরনারীর টান।

মেলার বাঁশি যেন মথুরার প্রাণ। (স্মৃতি, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৩০)

মুজিব ইরমের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ বিষয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। কিশোর বয়সে জ্বর এলে মা তাঁকে দিতেন কাঁটা জামিরের নোনতা আরাম, মক্তবের মাঠ, মাহফিল, কায়দা পড়ার কিশোরী সকাল, পরিস্থানের রুপালি পান, ঘাটপাড়ের থানকুনি পাতা, মায়ের হাতের বারোপাতার ঝোল- এরপরই চলে আর এক আয়োজন। মায়ের কাছে বায়না চলে রাজার ছেলে কীভাবে স্বপ্নের মতো সম্ভাবনা জিতে নেয়- সেই গল্প শোনার। এই যে এতো সব কাহিনির বর্ণনা 'মাতৃমঙ্গল কাব্য' কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলার ঐতিহ্যের নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে আছে ষড়ঋতু। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এক এক ঋতু নিয়ে আসে তার আপন স্বরূপ। বাংলার ও বাঙালির চিরচেনা এই অপার ভালোবাসার ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে জড়িয়ে আছে নানা লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ ঋতু বৈচিত্র্যকে উপাখ্যান হিসেবে উল্লেখ করেছেন মুজিব ইরম তার 'বারোমাসি' কবিতায়। কবির এই বারোমাসি উপাখ্যানে চলে নানা আয়োজন নানা আচার। চৈত্র সংক্রান্তিতে চৈ পিঠা ভাজা, নবান্নের উৎসব, হাতে থাকবে কলার পাতা। প্রতিটি মাসেই কবির অপার ইচ্ছা ও সম্ভাবনা তাঁর নিজ গ্রামে ফিরে আসার, পোড়া কপাল আর ভাঙা কপাল নিয়ে অপেক্ষমান কবিচিত্তের আকুতি :

বেভুলে দিয়েছি ধরা ধুতুরা নেশায়। ঝুলে আছি ঘোলা রোদে ধান্ধার জালে, তার মাঝে হাঁসফাঁস যেন এক উজাইর ফসল। যদি ছিড়েঁ ফেলি মাগো কৃত্রিম ফাঁস সব ছেড়ে আসবো দেখো সামনে জ্যৈষ্ঠ মাস। (বারোমাসি, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৩৯)

এভাবেই স্বঘোষিত নগর বাউল জানে কখন দুধ সাগর আম পাকে, চিত্রপটে ভেসে ওঠে লাল পিঁপড়ের দল 'ডেলফি আমের ডালে' বাসা বাধা, তাঁর কেবলই মনে হয় চারদিকে গ্রাস করছে নগর সভ্যতা শিকড় থেকে উচ্ছেদ করে যেন চারদিকে পুঁজের পাহাড়- কিন্তু এসবে কিছুটা বিচলিত হলেও কবি এনেছেন তাগা-তাবিজ (মাটির খোঁজ) যার ফলে সব গ্লানিতা সেরে সতেজ হবে ভূমি। সেই আশায় তিনি মাকে সবুর করতে বলেন কারণ তিনি নিশ্চয়ই ফিরবেন এই আষাঢ়েই। অপেক্ষমান কবি লোকপুরাণের চাঁদ সওদাগরের প্রতীকে নিজেকে কল্পনা করে তাঁর আত্মবিলাপ যেন ছাপিয়ে ওঠে অপেক্ষার পালা কবে শেষ হবে। কারণ, আষাঢ় মাসও চলে গেল কবে ফেরা হবে :

মাঝরাতে শুনে যাই অলক্ষণে পাখিদের গীত। করুণ বিলাপে চাঁদ–চাঁদসদাগর বিছানায় ঘুমে, স্বপ্নের সওদা তার কবে গেছে ভেসে, নেই আর চাঁদমামা টিপ দেবে এসে। এবারও গেল মাগো কেবলি আশায়, তবে কি ফিরিব আমি ভাদ্রের গাঁয়? (বারোমাসি, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৪০)

অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান কবির চোখে ভাসে পাখির ঝাঁকের দল। অচিন পাখির ডাক, বড়শির টোপ দিয়ে মাছ শিকার, ডিঙ্গি নৌকা সহযোগে কবি যাবেন তাঁর প্রিয়ার বাড়ি, উপহার হিসেবে নিয়ে যাবেন শালুকের ফুল। ইরি ধানের ক্ষেতে ফসলের সুঘ্রাণ আনমনা করে তোলে কবিকে। সেই সাথে যুক্ত হয় পাকা তালের মনমাতানো গন্ধ, চিত্রপটে ভেসে ওঠে মায়ের হাতের সুস্বাদু তালের পিঠার স্বাদ।

মায়াময়ী গ্রাম কবিকে হাতছানি দেয়, প্রতিনিয়ত ঋতু বৈচিত্র্যে ভরপুর গ্রাম তার অপার ঐশ্বর্য নিয়ে কবির মানসপটে চিত্রিত। গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়বস্তুর শিল্পরূপ দরদ দিয়ে অংকন করেছেন কবি। কবিতার প্রতি চরণে ফুটে আছে সেই মায়ার ছোঁয়া। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যকে আখর করে মুজিব ইরম কবিতার সংসার সাজিয়েছেন খাঁটি গৃহবধূর মতো। সেখানে কমতি নেই কিছুর বরং সেখানে বাদ পড়েনি অতি সামান্য বিষয়ও। একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ইরমকথা'য়। একই নাটকীয়তায় *ইরম কথা* শুরু করেন। সেখানে 'আপনার পাঠফল' কবিতায় কবি পাঠককুলকে আশীর্বাদ করেছেন গ্রামীণ জীবনের আলেখ্যে। যেখানে রয়েছে ফুল-পাখিদের ভালোবাসা। শুরুটা এমন: 'এ–মুহূর্তে আপনি পাঠক হলে আপনার ওপর ফুল পাখিদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।' (আপনার পাঠফল, *ইরমকথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৪৭) মুজিব ইরম এই কাব্যের নাম কবিতায় স্বীকার করেছেন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি কথা। এ থেকে বোঝা যায় তিনি 'মাতৃঋণ' আবারও গাইবেন আর মাতৃঋণ মানেই তো মা, মাটি, দেশ, গ্রাম সর্বোপরি তাঁর ঐতিহ্যে অবগাহন। এ কাব্যগ্রন্থেও দেখা যাবে আরো কিছু বিষয় তিনি তুলে এনেছেন যদিও সেই মাতৃঋণ তবুও নতুনভাবে। মুজিব ইরমের যেন মনে পড়ে যায় তাঁর জন্মের প্রথম দিনের কথা, যেন সব ঘটছে চোখের সামনে; একজন শিশু জন্মের পরপর পাড়া প্রতিবেশি ও আত্মীয় স্বজনরা অতি আগ্রহ নিয়ে দেখতে আসে। সেই সঙ্গে চলে উৎসবের আমেজ ও কিছু লোকাচার যেমন মোরগ ধরে কাটা, নাপিত দিয়ে প্রথম চুলকাটা, 'সেই শুভ চুল' যা ভাগ্যের প্রতীক তা পরম যত্নে মা রেখে দেন বালিশে গুজে। সব যেন কবির জন্মের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় এই নগর জীবনে সেই স্নেহময়ী গ্রাম ও গ্রামের মানুষ এবং লোকাচার সব কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ঔষধিগুণ সম্পন্ন তুলসী গাছের করুণ দশা কবিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। যে গাছ অসুখে আরাম দিত, সময়ের প্রয়োজনে সেই গাছই এখন রুগ্ন। আলোচ্য কবিতায় মানুষের করুণ দশার তুলসী গাছের রূপকে তুলে ধরা হয়েছে :

বাড়ির পুতায় ছিল তুলসীর বন' প্রণম্য তুলসী বৃক্ষ, আমার অসুখ ব্যথা সারাও তুমি। অথচ কাঁপছ আছ, ধরেছে অসুখ। কী করে জ্বরের তাপে দেবে বলো ব্যথার ওষুধ!

(ইরম কথা, *ইরম কথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৪৮)

মেঘকে বার্তা করে বিখ্যাত কবি কালিদাস *মেঘদূত* কাব্য রচনা করেছেন বহু আগে। সেই থেকে বাঙালি মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে মেঘ একজন বার্তা বাহকের ভূমিকায়। অনেকেই এই মেঘের উপর ভরসা করে থেকেছে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে। মুজিব ইরমও বাদ যাবেন কেন। তিনি তাঁর মেঘ পিওনের কাছে কি বার্তা পাঠাবেন তা ভাবছেন। তিনি চান না কোনো শোকবার্তা বয়ে যাক কারো হৃদয়ে। তিনি বুঝে উঠতে পারেন না যে কেন এই মেঘ কারো দুঃখের কারণ হবে। তিনি চান আনন্দে কাটুক সকলের দিন। 'সূচ রাজার কাঁটার' মতো কঙ্কণ দাসী'র দুঃখের বর্ণনায় কবি লেখেন:

> এসেছ পিওন মেঘ... কী বলিব! শোনে তবে–কী আছে মাহাত্ম্য এই বৃষ্টির গানে! অযথা দালানগুলো কান্না করে ওঠে! এসো তবে, গপ-টপে কাটাই সময়। কী বার্তা দিলে তুমি, ফালতু দুপুরে... অযথা কাজল-ব্যথা কান্না করে ওঠে ! সূচ রাজার শেষ কাঁটা বিঁধেছিল চোখে। তুমি কি কঙ্কন দাসী-খুলে নিলে শেষ কাঁটা ঠাকুরের দিনে? অযথা মৌন থাকা কান্না করে ওঠে!' (ইরম কথা, *ইরম কথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৪৮)

মুজিব ইরম তাঁর 'ইরম কথা' কাব্যগ্রন্থের 'তুমি/ এই সব দীর্ঘশ্বাস ৪' এ ব্যক্ত করেছেন শ্রমজীবী মানুষের কথা। তিনি সেই সব চাষিদের, দিন মজুরদের দলে ভিড়ে একই সঙ্গে উপভোগ করতেন 'তাজেলের গান', পাতি হিয়ালের গপ', আর আজব 'লিলাইর গীত'। তাই সন্ধ্যার আসর হতো জমজমাট। শৈশবের সেই আবেগময় দিনে চলত লোকগান, ছড়া, গল্পের দুর্বার আকর্ষণ সেই সব আজো কবির স্মৃতির কোটরে যত্নে গচ্ছিত :

> একদা আগন মাসে লুরতে গেছি আমন হাওরে। সেই সব কামলাদের সাথে যারা আমায় শিখিয়েছিল তাজেলের গান, পাতি হিয়ালের গপ, আর আজব লিলাইর গীত। সারা সন্ধ্যা মাড়ায় দিয়েছি ডাক কিচ্ছার লোভে। তেমনি পূর্ণিমা রাত আমনের মাসে কোথায় হারিয়েছি সব বেভুলা এ দিনে? আর ওই ধান কুড়ানির মেয়ে, তোমাকেও ভুলেছি আজ ইতর কুহকে। (তুমি/ এই সব দীর্ঘশ্বাস, *ইরম কথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৬১)

প্রেয়সীর সাথে তাঁর ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনটিও যেন বিড়ালের উপমার বাস্তবঘন করে তুলেছেন। বিড়ালকে যেমন বস্তায় ভরে ঘুরিয়ে কোথাও ছেড়ে আসলে আর পথ চেনে না। তেমনি কবিকে যদি তাঁর প্রিয়া ভালোবাসার মিথ্যে ফাঁদে বন্দি করে যদি বাধ্য করে অন্য রমনীর কাছে যাওয়ার পারবে না কবি প্রিয়া। কারণ কবির ভালোবাসার বন্ধন অটুট ঠিক গ্রামের সাথে নাড়ির টানের মতো- আত্মবিশ্বাসি কবি বলেন :

> যতবার ফন্দি এঁটে বন্দি করে ফেলে দেবে স্নেহের ছালায়... যতবার নাড়িয়ে, ঘুরিয়ে খুব ছেড়ে দেবে পথে– যেন আমি ভুল হই, খুঁজে নেই ভিন রমনীর ঘর। ততবার আসবো দেখো ফেরত আবার ... অবাধ্য কাথাঁর নিচে নিতে কিছু উসুল তাহার। (করেছি চক্ষু স্থির, *ইরম কথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৬২)

প্রিয়াকে ছেড়ে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি যেমন পাওয়া যায় মুজিব ইরমের কবিতায় তেমনি নৌকার গলুই এর উপমায় ভেসে ওঠে গ্রামীন নদী আর সেই নদীর স্রোতের মতোই একদিন দূরে বহুদূরে হারিয়ে যায় সময়, সম্পর্ক, ভালোবাসা। নৌকার গলুই থেকে খসে পড়ে লগি যার ফলে দিকভ্রান্ত হয় নৌকা। ঠিক তেমনি যৌবন বয়সের কাঞ্চা পিরীতি হারিয়ে যায়। একদিন যেই রমণীর কাছে একমাত্র প্রেমাস্পদ ছিলো সবকিছু, তা হয়ে যায় স্মৃতি :

> এরকমই হয়। নাওয়ের গলুই থেকে আলগা হয় প্রাণের লগি। চউকামের বুক থেকে খসে পড়ে কাঞ্চা বাঁশের প্রীতি। স্মৃতির রমণী থেকে মুছে যায় স্নেহের পুরুষ। একদিন খুঁজে পাই– হয়ে গেছি একাকী অসুখ। (আত্মচরিতম, *ইরম কথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৬৩)

গ্রামীণ লোকাচারের উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ হলো তাঁতের শাড়ি। এই শাড়ি নিয়ে রচিত হয়েছে নানা কাহিনি উপাখ্যান। এই শাড়ি কখনো হয়ে ওঠে ভালোবাসার প্রতীক কখনো বা স্মৃতির আখর। সংবেদনশীল কবি শিল্পসম্মতভাবে জীবন বাস্তবতার সাথে সাথে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে, তা উল্লেখ করেছেন। সোনালি দিনের, তাঁতশিল্পের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে তাঁতপরা নারী। মুজিব ইরমের শব্দ গাঁথুনি নজর কাড়ে। সাধারণভাবে 'কুচকুচে কালো'র সাথে সবাই পরিচিত কিন্তু তিনি সন্ধ্যাকে তুলনা করেছেন 'কুচকুচে সাদা' যা বিরল :

> সন্ধ্যাকে চাই। সন্ধ্যাকে নিয়ে যাবো বাড়ি। তার নাক কুচকুচে সাদা। নিরলে পাঁতাবো সই। পড়াবো তাঁতের শাড়ি। তাঁতপাড়ার ঝিয়ারি গো, তাঁতশব্দ কই? তাঁতের নীরব কান্না, বিরহ বিকেল। কে শাসাল? কার তবে প্ররোচনায় বন্ধ হয় প্রাণের সংগীত?
>
> সন্ধ্যাকে চাই। সন্ধ্যাকে নিয়ে যাবো বাড়ি। বুনো বুনো ঝিয়ারী গো তাঁতের শাড়ি। খুঁজে ফিরি তাঁত আর তাঁতের নারী। (দৃশ্যসন্ধ্যা, *ইরম কথা*, ইরম সংহিতা,পৃ. ৬৪)

গ্রামবাংলার অন্যতম অনুষঙ্গ নদী। নদীর সাথে একাত্মতা মুজিব ইরমের জন্মগত। নদীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাই-বোনের। সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও ধলাই এই চারটি বোন তাঁর :

> ও নদী, তুই তো বোন হস আজন্ম আমার। অন্য কোন বলার সাহস হয়নি কখনো। (নদী নিয়ে একটি সত্য কবিতা, *ইরম কথা*, ইরম সংহিতা পৃ. ৬৭)

নদী বোনটিকে ভাই বোঝাতে চায় হৃদয়ের কথা, এখানে নদীকে পাঠাতে বলে বার্তা। কবির মনের ভেতর রয়েছে আর এক নদী- যে নদী প্রেয়সীর রূপক। যার জন্য কবিহৃদয় হরদম পিপাসায় কাতর- যার সাথে কবির ছিলো বহুদিনের মান-অভিমানের পর্ব কিন্তু আজ যেন পাহাড়সম অভিমান ভেঙ্গে পড়ছে। কবি নিতে চান তাঁর প্রেয়সীর খোঁজ যে নদীর বাঁকের মতো বহু বাঁকে মিলিয়ে গেছে। কোথায় সেই ঘরহীন বন্ধুর বাস :

> না যাইও ওরে নদী, ওদিকে রয়েছে জমা আজন্ম পিপাসা। যদি পাও তার দেখা, বুঝায়ে বলিও তারে উজানী নগরে তার বেড়েছে তিয়াস। (নদী নিয়ে একটি সত্য কবিতা, *ইরম কথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৬৭)

'বিচ্ছেদী' কবিতায়ও সেই একই বিরহ সুর, ভেসে আসে। এখানে শীত ঋতুকে একমাত্র সাক্ষী মেনে চলে অভিযোগের পালা। এই বিষণ্ন শীতে কবি কিছুতেই এই বিরহ জ্বালা সইতে পারছে নাকি। প্রিয় নারী বিনে পুরুষ দিশাহারা। চলে আত্মবিলাপ :

> এই যে তুমি আসছ রে শীত, কেমনে করি মানা, তার বিহনে পুরুষ মন মোর হইল ঘর ছাড়া। মনে বড়ো দুখ শীত রে, চিত্তে বড়ো দুখ ... গাড়িয়াল বন্ধুর নারীর মতো ভাঙে পুরুষ বুক। ... পাড়ার চেংড়ী মনটা ভাঙে, চেংড়া মনের দোষ, তবু তুমি আসছ রে শীত ফিরিয়ে দিতে হুঁশ। (বিচ্ছেদী-১, *ইরম কথা*, ইরম সংহিতা, পৃ. ৬৮)

বিচ্ছেদের রেশ চলতে থাকে। ৪নং কবিতায় এসে তা চরম রূপ নেয়। কবি আবেগঘন হয়ে বিরহ ব্যথা বোঝাতে 'রাধাসম পুরুষের বুক' উপমায়িত করেছেন। কবি বৈষ্ণব পদাবলির রাধা বিরহের সাথে পুরুষের বুকের যন্ত্রণার এক অভিনব উপায়ে তুলনা করেছেন যা হয়ে যায় সর্বজনীন নারী-পুরুষের বিরহ। সার্থক শিল্পীর মতো মুজিব ইরম বলে চলছেন কৃষ্ণ বিরহ-ব্যথা :

> জৈবনিক নিঃসঙ্গতাকে লোক–আধ্যাত্মিকতার ভাবলোকবিহারী বিরহচেতনায় সাঙ্গীকৃত করে লোকায়ত জীবনের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিবিধ উপকরণের সমবায়ে কাব্যরূপ দান করেন। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩৬৪)

কবি অভ্যর্থনা জানান তাঁর সুরে সুর মেলাতে বাড়ির পাশের আরশী নগরের পরশীর এবং সাথে থাকবে দইরল পাখি ও মুথা ঘাস। কবির ডাক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামীণ আবহে :

> এসো তুমি বৃক্ষ দেহে ধূপ-ধুনি মেঙ্গে করি অসীম মানত, কেন তবে বলো সই দূর গাঁয়ে তোমার বসত? এসো প্রাণ গান ধরি, দূরে নয় আরশী নগর, তুমি শুধু ধরো হাত, পুষ্পিত হোক সখী তোমার জঠর, গান ধরো দইরল পাখি, গান করো উঠতি বাতাস, সযতনে ধরো গলা ধলা মুথা ঘাস– এই দেহ তো দেহ নয়, ভাবের আবাস, ভাবজ্বর লেগে রয় দেহে বারোমাস। (বিচ্ছেদী-৪, *ইরমকথা*, ইরমসংহিতা, পৃ. ৭০)

গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়গুলোকে কবি মুজিব ইরম অন্তর দিয়ে অবলোকন করেছেন। তাঁর চেতনার বিকাশ ছিল বিস্তর। তিনি কান পেতে শোনেন দুঃখভরা মানুষের কণ্ঠস্বর। তাঁর কাছে উঁচু নিচু কোনো ভেদাভেদ নেই। নেই কোনো জাত পাতের বালাই। গ্রামের নদী, মাঠ, ঘাট, গাছপালার মতো সহজ-সরল সজিব তাঁর তনুমন। তিনি অসাম্প্রদায়িক কবি। তাঁর কবিতায় সিঁদুর পরা রমণী ও ঘোমটা পরা নারী একই ঘাটে যার যার কর্ম সম্পাদন করে। কি আশ্চর্য সুন্দর চিত্রকল্প :

> আহারে নাপিত বাড়ি ... পৌষ মাস ... চুল কাটার দুপুর ... সন্ধ্যার বক ... শ্মশান অগ্নি– সেখানে খেলেছে আজ টুপিপরা বালকের দল। শ্মশানে ধান ভাঙার কল, পানের দোকান, সুপারি বাগান। যেখানে সিঁদুর পরা রমণী এক খুব ভোরে করেছে গোসল, সেখানে ঘোমটা পরা নারী এক করেছে ওজু, শুনে সন্ধ্যার আজান। একটাও কিছু নাই ফেরায় তোমাকে! (সন্ধ্যা দৃশ্যে নাপিত বাড়ি, *ইরমকথা*, ইরম সংহিতা, পৃ. ৭২)

বাংলার গ্রামীণ ও লোকজ ঐতিহ্যকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন মুজিব ইরম। মাতৃঋণ যে শোধ হবার নয় সেটিই যেন বারবার বলতে চেয়েছেন :

> মুজিব ইরমের রক্ত-অনুভবে গ্রাম অবভাসিত হয় তার সমগ্রতা নিয়ে। কৃষিভিত্তিক কর্মকুশলতা, ঋতুগত প্রকৃতিবৈচিত্র্য ও লোকায়ত সংস্কৃতির নানা অভিজ্ঞানের প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ তাঁর কবিতা-সংসার। (মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, পৃ. ৩৬২)

কি নেই তাঁর কবিতায়। কবিতার বিশাল পশরায় সাজানো থরে থরে যেই উপকরণ রয়েছে তা কবিকে হাতছানি দেয় অতীতে ফিরে যেতে। তাঁর কবিতায় থাকে 'রোঙার ফাঁদ' নাড়ার ভেতর লুকানো থাকে- স্বর্ণালী বাইন, তিতপুঁটি, পরিপক্ক ধানে ঠোকর মারে 'উন্মত্ত কৈ', গজারের পাল, পাবদা, চেলাপাতা, বোয়াল, বড়শি অব্যর্থ টোপ, পিপঁড়ার ভাত। আহা ! কি বাদ রেখেছেন কবি। তিনি নিজেও জানেন খুঁটিনাটিও পড়ে নাই বাদ মুজিব ইরম বলেন–'একটাও রাখিনি বাদ- সমস্ত কৌশল আমি এনেছি আয়ত্তে।' সত্যি তাই কোনো কৌশলই জানার বাকি নেই এই আধুনিক লোকজ কবির আর সেই কারণেই নবান্নের উৎসব থেকে শুরু করে বসন্ত বন্দনার সবকিছু ওঠে আসে তার কাব্যে। শোনা যায়, ধানের গানের শব্দ, পথের পাশে সুপারির বাকল, যেন আড় চোখে চায় কবির দিকে।

লোক বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও তিনি তৈরি করে রেখে যেতে চান এক সুন্দর সাজানো সমাজ যেখানে শত শত শিশুর হাসি মুখ চাষ হবে গোলাপের মতো, পাখিরা গান করবে। মুজিব ইরম এর আশঙ্কা থাকে যেন ভবিষ্যৎ বংশধর একটি নিরাপদ আবাস পায়। এই আগামির শিশুইতো বাঁচিয়ে রাখবে বাংলার ঐশ্বর্য-ঐতিহ্য, লোকাচার সংস্কৃতি। তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন সেখানে যোগসূত্র থাকবে নতুন-পুরাতনের, অতীত-ভবিষ্যতের, আর অনুজ-অগ্রজের। সুদূরে থাকলেও কবি হৃদয়ে স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে ভাবের ও বোধের সমন্বয়ে আজীবন মুজিব ইরমের স্নায়ুতে বয়ে চলবে এই হৃদয় নিড়ানো অন্ত্যজ অনুভব, অভিজ্ঞান, কবি হিসেবে এখানেই তিনি সার্থক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রহমান হেনরী

বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি রহমান হেনরীর (জ. ১৯৭০) রচনার সংখ্যা বিস্তর, ছন্দোবদ্ধ ও গদ্যে- দুইভাবেই তাঁর রচনা কৃতির পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : *বনভোজনের মতো অন্ধকার* (১৯৯৮), *বিষাদের চন্দ্রবন* (১৯৯৮), *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা* (১৯৯৮), *প্রকৃতি সারস উড়ে যায়* (২০০০) প্রভৃতি। বলা যায় :

> বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস বাঁকবদলের, প্রতিবাঁকেরও। তারও চেয়ে বড় সত্য, ভাষায়, প্রকরণে, প্রকাশশৈলীতে শক্তিমান কবিমাত্রই স্বতন্ত্র স্বরের অধিকারী। কণ্ঠস্বাতন্ত্র্যই কবি থেকে কবিকে স্বতন্ত্র কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। কবি হয়ে ওঠেন শিল্পের প্রতিভূ; আপন শক্তির স্মারক। (মোহম্মদ নূরুল হক, রহমান হেনরীর কবিতায় চিন্তার দ্যুতি, *লোক*, পৃ. ১৪৩)

এই চলমান প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে কবিসত্তা জাগ্রত হয় প্রতিনিয়ত। এক এক জন কবি নিয়ে আসেন নিজস্ব ভাষা গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি। সবাই যে আলাদা স্বর তৈরি করতে পারেন বা পেরেছেন তেমনটি নয়। তবে চলছে ভাঙ্গা, গড়া, উত্তান-পতন। বানের জোয়ারের মতো সময়ের সাথে ভেসে যায় কতো শত ভাষা সাহিত্য। চিরায়ত সাহিত্য টিকে থাকে । রহমান হেনরী তাঁর নিজস্ব গভীর চিন্তা ভাবনা সহযোগে কবিতা শরীর তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। কতটুকু আলাদা স্বর হয়ে উঠেছে এর চেয়েও বড় বিষয় তাঁর প্রক্রিয়া চলমান। তিনি লিখছেন বিস্তর, আর লিখে চলছেন এখন পর্যন্ত।

মানব জীবনের অন্তরের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছেন রহমান হেনরী। পাওয়া না পাওয়ার দোলাচলে চলতে থাকে আকাঙ্ক্ষিত মন। ঘটমান অতীতে তাই বারবার ফিরে যেতে চায় মন। স্মৃতি রোমন্থনে হৃদয় হয় ব্যকুল জীবনের প্রাপ্তি কিসে, কিসের লাগি প্রাণ কাঁদে, ফেলে আসা সময়কে কেই বা আর ধরে রাখতে পারে। কোনো স্বর্ণালি অতীতের সুবর্ণ সন্ধ্যার সুখময় স্মৃতি কবিকে নাড়া দিয়ে যায়, তিনি ফেরি করে বেড়ান হৃদয়ের কষ্ট :

> ধূসর অতীত থেকে প্লাতোনিক ঘ্রাণ ভেসে আসে ...
> ভেঙে যাচ্ছে কবির হৃদয়... নীরব রাস্তায় রাতে অনিশ্চিত
> হাসি ফুটে ওঠে, খুলে যাচ্ছে দুপুরের ভাঁজ...।
>
> (নারী ও পুরুষ-অন্ধকার, বনভোজনের মতো অন্ধকার, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* পৃ. ১১)

রহমান হেনরী কখনোই শিকড় থেকে সরে যান নি। তিনি যে এই উপমহাদেশের মানুষ সেই ইতিহাস ঐতিহ্য সবসময় তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকতো। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বেশির ভাগ কবিতায় লোকপুরাণের বর্ণনায়। রহমান হেনরীর কিছু কবিতা পড়তে গেলে মনে হতে পারে তা শুধুই কোনো ঘটনার বিবৃতি কিন্তু গভীরভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ফেললে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে অন্তর্নিহিত ভাব,

ভাষা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। মোটকথা সারবস্তু বোঝা যাবে কবিতা বিশ্লেষণে। রহমান হেনরী বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের আলোচিত কবি যাঁর কবিতা মূলত গদ্যছন্দকে প্রাধান্য দেয়া। রহমান হেনরী গদ্যে কবিতা লিখলেও তাঁর কবিতার গঠন বিন্যাস, আখ্যান, উপস্থাপন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর অনুভূতি প্রবণ হৃদয়ের সহযোগে মিশ্রিত হয়েছে বুদ্ধির চমক যার ফলে কবিতা পড়ে ভালোলাগা তৈরি হয়। আবার তাঁর অন্যান্য অনুষঙ্গের মধ্যে প্রেমের প্রতি দৃষ্টিও ছিলো অন্যরকম। জন্মের ইতিহাস নিয়ে খোঁজাখুজি, প্রকৃতির পথে পথে বিচরণ, বিকাশ, উপস্থাপনের সংমিশ্রণ তার প্রেমের কবিতা হয়ে ওঠে- সজীব প্রাণবন্ত হৃদয়ে জাগায় সুখানুভূতি যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাঁর কবিতাগুলোকে কোনোভাবেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। প্রেমের কবিতার ভেতর রয়েছে মনের সাথে লিবিডিও চেতনা যা থেকে উঠে আসে কবির গভীর হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতি ও সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি। রহমান হেনরীর কাজের প্রসার বিস্তর, তিনি শুধু কবিতাই লেখেন নি, বিভিন্ন ভাষার কবিতা অনুবাদও করেছেন। যার ফলে তাঁর এই পদচারণা আন্তর্জাতিক মহলেরও দৃষ্টি এড়ায় না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'কনটেম্পোরারি বাংলাদেশী পোয়েট্রি' সংকলনের ভূমিকায় প্রফেসর নিকোলাস বার্স্ন তাই যথার্থই বলেন :

> Baitullah Quaderee and Rahman Henry write opaque, difficult poetry that is postmodern in its awareness of linguistic distortion and interference, yet still pulses with a vibrant imaginative energy. মার্কিন এই সাহিত্যের অধ্যাপক সেখানেই থেমে থাকেন না, আরেক কাঠি উপরে উঠে এ-ও বলেন যে, বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতা ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য ভাষা এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের সমসাময়িক কবিতা থেকে আলাদা, সমৃদ্ধ। (হাসান আল আব্দুল্লাহ, কাব্যিক আলোয় উজ্জ্বলতম রহমান হেনরী, *লোক*, পৃ. ৫৪)

জীবনের আনন্দ হাসি কান্না বেদনা অর্থাৎ মানব জীবনের সমগ্রতা দেশ, মাটি, মানুষ প্রকৃতি রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা, শাসক শ্রেণি সব কিছু নিয়ে কথা বলেছেন রহমান হেনরী। কবিতার ভেতর শব্দের মেলবন্ধন, উপমা, পাঠক মনে ভালোলাগার দোলা দেয়। গ্রামকে নিবিড়ভাবে দেখা, গ্রামের রাস্তাঘাট, পরিবেশ প্রকৃতি, হারিয়ে যাওয়া সময়, ধানক্ষেত, ব্যাঙের ডাক এই বিচিত্র বিষয়াদি ফিরে ফিরে আসে তাঁর কাব্যে। সমালোচকের ভাষায় বলা যায় :

> কবিতার নিবিষ্ট-দক্ষমাঝি, প্রয়োজনে পালে যদি হাওয়া না-ও লাগে, হেনরী উজানে গুন টেনে চলেন; কিন্তু কবিতাযাত্রা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন না; (ফরিদ আহমদ দুলাল, রহমান হেনরীর কবিতায় মেধা ও মনীষার দ্যুতি, লোক, পৃ. ১১৭)

রহমান হেনরীর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, ভালোবাসা, যন্ত্রণা, দ্রোহ, রাজনৈতিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি, লোকপুরাণের পরিচয় আছে। তাঁর কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়গুলোর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিষদ আলোচনার দাবি রাখে।

নব্বইয়ের দশকের আলোচিত কবি রহমান হেনরীর কবিতায় বিস্তরভাবে রয়েছে গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ। তাঁর কবিতার যে কোনো ঘটনার বর্ণনায় উঠে আসে শিকড়ের টান, মাটির টান। নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য ফুটে উঠে কবিতার দেহে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বনভোজনের মতো অন্ধকার* (১৯৯৮) কাব্যের 'এক বাক্সরাত' কবিতার মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গগুলো, যেখানে বিষণ্ন প্রিয়াকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর ক্ষেত্রে প্রকৃতির অনুষঙ্গগুলো এসে যায়। যেমন : বোশেখ নদী, নদীর বাঁক, প্রগাঢ় মেঘ। আলোচ্য কবিতায় দেখা যায়, কবিপ্রিয়া কিছুতেই জীবনকে আনন্দঘন করতে পারছে না। জীবনকে অনুভব করতে পারছে না। অভিমানী কবি তাঁর প্রিয়ার এই বিষণ্ন মনোবেদনা আর গ্রহণ করতে পারছেন না :

> আঁধার কাঙ্ক্ষিত যদি, এই নাও এক বাক্স রাত !/রাত্রি কাহাকে বলে? অই তো দীর্ঘ ছায়া উঠেছে সংক্রমে...
> পুড়ুক প্রশ্নের পাখি অকালের বোশেখ নদীতে/সবুজে নখের চিহ্ন ক্লান্ত পড়ে থাক
> তুমি কেন ফুটেছ জারুলে? বোশেখ ফুরালে বুঝি ফিরে যাবে/নদীতে যেমন আসে বাঁক?
>
> (একবাক্স রাত, *বনভোজনের মতো অন্ধকার*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ৯)

'ফিরবে না কেউ' কবিতায় সেই অভিমান আরো গাঢ়তর হয়ে ওঠে। কবি হৃদয় হাহাকার করে ওঠে, চোখ ভিজে ওঠে প্রিয়ার অপেক্ষায়। কেউ ফিরবে না জেনেও চকিত আশা তাও মনের অজান্তে খেলা করে উঠে। দুপুর রোদে, দোয়েলের মিষ্টি শিসে, মাঘের মেলাতে, চন্দ্রলতা মাঠে প্রভৃতিতে স্মৃতির পরশে কবি তাঁর প্রিয়তমার ফেরার অপেক্ষায়। কিন্তু যে প্রিয়া আজ অন্যের অধীনে সে কী করে আর ফিরবে। নিজের একান্ত প্রেমাস্পদ অন্যের অধীনে চলে গেলে তা আর যেমন ফিরে পাওয়া যায় না সেই বিষয়টিকে কবি খুব সুন্দর করে উদাসী মেঘের ভেসে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন :

> এই যে উদাসী মেঘ, ভেসে যায় রোদের আদর/মেখে দক্ষিণের দিকে... সে যদি না মানে
> কোনও পিছুটান ! তাকে তুমি কী ভাবে ফেরাবে!/শুধু এই ঘাসের শিশির ভেজা আর্দ্র দু'চোখে?
>
> (ফিরবে না কেউ, *বনভোজনের মতো অন্ধকার*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১০)

প্রকৃতির নিরব পরিবর্তন কবির চোখে ধরা পড়ে সেই সাথে মানব জীবনের অন্তিম সময়ও ধীরে ধীরে চলে। গ্রামীণ জনজীবনের মানুষগুলো প্রকৃতির একান্ত আপন, যেমন আপন কবি নিজেও। প্রকৃতির বিচিত্র দিকের সাথে জড়িত মানুষ রহমান হেনরীর শৈল্পিক ভাবনার প্রধান আখর। তাঁর একান্ত আশ্রয়স্থল মায়ের মতো প্রকৃতি। যেখানে তিনি খুঁজে ফেরেন আত্মার শান্তি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানব সমাজ এই প্রকৃতিকেই করে ফেলছে ধ্বংসের স্তুপ। সেখানে ধ্বংস হচ্ছে বন, পাখিরা হচ্ছে হত্যা, পাখিরা খুঁজে ফিরছে নীড় কিন্তু কোথায় সেই অভয়ারণ্য- কবির একান্ত মন ভারি হয়ে ওঠে, কবিতার চরণে যেখানে গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়গুলোর আদলে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে যায় :

সমাজ ও মিথ্যার বেসাতি; একদিন আশ্বিনের ভোরের বাতাসে
তথাপি আনন্দ এসে ছুঁয়ে যাবে মুহূর্তের জন্য কারও শাদা চুল,
বয়সের বলিষ্ঠ সন্ত্রাস ! ও বোন স্বদেশ, সেইদিন আমি তোকে
বিষাদের সাথে দেব বিয়ে ...গোঁয়ার ছেলের মতো একটি দুপুর

(বনভোজনের মতো অন্ধকার, *বনভোজনের মতো অন্ধকার*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১২)

প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে বনে বসবাসরত পশুপাখি গাছপালা। কিন্তু আধুনিকায়নের নামে উজাড় হচ্ছে বন, মানুষ হয়ে যাচ্ছে পাষাণ। প্রকৃতি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে মানব সমাজের যে ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পথে, ধ্বংস স্বপ্ন, চারদিকে ধেয়ে আসছে অশনি সংকেত সেই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন কবি :

দিগন্তে ঝুলছে আশা, একজোড়া বুনোহাঁস আটকে আছে/ব্যাধের শিকারে ... ওরা আজ ফ্রাই হবে ...
পাখির মাংসের ঘ্রাণ বহুকাল ভাসেনি বাতাসে,/মিশে যাক আমাদের বিপন্ন সংসার, আমাদের স্বপ্ন-শোক,

(বনভোজনের মতো অন্ধকার, *বনভোজনের মতো অন্ধকার*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১২)

লোকায়ত জীবনের 'বিজ্ঞচাষী' যেমন কখন বৃষ্টি হবে তা বাতাসের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে, তেমনি গ্রামীণ মাতাও সেই দক্ষ চাষির মতো বলে দিতে পারেন সময়ের হিসাব, সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতির পালাবদল। কবি এখানে মমতাময়ী মায়ের এই দক্ষতাকে অনেকটা খনার বচনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। খনা যেমন অত্যন্ত বিদূষী নারী ছিলেন, তেমনি লোকায়ত জীবনের জননী এক একজন দক্ষ খনা। যাদের নিখুঁত গণনা কখনো ভুল হয়না বয়সের ভারে নুজ্জ অন্ধ হলেও, তারা সব কিছুর হিসেব মিলিয়ে দিতে পারেন। জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে সেই বিষয়টি অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে দেখিয়েছেন রহমান হেনরী :

বাতাসের ঘ্রাণ শুঁকে তুমি বলো/আমাদের গাঁয়ে আজ বৃষ্টি হবে খু-উ-ব !
আমি তো কান্নার চেয়ে গাঢ়তর মুষল বৃষ্টির গান/শুনি নাই- জননীর জয়তুন সুরে !

(তবে কি জননী অন্ধ, *বিষাদের চন্দ্রবন*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৪)

রহমান হেনরী শিকড় সন্ধানী কবি। নিজের শিকড়ের ভেতর বরাবরই তিনি ডুব দেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একজন মানুষ তার শিকড় থেকে কখনো আলাদা হতে পারে না। যতই মানুষ আধুনিক হোক না কেন, যতই শহর, দালান, কোঠা, বিল্ডিংয়ে মানুষ বসবাস করুক কিন্তু আত্মার শান্তি, জীবনের মূলমন্ত্র লুকিয়ে থাকে তার শিকড়ে। আর ঠিক সেই কারণেই মাটির টান, মূলে ফেরার গল্প, কথা, বারতা তাঁর কবিতার পলে পলে :

আমি বললেই যদি এখানে নদী বয়ে যায়/তো, আমি পাথরকে নির্দেশ দিচ্ছি-
হে পাথর ! শেকড়ের গান গেয়ে ওঠো ! (নির্দেশ, *বিষাদের চন্দ্রবন*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৫)

গ্রামীণ মানুষের চেতনার সাথে কবির চেতনাও একাকার। কবি প্রকৃতিকে যেমন হৃদয়ে ধারণ করেন, তেমনি সমবণ্টন-মার্কসীয় ধ্যান ধারণাও তাঁর মনের কোণে বড় স্বপ্নের মতো উঁকি দেয়। তিনি চাইতেন সবাই সমানভাবে জীবন যাপন করুক। প্রতিটি মানুষ মানবিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুক। বেঁচে থাকুক গাঁয়ের নিরীহ মানুষ, বেঁচে থাকুক স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নটাই কবিকে আশা জাগাতো। কিন্তু হায়! যে দেশের মানুষ নিজের গ্রামের পাখি চেনে না সেখানে সমাজতন্ত্র কতটা সার্থক সেটিই কবিকে পীড়িত করতো। কবি এখানে 'পাখি'র রূপকে গ্রামের মানুষগুলো যে নিজেরা নিজেদের অধিকার নিয়ে সচেষ্ট নয় সেটি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বুঝিয়েছেন :

১. এপারে শীতল মৃত্যুমাঠ, তৃণসঞ্চারিত রীতি;/শস্য বলতে যব ও কাউন...

২. এ মহুয়া, তোদের গ্রামগুলি ভালো আছে?/এ গাঁয়ের মানুষেরা পাখিই চেনে না.. আয় হেসে উঠি শুনে !

(একদা একটি স্বপ্ন বাস করিতেন, *প্রকৃত সারস উড়ে যায়*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৬)

আবার 'পাখিকল্প বেলা' কবিতাতেও তিনি পুনরায় বন উজাড়ের কথা বলেছেন। অর্থাৎ যারা পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত মূলত তারাই ধ্বংসের পথে। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো অপকর্ম করতে অভ্যস্ত এই তথাকথিত প্রকৃতি বাঁচাও কমিটি। রহমান হেনরী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে ওঠেন :

রক্তদৃশ্যে পৃথিবীতে রঙেরই আনন্দ নেমে আসে ... আর/পাখিপ্রেমে সংরক্ষণবাদীরাও কী সুন্দর পারে !

পাখিদের মাংস ভেজে/বনভোজন ছড়াচ্ছে বাতাসে ... এত রুচিকর ঘ্রাণ !

(পাখিকল্প বেলা, *প্রকৃত সারস উড়ে যায়*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৯)

লোকঐতিহ্য, স্বদেশ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বাস্তবতার আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত কবি মুক্তির আশায় নিঃশ্বাস নিতে ফিরে তাকাতে চান পেছনের দিকে, যেখানে লোকাচার, লোকপুরাণের গন্ধে বুক ভরে আসে, মুক্তি মেলে, হয় শাপমোচন। কৃষি শিক্ষায় সুশিক্ষিত কৃষক পিতাকে শস্যমুখী জীবনের দিকে ধাবিত হতে দেখে কবি আবেগে আপ্লুত- শস্যই সত্য, শস্যই সুন্দর। শস্য গুণকীর্তনে মুখরিত হয়ে কবি লোকায়ত জীবনালেখ্যে শস্যকেই একমাত্র নিরপেক্ষ বিজ্ঞানী বলে উল্লেখ করেছেন। মানব জীবনের শস্যের যে অবদান তা স্বীকার করে মানব সভ্যতাকে শিল্পরূপে প্রতীয়মান করেন। সেই সাথে এই শস্য মানব জীবনের আখ্যান কাব্যে রূপ নেয় আর শস্যের মধ্য দিয়েই তৈরি হবে আগামীর ফসল– ইতিহাস ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার। কবি শস্যের জয়গান গেয়েছেন নতুন আলোকে :

আমার কৃষকপিতা নিরক্ষর না ছিলেন বলে/ফসলের বর্ণশিক্ষা ছিল তার আদিপাঠশালা; ফলে

আমরা অনেক শস্য বপন-কর্তনহেতু জেনেছি যে, শস্য/বড় নিরপেক্ষ বিজ্ঞানী হয়; তাই আজ শস্যকেই বিজ্ঞাপন করি

এই সর্বশেষ শব্দচিন্তা রাশি ... আমাদের আনন্দ বিস্ময়...

(উপ আনুষ্ঠানিক, *প্রকৃত সারস উড়ে যায়*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ২২)

অর্থাৎ কৃষি কার্য ও শস্য বপন এর মধ্য দিয়ে কবি জীবনের প্রকৃত অর্থ খোঁজেন। ফসলের বর্ণ শিক্ষাই প্রধান ও প্রকৃত আর এই ফসলের বর্ণ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা ও সর্বশেষ 'শব্দ চিন্তারাশি'। তাই ফসলের গুরুত্ব রহমান হেনরীর কাছে এক ও অভিন্ন। কবিতাটির মধ্য দিয়ে রহমান হেনরীর গ্রামীণ লোকচেতনায় তাঁর মানসলোক কতটা উদ্ভাসিত তা সহজেই অনুমেয়। শস্যশিল্পী কবি ও তাঁর পরিবার এক অর্থে পুরো গ্রামটাই যেন তাঁর একটি যৌথ পরিবার; যেখানে আদি পাঠ ও সর্বশেষ পাঠ হয়ে ওঠে ফসলের বর্ণমালা।

লোকায়ত জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ নদী। একদা যে নদী ছিলো পূর্ণ যৌবনে ভরপুর 'ঢেউঢালা' কল্লোলিত নদী তা আজ কেবলই স্মৃতি। নিপীড়িত বঞ্চিত, অভাব-দারিদ্র্যের চাপে পিষ্ট জীবনে একটুখানি আশ্রয় সেই ফেলে আসা স্মৃতি দোলা দিয়ে যায় অপার শান্তির। জীবনের সকল আয়োজন যেন স্থির হয়ে থাকা থেকে প্রবল আলোড়নে নাড়া দিয়ে যায় কবির অনুভূতি প্রবণ মনে; যেখানে স্মৃতি হয় একমাত্র সম্বল। এই স্মৃতিরোমন্থনের ভেতর দিয়ে কবি ভাষা আন্দোলনের গৌরবকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'বর্ণ পাখির দেশে বায়ান্নটি ডানা' কি আশ্চর্য সুন্দর ভাষা, সত্যি আনন্দ দান করে :

১. মতো মেঘপৃষ্ঠে কোপমারা চাঁদ ... ঢেউঢালা কল্লোলিত চন্দ্রাভাস নদী .../নদীগুলি মৃত ...
ফেলে এসেছি আনন্দের সাংকেতিক ঋতু ... প্রযত্ন-খোদিত যত মুখস্থ ঠিকানা,
হংসস্নাত দিঘির দরদ ... এইসব গান ... জোনাকির যাজক গৌরব ...

২. বায়ান্নটি ডানা মেলে পাষাণের চোখ জলে ভাসি...এবং প্রচ্ছন্ন কথা...

(বিবিধ দহন, *প্রকৃত সারস উড়ে যায়*, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ২২-২৩)

রহমান হেনরীর *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা* (১৯৯৯) কাব্যগ্রন্থটি পুথি কাব্যের আদলে রচিত। এখানেও তিনি তাঁর শিকড়ের গান গেয়েছেন। ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেছে তাঁর কাব্য। গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ, পুথি সাহিত্য, লোকপুরাণ, ধর্মীয় মিথ, কাউন্টার কালচার প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়কে তুলে এনেছেন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে। পুথি সাহিত্যের আদলে রচয়িত 'প্রবেশিকা'য় প্রথমেই তিনি কী বলতে চেয়েছেন তার একটা খসড়া বা আগাম ধারণা দিয়েছেন এবং সেই সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণের দেহতত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়ে তিনি লোকপুরাণে প্রবেশ করেন :

ভেদকথা বলি তবে শোনো কাব্যবতী।/বেশুমার দেহলীলা দেবী তবু সতী !!
সতীত্বের গুণে বেশ্যা দেবীর সমান।/রাধার সতীত্ব বটে কৃষ্ণতে প্রমাণ।।

(প্রবেশিকা, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৭)

পুথি সাহিত্যের আদলে রচিত বলেই 'প্রবেশিকার' পরে তাঁর 'বন্দনা-বীক্ষণ' কবিতায় সবকিছুর বন্দনা করেন। এই বন্দনার মধ্যে দিয়েই কবির মানস প্রবণতা ধরা পড়ে। এই বন্দনা যে ভালোবাসার

সম্মান দেখানোর তা অতি সহজেই বোঝা যায়। প্রথমেই তিনি বন্দনা করেন মানবজাতির আদি মানব ও মানবী অর্থাৎ যাদের ভুলের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই সুন্দর ধরণী। এখানে কবি ধর্মীয় মিথ ব্যবহার করেছেন। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসটাই তিনি তাঁর কাব্যের আলোকে তুলে এনেছেন :

পহেলা বন্দনা করি, বিবি হাওয়া, আদি-মানবী।/ইহলোক বাস র'চে যিনি হন প্রথমতঃ কবি।।
হোক ভুল, তিনি তবু এনেছেন, অমোঘ লিখন।/জগতে মানুষ হবে জীবশ্রেষ্ঠ, আদম নন্দন।।

(বন্দনা-বীক্ষণ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৮)

শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসই নয় তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে উমা-পার্বতীকেও বন্দনা করতে ভুলে যান নি :

দোসরা বন্দনা করি, উমা-পার্বতী, জগজ্জননী।/শিবের অনলবীজে জন্ম যিনি দিলেন ধরণী।।

(বন্দনা-বীক্ষণ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৮)

এভাবে তিনি খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাসটিকেও মূল্যায়ন করেছেন। তিনি খ্রিস্টান ধর্মের মিথলজি অনুযায়ী মাতা মারিয়া কুমারী থাকার সত্ত্বেও স্রষ্টার ইচ্ছায় গর্ভে সন্তান ধারণ করেন সেই বিষয়টি শ্রদ্ধার সাথে দেখেছেন :

চৌঠায় বন্দনা করি, মা-মারিয়া, কুমারী যে-মাতা।/অযৌন নিষেকে জন্ম দেন শুনি- যিশু, পরিত্রাতা।।
পুরুষ-সঙ্গমহীন গর্ভিণী সে, পবিত্র জননী।/স্রষ্ঠার ইচ্ছায় ফলবতী আহা ! ধন্য গরবিনী।

(বন্দনা-বীক্ষণ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৮)

প্রত্যেকটি ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি যে বন্দনা গীত গেয়েছেন এ থেকেই রহমান হেনরীর অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় মেলে। সব ধর্মের প্রতি বন্দনা শেষে তিনি স্বভাব-সুলভবশত শুরু করেন তাঁর জন্মস্থানের বন্দনা। যেখান থেকে তাঁর উঠে আসা, যেখানে তাঁর শিকড় প্রথিত সেই মৃন্ময়ী গ্রামের ঋণ তো শোধ হবার নয়। যার দুধে, আলো বাতাসে কবির বেড়ে ওঠা, সেই গ্রামকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। পাশাপাশি তিনি সেই অস্পৃশ্য, অনার্য জাতিকে বন্দনা করেন, যাদের কথা কেতাবে লেখা থাকে না। যারা থাকে ঘটনার নেপথ্যে, যারা শ্রম দিয়ে, রক্তঘাম মাথায় করে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করে যোগান দেন মানুষের মুখের অন্ন। তিনি সর্বদা বঞ্চিত মানুষের পক্ষে।

গ্রামীণ ও লোকজীবনের অতলে রহমান হেনরীর শিল্পবোধের মূল নিহিত বলেই তিনি লোকায়ত জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে নিজস্ব প্রতিভায় তাঁর শিল্পরূপের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট। ফলে তিনি তাঁর ইতিহাস ঐতিহ্যের বড় চিহ্নক বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' ও পদকর্তাকে বন্দনা করেন। মা, মাটি, মাতৃভূমি- অর্থাৎ স্বদেশ বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে- মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই তা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। কোনো জাতিই টিকে থাকতে পারেনা তাঁর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ছাড়া। সেই ধারাবাহিকতায় কবি পূর্বসূরি কবিদের মতো মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে যারা টিকিয়ে রেখেছেন, হাল ধরেছেন তাঁদের কাছে তিনি ঋণ স্বীকার করে বন্দনা করেছেন :

১. পঞ্চমে বন্দনা করি, নিজমাতা মৃম্ময়ী-গ্রামীণ।/যাঁর কাছে রক্ত-পুষ্টি স্তন্য আর জরায়ুর ঋণ।।
এবং বন্দনা করি, আদিবাসী, অনার্য-সভ্যতা।/ধর্মগোত্র ভেদহীন, নিরীশ্বর, শস্যের দেবতা।।

২. চর্যাপদ থেকে যত পদকর্তা, কবি মহাকবি/ছড়াচ্ছেন-ছড়াবেন, ভাষাদ্যুতি, পদ্যশিল্পরবি।।

(বন্দনা-বীক্ষণ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৮-৯)

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কাব্য থেকে শুরু করে লোকপুরাণ, লোকবিশ্বাস, উপাখ্যানের বর্ণনায় কবি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন প্রতিটি ধর্মের কিছু বিশ্বাসেও সাদৃশ্য রয়েছে যেমন, তেমনি বিরুদ্ধ বিষয়টিও স্পষ্ট। সেটাকে 'কাউন্টার এ- সংস্কৃতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি ধর্মের ধর্মগুরু পাল্টাপাল্টি খেলায় মাতোয়ারা যেমন- যতটা সাদৃশ্য, যতটা না ঐশ্বী-তার চেয়ে বেশি রেশারেশি :

১. গাজী-কালু-চম্পাবতী রাম-লক্ষণ-সীতাসতি
এ-প্রকার সাদৃশ্যের মানে।

২. হোজ্জা নাসির উদ্দিন গোপাল ভাঁড়ের দীর্ণ
অনুপুঙ্খ করেছে পালন!

ভেদতত্ত্ব খুঁজিবারে আসিয়াছি এ-সংসারে
আমি আর হাসন-লালন।।

এই মতো যতো কৃতি কাউন্টার এ-সংস্কৃতি
কী লক্ষ্যে, কাহার রচিত?

(প্রশ্নগান, প্রত্নঘ্রাণ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ১৭)

একই কবিতায় এত সব ভেদ কথার ভেতর আর একটি অর্ন্তনিহিত ভাব লুকায়িত। কবির মতে বাংলা ভাষায় তেমন নিজস্ব উপন্যাস তৈরি হয় নি। যা হয়েছে তা ইউরোপীয় সাহিত্যের রেফারেন্স বা ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিত্যক্ত থেকে নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের নিজস্ব আখ্যান উপাখ্যান মিলিয়ে নিজস্ব কৃষ্টিকে তুলে ধরতে হবে যেখানে শুধুই মাটির গান হবে। কবি তাঁর দেশের সাহিত্যকে সবার উপরে দেখতে চান। সেই 'ধারার সিংহাসনে' কবে দেশকে আসীন দেখতে পাবেন সেই আশা কবির :

১. উপাখ্যান বলি তবে বঙ্গদেশে তা'কি হবে?
কাব্যসত্যে ঘটেছিলো যাহা !

কালিদাস মহাকবি এঁকেছিলো সেই ছবি
তাহা ভিন্ন নাহি অন্যরাহা !!

২. গুরু গো, আমারে কন এই ধারা সিংহাসন
কবে পাবে পোড়ামুখি দেশ?

(প্রশ্নগান, প্রত্নঘ্রাণ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ১৮)

'গান' কবিতায় তিনি লোকবিশ্বাসের সাথে জড়িত যাদুবিদ্যা, বিশল্যকরণী ইত্যাদি তুলে এনেছেন। গান মূলত শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে আরাম দেয়। অনুভূতিকে জাগ্রত করে সুরের মূর্চ্ছনা। মানুষ আদি-অন্ত ভেদাভেদ ভুলে যায় উপযুক্ত গানের বাণী ও সুরে। কিন্তু সেই গানও হতে পারে 'নীরব', কবির মতে শুধু সরবেই সঙ্গীত নয়। কারণ, তাঁর মতে 'নীরবতা যথার্থই আশ্চর্য সঙ্গীত'। আর এই নীরব সঙ্গীত শুনতে হলে থাকতে হবে অনুধাবন ক্ষমতা, তবেই তীব্র নীরবতা ধরা দিবে 'জগতের মধুর গান' হিসেবে। স্বর্গের দেবি মেনকা যিনি বিশল্যকরণী সেই পৌরাণিক কাহিনির চরিত্রের মধ্য দিয়ে ও গানকে আদি যাদুবিদ্যার সাথে তুলনা করে কবি গানের মধ্য দিয়ে আরোগ্যের বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। গান হলো হিলিং উপাদান, উদ্দীপনা নীরবতা সবভাবেই গানকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। লোকপুরাণাশ্রয়ী কবি খুব সুন্দরভাবে নীরবতার জয়গান গেয়েছেন :

> গান আদি যাদুবিদ্যা, বিশল্যকরণী।/গানে অঙ্কুরিত হলো আশ্চর্য ধরণী।।
> যে কোনো সৃষ্টির মূলে বিনাশের গান।/আনে স্বপ্ন, ধ্বংস আনে, ম্লান ও অম্লান।।
>
> (গান, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ২০)

মানব জীবনটাই একটা পথ। কোন পথ দিয়ে জীবনের চরম মোক্ষম লাভ সম্ভব, কোন পথটাই বা সঠিক, সহজ, নিষ্কণ্টক তা বোঝার জন্য কবি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছেন। সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> যিনি পথের সন্ধান দেবেন তার নিজেরই সব পথ জানা থাকে না, অথচ অনুসন্ধানী চায় শতপথের ঠিকানা। 'দ্বৈবরথে পড়েছে গুরু-শিষ্য-শতরথে'। এখানে এসে কি সে সঙ্কেতই পাই, যে গুরুর চেয়ে শিষ্যই-জ্ঞানান্বষণে অধিক সফল। বিশেষত শিল্পেয় প্রশ্নে গুরু যখন কেবল নিজের অস্তিত্বের সংকটে কম্পমান, তখনও শিষ্য এক পথ ছেড়ে শত পথ আবিস্কারের নেশায় উদ্যোমী? (মোহাম্মদ নূরুল হক, রহমান হেনরীর কবিতায় চিন্তার দ্যুতি, লোক, পৃ. ১৪৪)

আবার অন্য দিকে এর ভেতর সুফিবাদ লুকিয়ে আছে। বলা যায়, যে মাধ্যমেই ঈশ্বরকে ডাকা হোক না কেন তা ঘুরে ফিরে একই জায়গায় এসে একত্রিত হয়। যদিও মতভেদে দ্বিমত রয়েছে। সব পথ শেষে এক বিন্দুতেই মিলিত হয়। কবি এখানে মেটিরিয়াল এর মধ্যে ইমমেটিরিয়ালে এসে এক হয়ে গেলেন :

> ১. গুরু আমি বাড়ি যাবো, পথ চেনা নাই।/পথেতে হাজার পথ, কোন্ পথে যাই?
> কোন্ পথে যাই সাধু, যাই কোন্ পথে?/দ্বৈবরথে পড়েছে গুরু, শিষ্য শতরথে।।
> ২. গুরু যারে ঘর কয়, শিষ্য বলে পথ।/ভেদান্ত, বিভেদ বাড়ে মত ও দ্বিমত।।
>
> (পথ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ২০)

'সংখ্যাতত্ত্ব' কবিতায় কবি আবারও কাউন্টার কালচারের প্রমাণ দিয়েছেন। ধর্মীয় মিথের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, দুই বিপরীত ধর্মের কতটা সাদৃশ্য, যেমন ইসলাম ধর্মে 'সাত' সংখ্যাকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। যেমন সাত আসমান, সত্তর জন মুরিদ ইত্যাদি। তেমনিভাবে হিন্দু

ধর্মেও 'সাত' সংখ্যা গুরুত্ববহ। যেমন : 'সাতপাকে বাঁধা'। কবির বিচক্ষণ দৃষ্টি এই ধর্মীয় সংস্কৃতির দিকে। 'সাত' এর গুরুত্ব কী সাদৃশ্য না বিভেদটাকেই প্রাধান্য পায়। তবে যাই হোক না কেনো অসাম্প্রদায়িক কবি দু'টিকেই প্রাধান্য দিয়ে বলতে চান– সাত বলে কিছুই নেই :

১. সাতের ধারণা ভ্রান্ত, সাত অর্থ এক।/একের পদার্থ করি, দ্বিগুণ অর্ধেক।।

২. সত্তুর জন মুরদা এক নামে যবে।/একটি কবরে জমে; কেয়ামত হবে !!
আরো এক ভেদে শিখি সাতের তরিকা।/সাত পাকে বাঁধা থাকে হিন্দুয়ানী নিকা।।

(সংখ্যাতত্ত্ব, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ২১)

দেখা যাচ্ছে এই সংখ্যার যাদু যতই থাকুক না কেনো বা এই সংখ্যায় সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যে রহমান হেনরীর কিছু যায় আসে না। তিনি আসলে স্রষ্টাকে একই ভাবেন। এই এককেই মানুষ খুঁজে ফেরে বিভিন্ন মাধ্যমে কিন্তু দিন শেষে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। কবি এখানে দার্শনিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

রহমান হেনরী ঐতিহ্য সন্ধানী কবি। ঐতিহ্য শুধুই সন্ধানই করেন নি তিনি বৈষ্ণব পদাবলি ও চর্যাপদের চরিত্রের মিশেলে নিজের মতো করে নতুনভাবে কিছু একটা পরীক্ষামূলক তৈরি করতে চেয়েছেন। তিনি পৌরাণিক কাহিনিকে গুরুত্ব সাথে দেখেছেন পুথি কাব্যের আদলে। তাঁর 'বৈরিতত্ত্ব' কাব্যে দেখা যায়, 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী'-র সাদৃশ্যে চরণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের দেহতত্ত্বের ভেতর দিয়ে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মাকে সমর্পিত করলেন :

১. শোনেন শোনেন শোনেন সাধু, শোনেন দিয়া মন/কন্যাটির যে বৈরী হইলো আপনা যৈবন
আহা শোনেন দিয়া মন।।

২. রাধিকার দেহ যদি আয়ানের ঘর/কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করে কোন্ দেহঘর?
আহা কোন্ দেহ ঘর??

(বৈরিতত্ত্ব, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ২১-২৩)

'ভেদ-এ-অযুদ' এ এসে রহমান হেনরী এক নতুন বিষয় উন্মোচন করতে গিয়ে এখানেও তিনি শিকড় থেকে সরে যান নি। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'আল কোরআন' যে শুধু একটি ধর্মগ্রন্থই নয় তার ভেতর রয়েছে মানব শরীরের কাঠামো তা বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ পুরো মানব শরীরটাই একটি 'কোরআন' এবং সেটি তিরিশটি হরফের মাধ্যমে কীভাবে তৈরি হয়েছে তার বর্ণনা করেছেন তিনি। কিন্তু বর্ণনার এক পর্যায়ে তিনি সৃষ্টির উৎস খুঁজতে বের হলেন। তিনি পৌরাণিকভাবে ভারতবর্ষের মানুষ। সিন্ধু নদের অববাহিকায় যে 'সিন্ধু' সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো আর তাঁর জন্মের ভেতর সেই সভ্যতার ইতিহাস খেলা করে, যা তাঁর রক্তের ভেতর প্রবাহিত; ফলে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের নাম চলে

আসে অবলীলায় তাঁর অস্তিত্বে। তিনি খুঁজে ফেরেন- প্রতিটি ধর্মের সৃষ্টির ইতিহাস। কবিতাটির প্রথম ও শুরু পুরোটাই এক আশ্চর্য বৈপরীত্য। তবুও কোথাও যেন মিলেমিশে এক :

১. শোনো সাধু, শোনো বলি, ভেদ-সমাচার।/তিরিশ হরফে গড়া অযুদ বান্দার।।
আলিফ হরফে নাক, বে-হরফে চোখ।/তে-হরফে গড়া অঙ্গ, তালু জানে লোক।।

২. অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুন্ড্র সূক্ষ্ম নাম।/বলিদেবী গর্ভে ধরে পঞ্চ-মনস্কাম।।

(ভেদ-এ-অযুদ, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ২৫-২৮)

অর্থাৎ, জন্মের রহস্য উন্মোচনে জন্ম ও মৃত্যুর চিন্তায় রহমান হেনরী দার্শনিক চিন্তার সাথে তাঁর লোকজঐতিহ্য বরাবরের মতো সঙ্গে নিয়ে আছেন। তাঁর এই দার্শকি চিন্তার স্ফূরণ দেখা যায় 'চক্ষু' কবিতায়ও। সৃষ্টিকর্তা নিরাকার তবুও তিনি সব দেখেন। এই তত্ত্ব কথা কবিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। রহমান হেনরী সব সময় চেয়েছেন তাঁর গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গগুলোকে প্রাধান্য দিতে। তাই যে কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা রচনা করলেও তার ভেতর চলে আসে সেই মাটির গন্ধ। বিষয়বস্তুর সাথে আশ্চর্য সুন্দরভাবে মিলিয়েও দিতে পারেন তিনি তাঁর লোকজ চিন্তাকে :

ছিড়ে গেছে ডানা, ঝড়ে/ভেঙ্গে গেছে ফুলে-ছাওয়া ডাল
আমাদের নদীগুলি মেনোপজে যথার্থ পঞ্চাশ আর/আমাদের নারীগুলি, আহা !

(নদী, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৩২)

নারীর শরীরের বয়সের সাথে পরিবর্তনের ইঙ্গিত নদীর শুকিয়ে যাওয়া বা ভাটা পড়ার সাথে আশ্চর্য সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন যা শৈল্পিক। আবার লোকপুরাণের সেই বেহুলা, গাঙ্গুরের কথাও উঠে আসে তাঁর লেখায়। যেখান আতাফুলে পিঁপড়ার দল ঋণ বাড়াবে। কী আশ্চর্য সুন্দর চিত্রকল্প ফুটে ওঠে চোখের সামনে যা শিকড়ের কবি ছাড়া বর্ণনা করা সম্ভব নয় :

বেদনার কানে বেদনা বাজাবে বীণ।/আতাফুলে ফুলে পিঁপড়া বাড়াবে ঋণ
গাঙ্গুরের জলে বেহুলা সাজাবে ঘর ... (চৌদ্দকথা, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৩৭)

স্বপ্ন পিয়াসী কবি তাঁর আকাশ চুম্বী স্বপ্নের পথে হেঁটে কুড়িয়েছেন ফেলে আসা, ভুলে যাওয়া সময়কে। হারিয়ে যাওয়া প্রকৃতির জন্য তাঁর হৃদয়ে হাহাকার। তিনি জন্মের পরিচয়কে চিনতে চেয়েছেন সব আবরণ সরিয়ে। নিজ পরিচয় চেনার একমাত্র মাধ্যম শিকড়ে ফেরা- মাটির কাছে ফেরা, মায়ের কাছে ফেরা, দেশের নদীনালা, ঘাস ফুল, পাখি, কুয়াশামাখা সকালের কাছ ফেরা। তবেই তো মিলবে নিজের জন্মের ইতিহাস :

১. একদিন জেগে উঠে দ্যাখে,/পৃথিবীর মাঠ সব ভরে গ্যাছে আশ্বিনের ঘাসে;
'কুয়াশা, কুয়াশা !' ব'লে লোকসব ক্রন্দর করে/আর

২. পূনশ্চঃ নদীর সামনে না- দাঁড়ালে,/কীরূপে লভিবে বৎস্যে আত্মপরিচয়?

(বিবর্তন, *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, পৃ. ৩৮-৩৯)

রহমান হেনরী নিজেকে চিনতেই ফিরে তাকিয়েছেন তাঁর আঁতুর ঘরে। তিনি এই নাগরিক অস্থিরতার ভেতর শান্তির পরশের পেলবতা খুঁজে ফেরেন তাঁর গ্রামীণ ও লোকজঐতিহ্যের ভেতর। তাঁর লোকায়ত অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় নানাবিধ বিষয়। যেখানে শস্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আধুনিক সভ্যতা। ভোরের কুয়াশা, কার্তিকের মাঠ, ব্যাঙ ডাকা দুপুর, কৃষক, কৃষক বধূ, শীতের আমেজ, নদী, পাখি সব এক সঙ্গে ঘর বাঁধে। যে ঘর অট্টালিকার নয় কিন্তু মমতায় ভরা :

> তার কবিতায় প্রবলভাবে উপস্থিত দেশ-মাটি-মানুষ। তাদের সংঘাত সংকট আনন্দ সুখানুভূতি। বিধৃত মানব জীবনের বিভিন্নমুখী অনুষঙ্গ, ভিন্নমুখী অভিঘাত। তার কবিতা বহু রৈখিক। বহু রৈখিক কবিতা সেটাই যা মানুষ বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন। (আফরোজা পারভীন, রহমান হেনরীর কবিতায় বহুমাত্রিকতা, *লোক*, পৃ. ১০৪)

নানা বিষয়ে কবিতা লিখে ও ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে কবিতার দুয়ারে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন নব্বইয়ের দশকের কবি রহমান হেনরী।

দশকে দশকে কবিতার বদল ঘটে না, বদল ঘটাও সম্ভব নয়। কারণ, একটি দশক মানে দশ বছর, কবিতা শিল্প বা সাহিত্যের অন্য যে কোনো শাখার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের সমান সময়। দৈশিক বা বৈশ্বিক রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং মহামারি, অতিমারি, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ থেকে বিতাড়ন, বৈষম্য, নব্য প্রজন্মের মনে রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহারের ফলে প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সাহিত্যে কাব্যকলায় নতুন ঘূর্ণি থেকে কবিতার বাঁক সৃষ্টি করে। কবির কবিতার বক্তব্য পরিবেশনে নতুন রূপ তৈরি হয়। আঙ্গিক সৌষ্ঠব বদলাতে বদলাতে বলা যায় নতুন রূপের, নতুন ভাবের, নতুন বক্তব্যের শিল্প সুষমায় মণ্ডিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক নব্বইয়ের দশক। এই দশকের কবিগণ কবিতার বয়নশিল্পে নিরলস শ্রম সাধনায় রত। পূর্ববর্তী আশির দশকের সময়খণ্ডে গ্রামীণ রূপান্তর ঘটেছে অনায়াসে। নব্বইয়ের দশকের কবিগণের কাব্যসম্ভারে গ্রামবাংলার লোকজ জীবনের রূপান্তর ঘটেছে অপরিসীম অবলীলায়। মূলত দার্শনিকতাবোধের প্রকাশ আমরা লক্ষ করি এ দশকের কবিদের কবিতায়। ইতিহাসচেতনা জায়গা করে নেয় নব্বইয়ের দশকের কবিদের মনের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে। ঐতিহ্যচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁদের কবিতায়। সমকাল চেতনায় ঋদ্ধ হন এ সময়ের কবিগণ। বহির্বিশ্বে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া নানান সংবাদ কবিদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন সৃষ্টি করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিখ্যাত কবিতার পঙক্তিবিশেষ নবরূপে নতুন অর্থে নবপ্রজন্মের মগজে প্রবেশ করে। নব্বইয়ের দশকের কবিগণ পূর্বসূরি কবিদের তাত্ত্বিক কথাগুলো নিজেদের মতো করে তাঁদের কবিতায় নবরূপে আনায়ন করেন। আবার আমিত্বচেতনার ও নৈঃসঙ্গ্যবেদনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে এ দশকে। এতে সত্তর ও আশির দশকের সঙ্গে নব্বইয়ের দশকের একটি অনির্ধারিত সেতু রচিত হয়।

নব্বইয়ের দশকের কবিদের মূল প্রবনতা শুধুই এগিয়ে চলা। এই সবকিছু মিলে নব্বইয়ের দশকের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর ঘটে নতুন আঙ্গিকে নতুন ভাবনায়, নতুনভাবে পরিবেশনায় সমাদৃত হয়ে ওঠে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর শূন্য দশক বা প্রথম দশকের কবিগণ পরম্পরায় তা গ্রহণ করে এগিয়ে চলেন। সর্বোপরি গ্রামীণ ও লোকজ জীবন-জিজ্ঞাসায় নব্বইয়ের দশকের কবিরা ব্যাপক সচেতনার, প্রাতিস্বিকতার পরিচয় দেন।

গ্রন্থ-সহায়িকা :

০১. অনিকেত শামীম [সম্পাদিত], *লোক*, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

২৪. আফরোজা পারভীন, রহমান হেনরীর কবিতায় বহুমাত্রিকতা, লোক, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

২৫. আমিনুর রহমান সুলতান, *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

২৬. আমিনুর রহমান সুলতান, কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, ২০০৬

২৭. তপোধীর ভট্টাচার্য , কবি মুজিব ইরমের শিল্পভাষা, *লেখাবিল*, ৮ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২১

২৮. ফরিদ আহমদ দুলাল, রহমান হেনরীর কবিতায় মেধা ও মনীষার দ্যুতি, লোক, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

২৯. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী : *কাব্যসমগ্র*, লেখাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

৩০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের কবিতা : নব্বইয়ের নিরীক্ষা, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

৩১. বেগম আকতার কামাল, বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কাব্যযাত্রা : চিন্তাভ কারুবাসনা, *উলুখাগড়া*, সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত, উলুখাগড়া, সংখ্যা ৩৪, ঢাকা, ২০২০

৩২. মাসুদুজ্জামান, বিম্বিত আয়না থেকে পথিকেষু... বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতার একটি ব্যক্তিগত পাঠ, আমিনুর রহমান সুলতান [সম্পাদিত] *অমিত্রাক্ষর*, সংখ্যা ১, বর্ষ ৫, ঢাকা, ২০১০

৩৩. মুজিব ইরম, *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

ইরমকথা, অনৃণ্য, ঢাকা, ১৯৯৯

ইরমসংহিতা, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১৩

৩৪. মুহম্মদ হায়দার, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

৩৫. মোহম্মদ নূরুল হক, রহমান হেনরীর কবিতায় চিন্তার দ্যুতি, *লোক*, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

৩৬. রাহমান হেনরী : *বনভোজনের মতো অন্ধকার*, বিশাকা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

: *বিষাদের চন্দ্রবন*, বিশাকা প্রকাশনী, ১৯৯৮

: আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা, উটপাখি, ১৯৯৮

: *প্রকৃত সারস উড়ে যায়*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০০

: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ছোট কবিতা, ২০১৮

৩৭. শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, রোদেলা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৬৭

৩৮. সাঈদ-উর রহমান [সম্পাদিত], *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* (১৯৭২-'৯৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

৩৯. সারাফ নাওয়ার, একজন বিশুদ্ধ সুররিয়ালিস্ট, *লোক*, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

৪০. সারওয়ার চৌধুরী, ম.ই কেনো ইরম বা ক্যারিজম্যাটিক কবিতার গুপ্তমন্ত্র খোঁজ, *লেখাবিল*, ৮ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২১

৪১. সিকদার আমিনুল হক, *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ২, (মিনার মনসুর সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

৪২. সিরাজ সালেকীন [সম্পাদিত], *উলুখাগড়া*, সংখ্যা : ৩৪, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা, ২০২০

৪৩. হাসান আল আব্দুল্লাহ, কাব্যিক আলোয় উজ্জ্বলতম রহমান হেনরী, লোক, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

উপসংহার

আবহমান বাংলার খেটে খাওয়া, নিরন্ন মজুর, চাষি, কৃষক, শ্রমিকই কবিতার মানুষ। গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ, প্রতিবাদ, জীবন-সংগ্রাম, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার বাংলাদেশের কবিতার মূল প্রতিপাদ্য। ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রচিত গ্রামীণ ও লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়– সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণি সংগ্রাম, গ্রামীণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, লোকজ জীবন ও সংস্কার। এই প্রতিবাদ পরায়ণতার চিত্র কখনো কখনো কবিসম্প্রদায় সচেতনভাবেই নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলার অতীত ইতিহাসকে বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন।

চল্লিশের দশকের কবি ফররুখ আহমদ থেকে নব্বইয়ের দশকের কবি রাহমান হেনরীর গ্রামীণ ও লোকজ বিষয়ক কবিতা বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় আবহমান বাংলার বাস্তব চিত্র, যাপিত জীবনের অজানা ঘটনায় ব্রাত্যসমাজের ওপর শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-বঞ্চনার আবেগমথিত ইতিকথা। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের যে পরিচয় কবিতায় চিত্রিত হয়েছে, তা থেকে বাংলাদেশের কবিতায় প্রতিফলিত আবহমান গ্রামবাংলার লোকজ আবহে গড়ে ওঠা মানুষের যাপিত জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্র নির্মাণ করে নেওয়া যায়।

চল্লিশের দশকের কবি আহসান হাবীবের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় গ্রামে বসবাসরত মানুষের অসহায়ত্বের ক্ষত চিহ্ন। তিনি ছিলেন সামাজিক সমস্যা সচেতন, প্রকৃতি ও স্বদেশ সচেতন কবি। পল্লিবাংলার নরম মাটির সোঁদা গন্ধ তিনি প্রতিনিয়ত উপভোগ করতেন নগর জীবনের অধিবাসী হয়েই। ফররুখ আহমদের কবিতায় যে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পেয়েছি, তা রূপকের ছলে পাঠককে নিয়ে গেছেন ভিনদেশে। গ্রামবাংলার লোকজীবন তাঁর কবিতায় স্পষ্ট না হলেও কিছুটা ছোঁয়া রেখে গেছেন তিনি মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের চরিত্রকে এঁকে। সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গ রাখাল, হুকো, জাল, দাঁড়টানা নৌকো, ঝলসানো রোদ সব মিলেই তাঁর পৃথিবী। অতি তুচ্ছ বিষয়কে কবিতার মধ্যে প্রয়োগ করে তিনি মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ জীবনের আবহ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সৈয়দ আলী আহসান পূর্ববাংলাকে উপমায়িত করেছেন লোককাহিনির বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তাঁর কবিতায় লোকজ বর্ণনা গ্রামীণ উপাদানে ভরপুর। গ্রামবাংলার লৌকিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে সৈয়দ আলী আহসান পরম মমতায় সৃষ্টি করেছেন তাঁর কবিতার শব্দমালা।

পঞ্চাশের দশকের কবি হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় স্বদেশ, সমকাল ও ঐতিহ্য পরম যত্নে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিভ্রমণ করে এসেছে বাংলার প্রকৃতিসংলগ্নতা, গ্রামীণ আবহ ও লোকজজীবন-সংস্কৃতির বর্ণিল রূপ-রূপান্তর। আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় ইতিহাস, লোকজজীবন ও ঐতিহ্যচেতনার রূপায়ণ ঘটেছে। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় ফুটে উঠেছে গ্রামবাংলার উজ্জ্বল-করুণ রূপ। শাশ্বত বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য লোকধারা অপরূপ রূপে পরিস্নাত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় আলাদা মাত্রা যুক্ত করেছে স্বদেশ, স্বজাতি, ইতিহাস, জনপদ ও ঐতিহ্য। আল মাহমুদ গ্রামবাংলাকে পুনঃনির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামীণ জনপদের বিচিত্র রূপ তাঁর কবিতায় প্রভাস্বর।

ষাটের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতা বিচিত্র রূপের সন্ধান লাভ করে। গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপ-রূপান্তর ঘটে নানাভাবে। আসাদ চৌধুরীর কবিতার অধিকাংশ জায়গা দখল করে নেয় গ্রামীণ লোকজচেতনা। লোকজ-সংস্কৃতি ও লোকজ-অনুষঙ্গের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় ব্যাপক লক্ষণীয়। লোকছড়া, লোকপ্রবাদ-প্রবচন, লোকসংস্কৃতির উপাদান থেকে তাঁর কবিতার মূল রস জোগাড় হয়েছে। রফিক আজাদের শিল্পবোধ নাগরিক শুষ্কতার বিপরীতে শৈশব-কৈশোরে যাপিত জীবনের প্রত্নস্মৃতির সবুজ উপত্যকায় মূলীভূত হয়। গ্রামীণ স্মৃতি ও লোকজ সংস্কৃতির বিবিধ অভিজ্ঞানে তিনি কবিতা নির্মাণ করেন। নগরে বসবাস করেও গ্রামীণ জীবনের হালচাল উদ্ঘাটনে লোকজভাবনায় তিনি সারাবাংলা বিচরণ করেন। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় চিরায়ত বাংলার লোক-প্রান্তর, গ্রামজীবনের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ঘটছে অনায়াসে। সহজ সাবলীল গতিতে তিনি কৈশোরে ফেলে আসা জীবন এবং প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া নানা রকমের ঘটনার বর্ণনে মোহাম্মদ রফিক লোকসঞ্জাত বিষয়নির্ভর আটপৌরে শব্দ-বাক্য বা প্রবাদ-প্রবচন কবিতায় চয়ন করে বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতাকে উচ্চমাত্রায় পৌঁছে দেন। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন, বাউলমনা নির্মলেন্দু গুণ গ্রামবাংলার চিরায়ত লোক-উৎসব, আচার অনুষ্ঠান, নৃত্যকলা প্রভৃতি নানা ঐতিহ্যনির্ভর পথ ধরে কবিতায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। গ্রামীণ জীবন ও লোকাচার সমানভাবে তাঁর হাত ধরে কবিতায় ঠাঁই করে নেয়। স্বল্প সময়ে স্বকীয় কাব্যভুবন নির্মাণে সচেষ্ট আবুল হাসানের কবিতায় লোকজসঞ্জাত সুর ও স্বর জায়গা করে নেয়। আবুল হাসান নাগরিক কবি হলেও তাঁর কবিতায় গ্রামীণ সৌন্দর্যবোধ ও সম্পর্ক স্পষ্ট হয়েছে গভীর সমবেদনায়। মননে নাগরিক হলেও আবুল হাসান গ্রামীণ বিচ্ছিন্নচেতনায় প্রবলভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ ছিলেন। লোকসংস্কৃতি ও লোক বিশ্বাসে তিনি গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মরমিয়া টান অনুভব করেছেন। মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতায় ভূমিজচেতনা, নৃতাত্ত্বিক গভীরতা,

লোকধর্মিতা জায়গা করে নেয়। তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় বাংলার প্রকৃতি আর দেশপ্রেমের সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত।

সত্তরের দশকের কবিতা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের উপাদানে ভরপুর হলেও মাহবুব সাদিকের কবিতায় গ্রাম, গ্রামসম্পৃক্ত মানুষের জীবন প্রণালী, আচরিত ধর্ম সংস্কৃতি রূপায়িত হয়েছে। নগরজীবনে বসবাস করেও তিনি ছিলেন শিকড়-সন্ধানী। অন্ত্যজ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বারবার মাহবুব সাদিকের কবিতায় জায়গা করে নেয়। লোকঅভিজ্ঞতা সঞ্চারি মাহবুব সাদিক কবিতায় চিরায়ত বাংলার শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের আশা-হতাশার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। অসীম সাহার কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ইতিহাস সংস্কৃতি, দেশভাগের করুণ যন্ত্রণা, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্বের সংকট। আজীবন তিনি কবিতাশিল্পে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। আবিদ আনোয়ার ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত গ্রামীণ প্রেক্ষাপট সুকৌশলে রূপকের ছলে গড়ে তোলেন কবিতার সংসার। আবহমান কালের লোকজসংস্কৃতির বলয় তাঁর কবিতায় আভাসিত হয়। দেশজ ঐতিহ্যপ্রীতি, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনধারা, লোকসংস্কৃতির বিচিত্র বিভা তিনি কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আবিদ আজাদের কবিতা শহর ও গ্রামকে বৃত্তাবদ্ধ করেছে। ফেলে আসা গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতি তিনি কবিতায় নানা রূপে ও ছন্দে রূপময় করে তোলেন। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ছিলেন দ্রোহ ও প্রেমের উচ্চকণ্ঠের কবি। কবিতায় তিনি মাটি, মানুষ ও ঐতিহ্যের প্রতি আমৃত্যু দায়বদ্ধ ছিলেন। ঐতিহ্যপ্রীতির কারণেই তিনি তাঁর শিল্পবোধকে লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির প্রবাহে অবগাহন করাতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর কাব্য মৃত্তিকাসংলগ্ন ও শিকড়স্পর্শী চারিত্র্যযুক্ত।

আশির দশকের কবিতায় সামরিকতন্ত্রের নিষ্পেষণের ছাপ স্পষ্ট। এই দশকের কবিদের মধ্যে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর ব্যাপকতা লাভ করে। তিনি বুদ্ধিভিত্তিক কবিতাচর্চায় যুক্ত হলেও তাঁর শিকড়ে রয়েছে গ্রামবাংলা ও নিসর্গ-প্রকৃতি। জীবনচিত্রকে তিনি রূপদান করেছেন শৈশব স্মৃতির পটে লোকজ জীবন অনুষঙ্গের ভেতর দিয়ে। লোকায়ত ঐতিহ্যের টানেই তিনি কবিতায় গ্রামীণ সংস্কৃতির বলয় নির্মাণে সযত্ন প্রয়াস চালিয়েছেন। মাসুদ খানের কবিতায় চিরায়ত বাঙালির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য চির জাগরুক। বিজ্ঞানচেতনা মনস্ক মাসুদ খানের কবিতায় চিরায়ত বাঙালির ঐতিহ্য সংস্কার গ্রামপ্রীতিস্নিগ্ধ মধুরিমা বিজ্ঞানের পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন। চেতন-অবচেতনের সঙ্গমে বাংলার চিরায়ত ও লোকায়ত ধারা তাঁর কবিতায় পরিশীলিত এবং প্রত্নরূপে দৃপ্ত পরিবেশনা পায়। আবহমান লোকসংস্কৃতির বিস্তৃতি মননে, চিন্তায় ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন আমিনুর রহমান সুলতান। গ্রামীণ ও লোকজ জীবন সংস্কৃতির বয়ন তাঁর কবিতায় প্রবহমান। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতায় পৌরাণিক কাহিনি, গ্রিক মিথ ও

লোকঐতিহ্যের সমন্বয়ে দৃশ্যমানতা পায়। গ্রামীণ ও লোকজ অনুষঙ্গ, গ্রামবাংলার লোকাচার, সংস্কৃতি, পুরাণ থেকে আহরিত উপাদান নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের সমন্বয়ে তিনি কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে মহাসমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক নব্বইয়ের কবিসম্প্রদায় বর্তমানকালের কবি হিসেবে খ্যাত। কবিতায় তাঁদের অবাধ বিচরণ একবিংশ শতাব্দীর শূন্য দশক ছাড়িয়ে আজো এগিয়ে চলে। এ দশকের কবিদের মধ্যে অনেকের কবিতার বই সম্প্রতি ছাপা হচ্ছে। কারো কারো দু'একটি আলোর মুখ দেখেছে। নব্বইয়ের দশকের কবিদের চারিত্র্যবিচার চলমান। এই দশকের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। তাঁর কবিতায় খুঁজে নিতে হয় শাশ্বত বাংলার মুখ। গ্রামীণ আচার ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তাঁর কবিতায় নির্মিত হয় আবহমান বাংলার চিরচেনা রূপ। মুজিব ইরমের কবিতায় দেখা মেলে আঞ্চলিক লোকাশ্রিত জীবনের রূপ। আর রাহমান হেনরীর কবিতায় লুপ্তপ্রায় ইতিহাস-ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত। মোটকথা, গ্রামীণ আবহে বেড়ে ওঠা চিরায়ত বাঙালির জীবন-কথা চল্লিশ থেকে নব্বইয়ের দশকের কবিদের কাব্য-কাহিনিতে ব্যক্ত হয়েছে মেধাবী দক্ষতায়।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, বাংলাদেশের কবিগণ কবিতা রচনা করতে গিয়ে অধিকাংশই সচেতনভাবে গ্রামীণ ও লোকজ মানুষ নিয়ে কবিতা নির্মাণ করেননি। তবে বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে কোনো-না-কোনোভাবে তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তুতে আবহমান গ্রামবাংলার চরিত্র স্থান করে নিয়েছে। কেউ কেউ উচ্চবর্গের শোষণের চালচিত্র ব্যক্ত করতে গিয়েও পিছিয়ে পড়া যাপিত জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। নগরে বসবাসকারী কবিদের হাতেও সচেতনে গ্রামীণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা বাংলাদেশের কবিতায় একটি বিরাট জায়গা দখল করে নিয়েছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই যেমন লোকজ জীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস একটি বড় প্রেক্ষাপট, তেমনি বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের যাপিতজীবন এবং সেই জীবনের চালচিত্র উপস্থাপন করে আমাদের কবিগণ গ্রামীণ লোকজ জীবনের রূপান্তরের ইতিহাসই নির্মাণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূল গ্রন্থ

অসীম সাহা : *উদ্বাস্তু*, সম্প্রীতি, ঢাকা, ১৯৯৪

: *কালো পালকের নিচে*, নব সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

: *সেরা কবিতা*, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

: *নির্বাচিত কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮

: *পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়*, জলতরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) : *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

: *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

: *জীবনানন্দ দাশ : কবিতাসমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ২০১৮

আবিদ আনোয়ার : *নির্বাচিত কবিতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

: *কাব্যসংসার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

আবিদ আজাদ : *কবিতাসমগ্র*, তৃতীয় সংস্করণ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

: *আবিদ আজাদের কবিতা*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

: *প্রেমের কবিতাসমগ্র*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

আমিনুর রহমান সুলতান : *কবিতাসংগ্রহ*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

আল মাহমুদ : *কবিতাসমগ্র*, পঞ্চম মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

আসাদ চৌধুরী : *কবিতাসমগ্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

আহমদ রফিক (সম্পাদিত) : *আহসান হাবীব* রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

: আলাউদ্দিন আল আজাদ : *কবিতাসমগ্র*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৬

খোন্দকার আশরাফ হোসেন : *কবিতাসংগ্রহ*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

নির্মলেন্দু গুণ : *নির্বাচিতা*, অষ্টম সংস্করণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী : *কাব্যসমগ্র*, লেখাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

মাসুদ খান : *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

মাহবুব সাদিক : *কবিতাসমগ্র*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

মুজিব ইরম : *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

: *ইরমকথা*, অনৃণ্য, ঢাকা, ১৯৯৯

: *ইরমসংহিতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১৩

মুহম্মদ নূরুল হুদা : *ষাট বছরের কবিতা*, লেখালেখি, ঢাকা, ২০০৯

মোহাম্মদ রফিক : *কবিতাসমগ্র*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

রফিক আজাদ : *রফিক আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫

রফিকউল্লাহ খান (সম্পাদিত) : *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

রাহমান হেনরী : *বনভোজনের মতো অন্ধকার*, বিশাকা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

: *বিষাদের চন্দ্রবন*, বিশাকা প্রকাশনী, ১৯৯৮

: *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা*, উটপাখি, ১৯৯৮

: *প্রকৃত সারস উড়ে যায়*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০০

: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ছোট কবিতা, ২০১৮

হিমেল বরকত (সম্পাদিত) : *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

শামসুর রাহমান (ভূমিকা) : *আবুল হাসান রচনাসমগ্র*, ষষ্ঠ প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ : *তনুমধ্যা*, চেতনা, ঢাকা, ১৯৯০

: *পুলিপোলাও* (২০০৩), *কবিতাসংগ্রহ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

সৈয়দ আলী আহসান : *কবিতা সমগ্র*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

সৈয়দ শামসুল হক : *কবিতাসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮

খ. সহায়ক গ্রন্থ

অনু হোসেন : *বাংলাদেশের কবিতা : লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

অসীম সাহা : *প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা*, চিরদিন, ঢাকা, ২০১৮

আজীজুল হক : *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত): *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

আবদুল কাদির (সম্পাদিত) : *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

: *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) : কবি *আবিদ আজাদ স্মারকগ্রন্থ*, আবিদ আজাদ স্মৃতি পরিষদ, ঢাকা, ২০০৬

: *জীবনানন্দ দাশ : কবিতাসমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ২০১৮

আবদুল হাফিজ : *আধুনিক সাহিত্য : বিবেচনাসমূহ*, মুক্তধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯১

আবিদ আনোয়ার : *চিত্রকল্প ও বিচিত্র গদ্য*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

: *বাঙলা কবিতার আধুনিকায়ন*, তৃতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ২০১৮

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

আমিনুর রহমান সুলতান : *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

আল মাহমুদ : *আল মাহমুদের কবিতা*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯

আহমদ রফিক : *কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

আসাদ চৌধুরী : *কোন অলকার ফুল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

কামরুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা*, ঢাকা, ২০১৪

খালেদ হোসাইন : *বাংলা ছন্দের মানচিত্র*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

খোন্দকার আশরাফ হোসেন : *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) : *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮৭

গাউসুর রহমান : *জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮

জসীম উদ্‌দীন : *নক্সী-কাঁথার মাঠ*, পলাশ প্রকাশনী, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮২

তালুকদার মনিরুজ্জামান : *সামরিক শাসনের ফলাফল রাজনীতির সামরিকীকরণ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের রাজনীতি* (১৯৮২-৯০), প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১

তুষার দাশ (সম্পাদিত) : *আহসান হাবীব : কবিতাসমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় : *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*, মডার্ন বুক এজেন্সি, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯৩

ফজলুল হক তুহিন : *আল মাহমুদের কবিতা: বিষয় ও শিল্পরূপ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী : *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

: *কবিতার শব্দ-সাঁকো*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *আবুল হাসান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

বেগম আকতার কামাল : *শতাব্দীসন্ধির কবিতা : দিশা ও বিদিশা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২০

মাসুদুজ্জামান : *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মাসুদুল হক : *হাজার বছরের বাংলা কবিতা*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

: *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

মাহবুব হাসান : *বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫

মাহবুবা সিদ্দিকী : *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজসচেতনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

মিনার মনসুর : *হাসান হাফিজুর রহমান বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

মিনার মনসুর (সম্পাদিত) : *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) : *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮১

: *কালকেতু উপাখ্যান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৫ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৪০২

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮৯

মুহম্মদ হায়দার : *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

মোতাহার হোসেন সুফী : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কাকলী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০১

মোস্তফা তারিকুল আহসান : *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ : *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮

রফিকউল্লাহ খান : *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

: *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৯৩

শহীদ ইকবাল : *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, রোদেলা, ঢাকা, ২০১৩

শামসুজ্জামান খান : *মাটি থেকে মহীরুহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

সত্যব্রত দে : *চর্যাগীতি পরিচয়*, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯৭

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পাদিত): *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

সাঈদ-উর রহমান : *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০১

: *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* (১৯৭২-'৯৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : *কবি ফররুখ আহমদ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈয়দ শামসুল হক (সম্পাদিত) : *কবি ও কবিতার সংগ্রাম*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

হাসান হাফিজুর রহমান : আধুনিক কবি ও কবিতা, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

: *কাব্যসমগ্র*, সময়, ঢাকা, ২০০১

হিমেল বরকত (সম্পাদিত) : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ *কবিতাসমগ্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

হোসেনউদ্দীন হোসেন : *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

গ. প্রবন্ধ

অনু হোসেন : খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সৃষ্টিপ্রতিভা, *একবিংশ*, (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : খোন্দকার আশরাফ হোসেন), সংখ্যা ২৯, ঢাকা, ২০১৫

অনিন্দিতা ইসলাম : অন্য স্বর অন্য আলো : মোহাম্মদ রফিকের কবিতা, (সম্পাদনায় : আবুল হাসনাত), *কালি ও কলম*, চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৭

অসীম সাহা : ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন'-আন্দোলন, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, (সম্পাদনায় : সাজ্‌জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

আফরোজা পারভীন : রহমান হেনরীর কবিতায় বহুমাত্রিকতা, *লোক*, (সম্পাদনায় : অনিকেত শামীম), বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

আবিদ আনোয়ার : মাহবুব সাদিক-এর কবিতা বিরোধাভাস ও বিপ্রতীপের রসায়ন, সবুজ মাহমুদ সম্পাদিত, *চতুর্মাসিক যমুনা* (১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-এপ্রিল), ঢাকা, ২০১৮-১৯

: ষাটের দশকের কবিতার আধার ও আধেয়, সাজ্‌জাদ আরেফিন সম্পাদিত *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা ৫, ঢাকা, ২০১৩

আমিনুর রহমান সুলতান : কবি অসীম সাহার সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, (ক্রোড়পত্র-কবি অসীম সাহা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২), লিটলম্যাগ প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ২০১০

: কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর সঙ্গে কথোপকথন, আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, ২০০৬

আসাদ চৌধুরী : প্রিয় রফিক আজাদ, *পূর্বপশ্চিম*, (সম্পাদনায় : আশরাফ জুয়েল ও অমিত গোস্বামী), বর্ষ চতুর্থ : পঞ্চম সংখ্যা, ২০১৭

আল মাকসুদ : সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা : দৈশিক ভাবনার প্রতিধ্বনি, (সম্পাদনায় : অনিকেত শামীম), *লোক*, বর্ষ : ১৭, সংখ্যা : ২১, ২০১৬

কাজী নাসির মামুন : খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা : জীবনবাদী চেতনার অশ্বারোহী, *অমিত্রাক্ষর*, (সম্পাদনায় : আমিনুর রহমান সুলতান), বর্ষ : ৫ ,সংখ্যা : ১, ঢাকা, ২০০৬

কামরুল হাসান : কবিতার মুখপত্র একবিংশ ও কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *একবিংশ*, (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : খোন্দকার আশরাফ হোসেন), ডিসেম্বর-২০১৫, ঢাকা।

খালেদ হামিদী : সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ : দ্বীপান্তরে জনবিশ্ব, অনিকেত শামীম সম্পাদিত *লোক*, বর্ষ : ১৭, সংখ্যা : ২১

গাজী রফিক : ভূমিকা : রূপান্তর আশি দশকের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা ৫ (সম্পাদনায় : সাজ্জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

তপোধীর ভট্টাচার্য : কবি মুজিব ইরমের শিল্পভাষা, *লেখাবিল*, ৮ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২১

তামিম ইয়ামীন : সুব্রতর্পণ, অনিকেত শামীম সম্পাদিত, *লোক*, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০১৬

নাসির আহমেদ : পূর্ববাংলার কবিতায় নব্য আধুনিকতা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা ৫ (সম্পাদনায় : সাজ্জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

: দ্বান্দ্বিক দক্ষতায় উত্তরণের কবি অসীম সাহা, আমিনুর রহমান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, সংখ্যা ১, বর্ষ ৫, ২০০৬

ফরিদ আহমদ দুলাল : রহমান হেনরীর কবিতায় মেধা ও মনীষার দ্যুতি, *লোক*, (সম্পাদনায় : অনিকেত শামীম), বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলাদেশের কবিতা : তিন দশকের ত্রিধারা, *হালখাতা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ২০১১

: বাংলাদেশের কবিতা : নব্বইয়ের নিরীক্ষা, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

বেগম আকতার কামাল : বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের কবিতা : পরিপ্রেক্ষিত প্রবণতা ও প্রান্ত, *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

: মাসুদ খানের কবিতা : বস্তু ও প্রাণপ্রেতির চংক্রমণে জীবনপ্রপঞ্চ, *উলুখাগড়া*, সংখ্যা : ৩৩, ঢাকা, ২০১৯

: বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কাব্যযাত্রা : চিন্তাভ কারুবাসনা, সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত, *উলুখাগড়া*, সংখ্যা ৩৪, ঢাকা, ২০২০

মহীবুল আজিজ : ষাটের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫ (সম্পাদনায় : সাজ্জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

মানিকুল ইসলাম : মাসুদ খানের কবিতা : বিষয়বৈভব ও প্রকরণনিষ্ঠা, *উলুখাগড়া*, সংখ্যা : ৩৩, ঢাকা, ২০১৯

মাসুদ খান : সালোক-সংশ্লেষণের কুশলী কলাকার, *লোক*, বর্ষ : ১৭, সংখ্যা : ২১, ২০১৬

মাসুদুজ্জামান : বিম্বিত আয়না থেকে পথিকেষু... বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতার একটি ব্যক্তিগত পাঠ, (সম্পাদনায় : আমিনুর রহমান সুলতান), *অমিত্রাক্ষর*, ঢাকা, ২০১০

মাসুদুল হক : অসীম সাহার কবিতায় পুরাণ, প্রেম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, সংখ্যা ২, বর্ষ ৯, ২০১০

মাহবুব হাসান : এ-জীবন মানুষের সৃষ্টির বেদনায় গাথা, সবুজ মাহমুদ সম্পাদিত, *চতুর্মাসিক যমুনা* (১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-এপ্রিল), ঢাকা, ২০১৮-১৯

মিনার মনসুর : ক্রান্তিকালের কবিতা : কবিতার ক্রান্তিকাল, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫ (সম্পাদনায় : সাজ্জাদ আরেফিন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

মুনীর সিরাজ : সত্তর দশকের কবিতা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, (সম্পাদনায় : সাজ্জাদ আরেফিন), ঢাকা, ২০১৩

মোহম্মদ নূরুল হক : রহমান হেনরীর কবিতায় চিন্তার দ্যুতি, *লোক*, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা, *আমাদের সাহিত্য*, [সম্পাদনায় : সরদার ফজলুল করিম], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

রফিকউল্লাহ খান : কবিতার সংগ্রাম, সংগ্রামের কবিতা, *কাশবন*, (সম্পাদক : মিন্টু হক, বর্ষ ১ : সংখ্যা ৩), ২০১৫

শফিক ইমতিয়াজ : সাক্ষাৎকার, সবুজ মাহমুদ সম্পাদিত *চতুর্মাসিক যমুনা* (১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-এপ্রিল), ঢাকা, ২০১৮-১৯

শহীদ ইকবাল : আমিনুর রহমান সুলতানের কবিতা : ঐতিহ্যের বাহনে সম্মুখগামী মননযাত্রা, *অমিত্রাক্ষর*, বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ১, ঢাকা, ২০০৬

: আশির কবিতায় নির্মাণচিন্তা ও প্রতিষ্ঠিত সঞ্চয়, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা : ৫, ঢাকা, ২০১৩

শানু মোস্তাফিজ : *কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আলাপচারিতা*, *কালি ও কলম*, (সম্পাদনায় : আবুল হাসনাত), দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৫

সারওয়ার চৌধুরী : ম.ই কেনো ইরম বা ক্যারিজম্যাটিক কবিতার গুপ্তমন্ত্র খোঁজ, *লেখাবিল*, ৮ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সারাফ নাওয়ার : একজন বিশুদ্ধ সুররিয়ালিস্ট, *লোক*, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

সুহিতা সুলতানা : প্রসঙ্গ : আবিদ আজাদের কবিতা, *কবি আবিদ আজাদ স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা, ২০০৬

কবি আবিদ আজাদ স্মারকগ্রন্থ, কবি আবিদ আজাদ স্মৃতি পরিষদ, ঢাকা, ২০০৬

সৈয়দ আলী আহসান : পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা, *আমাদের সাহিত্য*, [সম্পাদনায় : সরদার ফজলুল করিম], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : বাংলাদেশের কবিতা, *হালখাতা* (সম্পাদক : শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত), ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ২০১১

: তিন রমণীর ক্বাসিদা, *একবিংশ*, (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : খোন্দকার আশরাফ হোসেন), সংখ্যা- ২৯, ঢাকা, ২০১৫

হাসান আল আব্দুল্লাহ : কাব্যিক আলোয় উজ্জ্বলতম রহমান হেনরী, *লোক*, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

হিজল জোবায়ের : ঐতিহাসিক, অনিকেত শামীম সম্পাদিত, *লোক*, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সংখ্যা, বর্ষ : ১৭, সংখ্যা : ২১, ২০১৬

হেনরী স্বপন : *কবির মনোজগতে মরমি ভাষার আশ্চর্য আসক্তি আছে...*, অনিকেত শামীম সম্পাদিত, *লোক*, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০১৬

ঘ. পত্র-পত্রিকা

অনিকেত শামীম [সম্পাদিত], *লোক*, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০১৬

আবুল হাসনাত [সম্পাদিত], *কালি ও কলম*, দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৫

আবুল হাসনাত [সম্পাদিত], *কালি ও কলম*, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৭

আমিনুর রহমান সুলতান [সম্পাদিত], *অমিত্রাক্ষর*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২, ঢাকা, ২০১০

খোন্দকার আশরাফ হোসেন [প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক], *একবিংশ*, সংখ্যা ২৯, ঢাকা, ২০১৫

শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত [সম্পাদিত], *হালখাতা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০১১

সবুজ মাহমুদ [সম্পাদিত], *যমুনা*, ১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-এপ্রিল, ঢাকা, ২০১৮-১৯

সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পাদিত], *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৫, ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৩

সামন্ত সাবুল [সম্পাদিত], *লেখাবিল*, ৮ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সালাম সালেহ উদদীন [সম্পাদিত], *পূর্বপশ্চিম*, বর্ষ চতুর্থ : পঞ্চম সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৭

সিরাজ সালেকীন [সম্পাদিত], *উলুখাগড়া*, সংখ্যা : ৩৪, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা, ২০২০